শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বর্তিকা

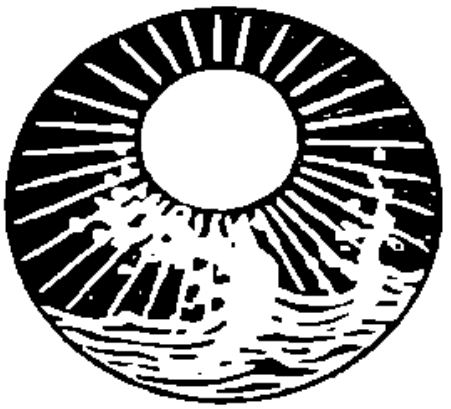

২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮২

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির (বর্ত্তিকা)

২১শে ফেব্রুয়ারী (১৯৮২)

৭৮-৫২

'156'2
002/25

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

ঋষি বিশ্বামিত্রের অগ্নিযজ্ঞ	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
নায়ের আলাপ	
নায়ের লেখা—নায়ের কথা	ংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায়
পাতি ভক্করলোক (নাটক)	অনুবাদক সমীরকান্ত গুপ্ত

বর্ত্তিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগস্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫·০০ টাকা। বৎসরের যে-কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিসে কিংবা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

	প্রতি সংখ্যা	বার্ষিক
প্রতি পৃষ্ঠা	১০০·০০ টাকা	৩০০·০০ টাকা
প্রতি অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	৬০·০০	২০০·০০
ভিতরের মলাট	১৫০·০০	৫২০·০০
বাইরের মলাট	২০০·০০	৬০০·০০

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

সম্পাদক :
শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য দেড় টাকা

Edited by : Nalini Kanta Gupta
Published by : Sri Aurobindo Pathamandir,
15 Bankim Chatterjee Street, Calcutta-73
Printed by : Amiyo Ranjan Ganguli
at Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry

There is a purpose in
life — and it is the only
true and lasting one —
The Divine
Turn to Him and the
emptiness will go.
Lawrence

ঋষি বিশ্বামিত্রের অগ্নিমন্ত্র

(ঋগ্বেদ—তৃতীয় মণ্ডল, চতুর্বিংশতি সূক্ত)

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

অগ্নে সহস্ব পৃতনা অভিনাতীরপাস্য।
দুস্তরন্তরন্নরাতীর্বর্চো ধা যজ্ঞবাহসে ॥১॥

অগ্নে—হে অগ্নি
সহস্ব—প্রতিহত কর, হটিয়ে দাও
পৃতনাঃ—সেনাদল
অভিনাতীঃ—শত্রুদের, আক্রমণকারীদের, অরাতিদের
অপ—
অস্য— } দূরে সরিয়ে দাও
দুস্তরঃ—দুর্ভেদ্যের
তরন্—ভেদ করে
অরাতীঃ—শত্রুদল
বর্চঃ—উজ্জ্বল শিখা
ধা—স্থাপন কর
যজ্ঞ-বাহসে—হবিবাহকের জন্য

হে অগ্নি, আততায়ী সৈন্যদের পরাভূত কর, সুদূরে নিক্ষেপ কর, দুর্ভেদ্য অরাতীদের ভেদ করে চল, প্রতিষ্ঠা কর উজ্জ্বল শিখা হবিবাহকের জন্যে ॥১॥

অগ্নে ইড়া সনিধ্যসে বীতিহোত্রো অনর্ত্যঃ
জুষস্ব সূনো অধ্বরম্ ॥২॥

অগ্নে—হে অগ্নি
ইড়া—ইলাদেবীর সহায়ে, দিব্যদৃষ্টিময় বাক্ সহায়ে
সম্—
ইধ্যসে— } প্রজ্বলিত হয়েছ
বীতি-হোত্রঃ—হবনে উপস্থিত তুমি
অনর্ত্যঃ—অমর সে
জুষস্ব—গ্রহণ কর
সু—সম্পূর্ণ ভাবে

নঃ—আমাদের
অধ্বরম্—যজ্ঞযাত্রা

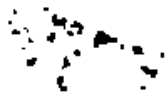

হে অগ্নি, তুমি প্রজ্বলিত হয়ে ওঠ দিব্যদৃষ্টির বাক্যে। বাহ্নয় দিব্যদৃষ্টির সহায়ে, তুমি উপস্থিত হবনে, তুমি অমর দেবতা, সম্পূর্ণ গ্রহণ কর আমাদের যজ্ঞযাত্রা ॥২॥

অগ্নে দ্যুম্নেন জাগৃবে সহসঃ সূনবাহুত।
ইদং বহিঃ সদো মম ॥৩॥

অগ্নে—হে অগ্নি
দ্যুম্নেন—দীপ্তি নিয়ে
জাগৃবে—সদাজাগ্রত
সহসঃ—মহাবলের
সূনঃ—পুত্র তুমি
আহুত—তুমি আহুত হয়েছ
ইদম্—এই
বহিঃ—যজ্ঞাসনে
(আ+) সদঃ—উপবেশন কর
মম—আমার

হে অগ্নি, দীপ্ত হয়ে সদাজাগ্রত তুমি মহাবলের পুত্র, তোমাকে আহ্বান করা হয়েছে, আমার এই যজ্ঞাসনে উপবেশন কর ॥৩॥

অগ্নে বিশ্বভিরগ্নিভির্দেবেভির্মহর গিরঃ।
যজ্ঞেষু যে উ চায়বঃ ॥৪॥

অগ্নে—হে অগ্নি
বিশ্বেভিঃ—যাবতীয় বিশ্ব
অগ্নিভিঃ—অগ্নির সহায়ে
দেবেভিঃ—দেবতাদের সহায়ে
মহয়—সমৃদ্ধ কর
গিরঃ—আমাদের বাক্যকে
যজ্ঞেষু—যজ্ঞে
যে—যারা
উ—
চায়বঃ—দৃষ্টিমান

হে অগ্নি, তোমার যাবতীয় দিব্য শিখাদের সহায়ে সমৃদ্ধ করে তোল এই যজ্ঞে আমাদের যত দৃষ্টিময় বাক্‌ময় ॥৪॥

অগ্নে দা দাশুষে রয়িং বীরবন্তং পরীণসম্।
শিশীহি নঃ সূনৃতঃ ॥৫॥

অগ্নে—হে অগ্নি
দাঃ—প্রদান কর
দাশুষে—দাতাকে
রয়িম্—(সেই) সম্পদকে
বীরবন্তম্—যা বীর্যবান
পরীণসম্—আমাদের চতুর্দিকে
শিশীহি—শাণিত করে ধর, তীব্র করে ধর, তেজোময় কর
নঃ—আমাদের
সূনৃতঃ—সন্ততিসহ

হে অগ্নি, প্রদাতাকে দাও তার চারিদিকে বীর্যময় সম্পদ, সন্ততিসহ আমাদের তীক্ষ্ণ তেজোময় করে ধর ॥৫॥

মায়ের আলাপ

(গত সপ্তাহে, ২০ এপ্রিল বুধবার, বৃষ্টির দরুণ ক্লাস হয় নি)

২৭শে এপ্রিল ১৯৫৫

(আলোচ্য বিষয়: Les Bases du Yoga, pp. 166-175 ed. Ashram 1954)

প্রশ্ন মা, প্রতীকী স্বপ্ন আর সূক্ষ্মদর্শন, এ দুয়ের মধ্যে তফাৎ কি?

শ্রীমা সূক্ষ্ম দর্শন, মানুষের ঘুমন্ত অবস্থায় হয় না, সে যখন জেগে থাকে, শুধু জেগে থাকে নয়, যখন সে নিজের মধ্যে আরও থাকে, হয়ত ধ্যানের অবস্থায়, অথবা একনিবিষ্ট অবস্থায় থাকে, তখন হয়। অথবা রাত্রে হতে পারে, যখন ঘুম আসে না, শান্ত ভাবে নিজেকে বেশ শিথিল করে দিয়ে শুয়ে থাকে, তখনও সূক্ষ্মদর্শন হতে পারে।

আর স্বপ্ন হল, মানুষ যেটা দেখে ঘুমের মধ্যে, অর্থাৎ যখন জাগ্রত অবস্থার চেতনা একেবারেই থাকে না। অপর পক্ষে সূক্ষ্মদর্শনের সময় মানুষ জাগ্রত অবস্থার চেতনাতে থাকে, কিন্তু চেতনাকে সে তখন শান্ত, নিশ্চল অবস্থায় রেখেছে, আর সে সময় আর এক রকমের চেতনা জেগে ওঠে, সেটা ঢের বেশী অন্তর্মুখী, কিন্তু মানুষটি তখন ঘুমিয়ে নেই, দেহটা ঘুমোয় না, কেবল শান্ত নীরব থাকে।

আবার কাজেকর্মে ব্যস্ত থাকা অবস্থাতেও মানুষের সূক্ষ্মদর্শন হতে পারে। কেউ কেউ আছে যাদের কাজেকর্মের মধ্যেও সূক্ষ্মদর্শন হয়। উপলব্ধির ও হল আর এক স্তর যেটা জেগে ওঠে। ওগুলো হল প্রত্যক্ষবোধ, মনেও হতে পারে, প্রাণেও হতে পারে অথবা দেহেও হতে পারে। সেগুলো জেগে উঠে তাদের অভিজ্ঞতাকে বাহ্যচেতনাতে পাঠিয়ে দেয়। ও যেন মানুষের বাহ্য চোখের পিছনে আর একজোড়া চোখ এবং সে চোখ বাহ্যবস্তুকে না দেখে প্রাণের মধ্যে দেখে। আর সেটা সর্বদাই বিদ্যমান। কেবল মানুষ স্থূলতর জীবনের উপরই একনিবিষ্ট বলে সেটাকে দেখতে পায় না। কিন্তু কোন কোন শিশু আছে যাদের এই দুই দৃষ্টিই একসঙ্গে সংযুক্ত। তারা এমন কি বাহ্য-দৃষ্টিতেও নানা রকমের জিনিস দেখে যেগুলো বাহ্যবস্তু নয়। সাধারণত লোকে বলে, ওরা যত বাজে কথা বলছে, তাই তারা বলা বন্ধ করে। কিন্তু তারা কেবল বাহ্য জিনিসটাই দেখে না, দেখে তার পিছনে আরও অন্য যে সব জিনিস রয়েছে। চোখ বুজেও মানুষের সূক্ষ্ম-দর্শন হতে পারে, আবার খোলা চোখেও হতে পারে। কিন্তু স্বপ্নের বেলায় মানুষ সর্বদাই ঘুমিয়ে থাকে।

আর কোন প্রশ্ন?

প্রশ্ন: প্রতীকী স্বপ্ন আর অন্য সাধারণ স্বপ্নের মধ্যে তফাৎ কি করে বোঝা যায়?

শ্রীমা প্রত্যেকের বেলাতেই সেটা ভিন্ন রকমের। কিন্তু কি ধরনের ছাপ পড়ে সেটাই জ্ঞাতব্য। সাধারণত দেখবার সময়েই বোঝা যায়, কারণ প্রতীকী স্বপ্ন ঢের বেশী

পরিষ্কার, নিখুঁত, চের বেশী সময়নুযায়ক, আর সেই সঙ্গে এমন একটা কিছুর চেতনা থাকে যেটা সত্যি।...জানি না...তবে প্রতীকী স্বপ্ন মানুষের ভাল মনে থাকে, মনে রাখার মধ্যে সেটা বিকৃত হয়ে যায় না।

তারপর, এই শেষ না কি?

প্রশ্ন: না 'ষতীন্দ্রের' একটা প্রশ্ন আছে।

শ্রীমা তাই বুঝি! ও বাচ্চাটি আবার কি জানতে চায়?

প্রশ্ন ও জানতে চায়, কেউ যখন খুব কষ্ট পাচ্ছে, খুব ক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে, তখন সে কি করে শান্তিতে ঘুমোতে পারে?

শ্রীমা এ জন্যে একটি বিশেষ যৌগিক শক্তিকে অধিকার করা দরকার। সব চেয়ে ভাল উপায় একটি আছে, একেবারে চরম এবং অখণ্ড, তা হল, দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়া।

দেহটা যখন কষ্ট পাচ্ছে, যখন মানুষটার জ্বর হয়েছে বা সে অসুস্থ বোধ করছে অথবা দেহটি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে, তখন একমাত্র কর্তব্য হল, দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়া, আর প্রাণময় সত্তা থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়া। তারপর মানুষটা যদি যোগী হয়, আর তার যদি জানা থাকে, তাহলে সে একটু উপরে উঠে যায়, যাতে নিজের দেহটিকে সে লক্ষ করতে পারে। প্রাণময় সত্তাটি যদি অতি স্থূল আকারে নিষ্ক্রান্ত হয়ে থাকে, সে দেহটিকে লক্ষ করতে পারে। নিজের দেহকে সে নিজে দেখতে পায়, আর তখন, ঠিক সেই মুহূর্তে, যে পরিমাণে চেতনা এবং যে পরিমাণে শক্তি তার আছে, সেই সব শক্তির রশ্মি দেহের যে অংশটি অসুস্থ তার উপর সে প্রয়োগ করতে পারে। কিন্তু এ হল একেবারে শ্রেষ্ট উপায়, অসুখ সারাবার পক্ষে এ উপায় সব চেয়ে সুনিশ্চিত, আর সেই সঙ্গে যদি তার শক্তি এবং জ্ঞান থাকে, তাহলে ত একেবারে অব্যর্থ।

যে কোন বিকারের হাত থেকেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে অব্যাহতি পাওয়া যেতে পারে। তবে তার জন্যে চাই সত্তার রীতিমতো শিক্ষা এবং সুদীর্ঘ অভ্যাস। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ আপনা থেকেই তা হয়ে যায় না। যথার্থত যন্ত্রণা যখন এতই অসহ্য হয়ে দাঁড়ায় যে মানুষ তখন একেবারে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে, তখন সেটা আপনা থেকেই সহজাত ভাবে হয়ে যায়। অজ্ঞান হওয়া মানেই দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়া। তাই কেউ কেউ যাদের চেতনা তাদের দেহের সঙ্গে একেবারে এক হয়ে নেই, তাদের বেশী অসুখ বিসুখ করলে বা যন্ত্রণা খুব বেশী অসহ্য বোধ হলে তারা অজ্ঞান হয়ে যায়।

যন্ত্রণা সহ্যের অতীত হলে মানুষ অজ্ঞান হয়ে যায়, অর্থাৎ সে তখন দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়, সত্যিই সে তখন বেরিয়ে যায় এবং দেহটি একেবারে জড়বৎ পড়ে থাকে। অবশ্য সেই সময় তার পাশে এমন কেউ থাকা দরকার যার যথেষ্ট পরিমাণ অভিজ্ঞতা আছে এবং সে তাকে জাগিয়ে তোলার জন্যে নাড়া দেবে না, কারণ ওই অবস্থাটা হল যন্ত্রণা এড়াবার একটা উপায়। তেমনি আবার তখন যদি এমন কেউ মানুষটার পাশে থাকে যার ভয়ে একেবারে বুদ্ধিলোপ হয়ে গেছে, আর সে যদি তার মাথায় মুখে ঠাণ্ডা জলের ছিটে দেয় বা তাকে ধরে নাড়া দেয়, তাহলে তার ফল মারাত্মক হয়ে দাঁড়াতে পারে। তা না হলে

মানুষটার...স্বভাবতই তখন যন্ত্রণাটাকে রেকর্ড করে রাখবার মতন চেতনা থাকে না. তাই একটু একটু করে অবস্থাটা শান্ত হয়ে আসে এবং প্রায় প্রত্যেকের বেলাতেই দেহটি থাকে সম্পূর্ণ স্থির নিশ্চল ভাবে, এমন কি যন্ত্রণা সত্বেও তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় বিশ্রাম করতে পারে। তখন তার মধ্যে কোন যন্ত্রণাবোধ আর থাকে না। এটাই খুব ভাল উপায়।

আরও সব ছোটখাটো উপায় আছে। সে সবের ফলও ছোটখাটো হয়ে থাকে; আর সেগুলো প্রয়োগ করাও খুব সোজা নয়। যেমন দেহের যে অংশটা যন্ত্রণা ভোগ করছে, তার সঙ্গে মস্তিষ্কের যে সংযোগ সূত্রটি রয়েছে, তাকে বিযুক্ত করতে পারার জ্ঞান থাকা চাই। সংযোগ সূত্রটি বিচ্ছিন্ন করে দিলেই মস্তিষ্ক আর রেকর্ড করে না. যন্ত্রণাবোধ আর থাকে না। এটাই করা হয়ে থাকে. ডাক্তারেরা অনুভূতি বিলুপ্ত করবার জন্যে ওষুধ (anaesthesia) প্রয়োগ করে থাকেন। তাঁরা দেহের যে অংশটি বিকারগ্রস্ত তার সঙ্গে যে নার্ভটি মস্তিষ্কের সঙ্গে সংযুক্ত, সেটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেন। তখন মস্তিষ্ক আর কিছুই অনুভব করতে পারে না। অথবা অতি সামান্যই অনুভব করে। আর এ সবই একভাবে না একভাবে সেই একই জিনিসে গিয়ে দাঁড় করায়। আর এ সবের জন্যেই অলৌকিক শক্তির উপর অধিকার থাকা চাই, অথবা অনুভূতি বিলুপ্তির পদ্ধতি কি ভাবে প্রয়োগ করতে হয়, তা জানা চাই। কেউ কেউ আছে যাদের এমনটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে হয়, যদিও সংখ্যায় তারা খুব বেশী নয়— খুবই অল্প। স্পষ্টতই তেমন অবস্থা লাভ না করতে পেরেও একটা জিনিস আছে, যেটা মানুষ চেষ্টা করে দেখতে পারে, তা হল যন্ত্রণাটার উপর মনঃসংযোগ না করা, যতখানি পার ওর থেকে মনকে সরিয়ে নিয়ে কষ্টের কথা একটুও ভাববে না, যতদূর সম্ভব কম মন দেবে, বিশেষ করে ওর উপর একাগ্র মনঃসংযোগ করবে না, গ্রাহ্যই করবে না যাকে বলে। একবার যদি বললে, "ওঃ, আমার বড় কষ্ট হচ্ছে," তৎক্ষণাৎ সেটা আরও বাড়িয়ে তোলা হয়। "ওঃ আমার ব্যথা আরও বাড়ছে" তখন তা আরও বেশী বেড়ে যাবে। ঠিক এই ভাবেই হতে থাকে. কারণ তুমি ওটার উপরেই সম্পূর্ণভাবে মনকে নিবদ্ধ করেছ। আর এভুল মানুষ সর্বদাই করে থাকে। ও বিষয়ে ভাবা, ওইতেই লেগে থাকা, সতর্ক থাকা, কষ্টের ভাবটা লক্ষ করা, প্রভৃতি করলেই স্বভাবত কষ্টটা আসে, এবং তার মাত্রা আরও বেড়ে যায়। সেই জন্যেই শরীরটা যখন ভাল বোধ হচ্ছেনা, তখন সব চেয়ে ভাল কাজ হবে, বই পড়া বা কেউ পড়ছে তা শোনা, সেটা নির্ভর করে, তখন কি অবস্থায় তুমি রয়েছ তার উপর। কিন্তু যদি মনটাকে ওর থেকে সরিয়ে নিতে পার, তাহলে আর কষ্টভোগ করবে না।

বেশ, এরপর, আর কিছু?

প্রশ্ন না, আমাদের স্বপ্ন দেখা কি দরকার?

শ্রীমা : দেখা দরকার? (—স্বপ্ন দেখার—) স্বপ্ন দেখার দরকার। কিন্তু বাছা, দরকার-অদরকার কোন প্রশ্নই ত ওঠে না এর মধ্যে। মানুষ সর্বদাই স্বপ্ন দেখে।

প্রশ্ন কিন্তু কেন মানুষ স্বপ্ন দেখে?

শ্রীমা কেন তুমি পায়ের উপর ভর দিয়ে, মাথাটা উপর দিকে করে হাঁট? আবার খাও, আবার ঘুমোও কেন? এ-ও ঠিক সেই রকম। এর মধ্যে "কেন" নেই, এই হল

সাধারণ ক্রিয়া প্রক্রিয়ার অঙ্গ।

কিন্তু স্বপ্ন জিনিসটা তোমার উপর এই রকম কৃত্রিম উপায়ে চাপিয়ে দেওয়া হয় না। তোমাকে যেমন স্কুলে পাঠানো হয় কিছু শেখবার জন্যে, স্বপ্ন সে ধরনের ব্যাপার মোটেই নয়। ও হল তোমার ভিতরকার স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্মের একটা অঙ্গ, অর্থাৎ সাধারণত এ হল তোমার মাথা, তোমার মস্তিষ্ক, যে কাজ করেই চলে। কখন কখন কেউ যখন বেশ একটু উচ্চ অবস্থায় থাকে তখন ভিতরকার কোন একটা সত্তা সক্রিয় হয়ে ওঠে, সে তার নিজের রাজ্যে গিয়ে তার নিজস্ব জীবনে বাস করে। কিন্তু এ সব বস্তু কোন এক বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে কৃত্রিম উপায়ে গড়ে ওঠে না। এ হল দেহের ক্রিয়াকর্মেরই একটি অঙ্গ। মানুষের জীবনে দিনের বেলার কাজকর্মগুলো যেমন স্বাভাবিক ব্যাপার, স্বপ্নগুলোও ঠিক সেই রকম। তারপর স্বপ্নের মধ্যে মানুষ অল্পবিস্তর লক্ষ করে যে সে বিশেষ কিছুই বুঝতে পারে না, কিন্তু জাগ্রত অবস্থাতেও ত ঠিক সেই একই জিনিস ঘটছে, কারণ—যা কিছুই ঘটুক—তুমি সর্বদাই নিজে নিজে শত শত প্রশ্ন করেই চলেছ, জানতে চাও, কেন, কি ভাবে এবং কি ঘটেছে। তুমি আগে থেকে তার কিছুই জানোনা। কেবল তোমার অভ্যেস হয়ে গেছে যে ব্যাপারগুলো ওই রকমই হয়ে থাকে।

আর কোন প্রশ্ন নেই ত?

প্রশ্ন মা, আমার আরও একটা প্রশ্ন আছে।

শ্রীমা বলো কি! আরও একটা?

প্রশ্ন মা, মানুষ যখন ঘুমোয়, তার তখনকার চেতনা, জাগ্রত অবস্থার চেতনা থেকে আলাদা...

শ্রীমা: হ্যাঁ, এখন তোমার জিজ্ঞাস্য হল "কেন"? (সকলের হাসা)

প্রশ্ন: কি ভাবে আলাদা?

শ্রীমা: কিন্তু তুমি কি কোনদিন লক্ষ করনি যে ওটা আলাদা? যেমন ধর, তোমার দেহগত চেতনা বা তোমার সূক্ষ্মদেহের চেতনা, তোমার প্রাণের চেতনা অথবা নিম্ন প্রাণের বা ঊর্ধ্ব প্রাণের চেতনা, তোমার চৈত্যপুরুষের চেতনা, তোমার মনের চেতনা, প্রত্যেকটি সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। তাই তুমি যখন ঘুমোও তখন তোমার এক চেতনা, আবার তুমি যখন জেগে ওঠো তখন তোমার আর এক চেতনা। জাগ্রত অবস্থায় তুমি দেখ সব কিছু তোমার বাইরে অভিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে, ঘুমের অবস্থায় তুমি দেখ সে সব তোমার ভিতরে রয়েছে। তাই, এ যেন এক অবস্থায় তুমি তোমার থেকে অভিক্ষিপ্ত হয়েছিলে, আর অন্য অবস্থায় তুমি যেন নিজেকে দেখছ ভিতরকার একটা আয়নাতে।

কি বুঝতে পারলে না? খুব ভাল করে নয়!

তা হোক, তফাৎটা কী, তা বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। চেতনার এই সব বিভিন্ন অবস্থার বিষয় বুঝতে হবে, কারণ তা না হলে চিরদিনই একটা গোলমেলে অবস্থায় বাস করতে হবে।

যথার্থত, এ হল, চলার পথে প্রথম পদবিক্ষেপ। এ যেন দড়ির একেবারে গোড়ার ডগাটা। এটাকে যদি গোড়াতেই না ধরে চলতে থাক, পথ হারিয়ে ফেলবে। এ ঠিক দড়ির ডগাটা শক্ত করে ধরার মতন।

এই শেষ তাহলে?

প্রশ্ন না, স্বপ্নে যখন কেউ দেখে, সে মরে গেছে, তার দ্বারা কি বোঝায়?

শ্রীমা আঃ। এ প্রশ্ন আমি বহুবার শুনেছি। পুরো প্রসঙ্গটা আগে জানা দরকার।

এর একটি মানে এই হতে পারে যে, মানুষটা এতখানি উন্নতির পথে এগিয়েছে যে, তাকে আর তার পুরনো ধারার জীবনে মোটেই বাস করতে হবে না, সেটার আর কোন প্রয়োজন নেই। এটাই আমার বিশ্বাস, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাই ঘটে থাকে। তা না হলে ওর কারণটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে পরিবেশের উপর, অর্থাৎ কোন্ কোন্ ঘটনা ওই স্বপ্নটার সঙ্গে জড়িত তার উপর।

অর্থাৎ...সে দেখছে সে মরে গেছে...কি ভাবে তা দেখছে? শুধুই কি দেখছে তার দেহটা অসাড় হয়ে রয়েছে? না-কি এর পিছনে কোন কাহিনী আছে? কিংবা দেখছে সে মরে যাচ্ছে? অথবা দেখছে সে আগেই মরে আছে, নয়ত বা ধরে নিচ্ছে যে সে মরে গেছে কিন্তু সত্যিই মরে নি?

ধর, তুমি যদি দেহটাকে রেখে দিয়ে বেরিয়ে পড়, যেমনটা এইমাত্র বুঝিয়ে বললাম, আর যদি অনেকটা স্থূলভাবে বেরিয়ে যাও, যে প্রাণটা খুবই স্থূল সেখানে চলে যাও, তাহলে বিছানার উপর শোয়া অবস্থায় তোমার দেহটিকে দেখে বোধ হবে যেন সে সত্যিই মরে গেছে, কিন্তু ওই কারণে দেহটা মরে নি। কিন্তু যে আসল ব্যাপারটা জানে না, এমন কেউ যদি বাইরে থেকে লক্ষ করে বা ভাল করে দেখে, তার বোধ হবে মানুষটা সম্পূর্ণ মারা গেছে, তার দেহটা কঠিন হয়ে গেছে, সংজ্ঞা লোপ পেয়েছে। তখন সে যদি জানে, কি চাই এবং কি করা উচিত তাহলে ব্যাপারটা খুবই সহজ হয়। কিন্তু সে যদি তা না জানে, আর যদি কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করতে থাকে, তাহলে ভয়ের দিকে দরজা খুলে দেবে, আর তখন অনেক কিছুই ঘটতে পারে।

তবে যথার্থই আমার মনে হয় না যে, কোটি কোটি বারের মধ্যে এক বারও ও রকম স্বপ্নের মধ্যে পূর্ব নির্দেশ কিছু থাকে, বরং আমার খুবই বিশ্বাস যে, ওর দ্বারা বোঝায় সত্তার কোন একটা ক্ষুদ্র অংশ এখন অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে এবং সেটা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সেই ক্ষুদ্র অংশটাই সব দেহটার রূপ নিয়েছে, আর তাই তুমি স্বপ্নে দেখছ যে তুমি মরে গেছ। কারণ সেই ক্ষুদ্র অংশটার অস্তিত্বই আর তোমার মধ্যে নেই। এমনটা প্রায়ই ঘটে থাকে এবং সেটাই ঢের বেশী যুক্তিসঙ্গত।

এখন কেউ যদি স্বপ্নে মৃত্যু না দেখে একটা কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা দেখে অথবা একটা খুনের দৃশ্য বা ওই ধরনের কোন কিছু দেখে,...সে ক্ষেত্রে সেটা একটা খুব সাংঘাতিক স্বপ্ন, প্রত্যক্ষ ঘটতে দেখেছে, এবং তার দ্বারা হয়ত বোঝায় যে মানুষটা অপশক্তিদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, কেউ একজন কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে সে-গুলোকে তার পিছনে লাগিয়েছে। তেমনটা হলে খুব জোরে টোকা মারবে এবং প্রচণ্ডভাবে তেড়ে উঠবে।

প্রশ্ন : কোন কোন সময় ঘুমোতে ঘুমোতে বেশ টের পাচ্ছি যে আমি ঘুমোচ্ছি, কিন্তু চোখ খুলতে পারি না, কেন এমনটা হয় ?

শ্রীমা অমনটা হয়, যখন দেহ ছেড়ে বেরিয়ে গেছ। তখন জোর করা উচিত নয়, কেবল খুব ধীরে ধীরে দেহের মধ্যে চেতনাকে একনিবিষ্ট করবে এবং একটু অপেক্ষা করবে, যাতে সংযোগটা বেশ স্বাভাবিক হয়। মোটেই জোর করা উচিত নয়।

প্রশ্ন কোন কোন সময় চোখ দুটো সামান্য একটু খোলা থাকে এবং তখন সব কিছু দেখতে পর্যন্ত পারা যায়...।

শ্রীমা কিন্তু নড়াচড়া করা যায় না ! তাই কি ?

প্রশ্ন আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীমা: তার মানে, তখন চেতনার সামান্য একটা অংশমাত্র দেহের মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করেছে, কিন্তু সারা দেহটাকে নড়াচড়া করবার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। তখন কিন্তু নড়াচড়া করা উচিত নয়, কারণ তাহলে নিজের একটা অংশ হারাবার সম্ভাবনা থাকতে পারে। খুব শান্ত থাকতে হবে, আর দেহের উপরে ধীরে ধীরে, খুব ধীরে ধীরে একনিবিষ্ট থাকতে হবে। তার জন্যে এক মিনিট বা বড়জোর দু'মিনিট পর্যন্ত সময় লাগতে পারে।

প্রশ্ন কোনটা হারাতে পারে ?

শ্রীমা যেটা খুশি, যেটা তখন বেরিয়ে গেছে। কারণ সত্তার একটা অংশ বেরিয়ে গেছে, তখন যদি নড়াচড়া কর, সেটার আর ফিরে আসবার সময় থাকে না। ওই ত রয়েছে তোমার পিছনেই বসে (নলিনীদা), তার ঠিক এই রকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সে এক লাফে দেহটাকে জাগিয়ে তুলেছিল, আর যখন দেহে ফিরে এল, তখন সত্যিই সে অনুভব করতে লাগল, কিছু একটা তার কম পড়ছে, তাই না ? (মা নলিনীদার দিকে তাকালেন) (নলিনীদা), হাঁ মা।

তখন আমি তাকে বললাম, গিয়ে শুয়ে পড়ে ধীরে ধীরে দেহের উপর মনঃসংযোগ করতে থাক। তারপর সেটা ফিরে এল। কিন্তু যদি ভয় পাও, তাহলেই ব্যাপারটা জটিল হয়ে দাঁড়াতে পারে।

কিন্তু কখন কাউকে হঠাৎ জাগিয়ে তোলা উচিত নয়। কারণ দেহের মধ্যে নিজেকে গুছিয়ে নিতে তার সময় লাগবে। যেই ঘুম ভাঙ্‌ল, অমনি হপ্ করে বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়া মোটেই ভাল নয়। কিছুক্ষণ একটু স্থির হয়ে চুপটি করে থাকা চাই, ঠিক এই ভাবে. ...যেন নিজের মধ্যে নিজেকে অনুপ্রবিষ্ট করছ, শান্ত ভাবে...খুব শান্ত নিথর। যখন সব বেশ শান্ত হয়েছে, বেশ অনুভব করছ আপাদমস্তক সব ঠিক আছে, তখনই বিছানা থেকে উঠবে, আর সেই শেষ। কিন্তু কখনই বিছানা থেকে ঝট্ করে লাফ দিয়ে উঠে পড়বে না, সেটা মোটেই ভাল নয়। যদিও এমনটা মাঝে মাঝে হয়েছে, কেউ হঠাৎ জেগে উঠে বিছানা থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে, তাদের মাথা ঘুরতে আরম্ভ করেছে আর তারপর পড়ে যাবার মতন অবস্থা হয়েছে। সর্বদাই অবস্থাটা এই ধরনের হওয়া চাই. (ইঙ্গিতে

দেখালেন) যেন তোমার চেতনাকে ধীরে ধীরে একত্রে সংগ্রহ করছ, অথবা দেহের মধ্যে সব জিনিসকে গুছিয়ে তুলছ। বেশ স্থির শান্ত থাকবে, কয়েক সেকেণ্ড যেন নিজেকে গুছিয়ে নেবার সময় দিচ্ছ। তারপর যখন বেশ ভাল করে সব গোছগাছ হয়েছে, তখন ধীরে ধীরে স্বাভাবিকভাবে উঠে পড়বে। আর কিছু? নেই ত? তাহলে এখানেই শেষ।

মায়ের লেখা—মায়ের কথা

জীবন-বিজ্ঞান—৪

অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায়

Science of Living নিয়ে মায়ের আসর আবার বসেছে ২২শে জানুয়ারী, ১৯৫১ সালে। এই প্রবন্ধটি সংক্রান্ত সব কয়টি আসরের খবর আমরা পাই Centenary Edition Vol. 4—এ*। কেবল এই আসরের রেকর্ড করা টেপটি পাওয়া গিয়েছিল বহু কিছুদিন আগে, তাই এটি প্রকাশিত হয়েছে Centenary Vol. 15—এ। এটিও-মন সংক্রান্ত, তাই এখানে উত্থাপন করছি।

Science of Living থেকে পাঠ চলছে। মা পড়ছেন "The mind is...an instrument of formation, of organisation and action, and it is in these functions that it attains its full valuc and real usefulness.[1]

মন কি না সৃজনের যন্ত্র, সংগঠনের যন্ত্র এবং কর্মের যন্ত্র এবং এই ক্রিয়াকলাপগুলির মধ্যেই হয় মনের পরম সার্থকতা। এই হল মনের আসল মূল্য।

মন সৃজনের যন্ত্র, সংগঠনের যন্ত্র এবং কর্মের যন্ত্র কেন? মা বলেছেন মন চিন্তাগুলিকে আকার দেয়, রূপ দেয়। মনের এই সৃষ্টিক্ষমতা থেকে জন্ম নেয় মানসিক একপ্রকার বস্তু (entities) যেগুলি অস্তিত্বশীল হয়ে ওঠে এবং যে-মনটি তাদের সৃষ্টি করল তার থেকে আলাদা জীবন এই entity-গুলির থাকে। তারা হয়ে ওঠে এক একটি আধা-স্বাধীন সত্তা। পূর্ণ স্বাধীনতা না থাকলেও এদের স্বায়ত্ত শাসন আছে বলা যেতে পারে।

মা বলছেন মানুষ একটি চিন্তার জন্ম দেবার সঙ্গে সঙ্গে সেই চিন্তাটি স্বাধীনভাবে বিচরণ আরম্ভ করল। আমার ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল সেটি, অন্য কার কাছে গিয়ে উপস্থিত হল এবং তার নিজের idea, ধারণা, ভাব, কল্পনা বিস্তার করতে আরম্ভ করল।

মা বলছেন, দেহের যেমন substance থাকে, ঠিক তেমনি মনেরও পদার্থ থাকে এবং এই প্লেন-এ মন কিন্তু অসংখ্য আকারের, ফর্ম-এর বা রূপের উদ্ভাবন করতে পারে। এই রূপগুলিকে বাস্তবায়িত (objectivized) করা যায়, দেখতে পাওয়া যায় তাদের, এবং মা বলছেন, এ হল স্বপ্নের একটি সাধারণ ব্যাখ্যা। মা বলছেন যতক্ষণ তুমি জেগে আছ, আছ কর্মচঞ্চল, তুমি দেহের চোখে দেখতে পাও দৈহিকভাবে, কিন্তু কিছু মানুষ আছে যারা মনের চোখেও দেখে একই সঙ্গে। কিন্তু তুমি যখন নিদ্রামগ্ন, তোমার চোখ দুটি বন্ধ, দেহ ঘুমোচ্ছে, মন এবং প্রাণ হয়ে ওঠে কর্মচঞ্চল।

মা বলছেন, মনের স্তরে, মনের তৈরী সব আকারগুলি বা রূপগুলি—অর্থাৎ যে চিন্তাগুলিকে মন একচুয়াল আকার দিয়ে গড়েছে—সেগুলি সব একসময় তোমার কাছে ফিরে আসে। যখন তারা আসে তখন কিন্তু আমরা চিনতে পারি না, মনে হয় যেন তারা সব

* পৃষ্ঠা ৩২৯ থেকে ৩৩৬ পর্যন্ত সব রিপোর্ট-টি পাওয়া যাবে।

বাইরে থেকে এসে সৃষ্টি করেছে স্বপ্ন। মা বলছেন বেশির ভাগ স্বপ্নই তাই।

কিছু লোকের অত্যন্ত সচেতন মন-জীবন থাকে এবং তারা এই mental plane বা মনস্তরে যেতে পারে এবং সেখানে তাদের বিচরণ অতি সচ্ছন্দ—এই মনজগতে চলা-ফেরা প্রায় বাস্তব জগতে চলাফেরার মতই সচ্ছন্দ। তাদের রাত্রিগুলির সম্বন্ধে মা বলছেন "these people have mentally objective nights"[২], তাদের রাত্রিগুলি মনে মনে বাস্তব। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই তা পারে না। কি হয়? না ঘুমের মধ্যে আমাদের মন নিরন্তর খেটে চলে এবং যে নব নব রূপ ধরে সেই রূপগুলির দর্শন মেলে স্বপ্নে।

মা এবার একটি মজার উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন কেমন ভাবে ব্যাপারটি ঘটে। বলছেন, "ধর তুমি দিনের বেলায় কারু সাথে ঝগড়া করেছ। তোমার বেশ দু'কথা শুনিয়ে দিতে ইচ্ছে করেছে, হয়ত তাকে দু'ঘা দিতে ইচ্ছে করেছে। কিন্তু তুমি নিজেকে সামলে নিয়েছ। তাকে তুমি মারলেও না, বললেও না কিছু, কিন্তু তোমার চিন্তা? তোমার মন যে কাজ করে চলেছে, এবং ঘুমের মধ্যে তুমি হঠাৎ একটি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখলে। কেউ যেন তোমার দিকে লাঠি নিয়ে এগিয়ে এল, দুজনে দুজনকে আঘাত করলে এবং বেশ ভাল রকম মারপিট হল। যখন তুমি জেগে উঠলে, তুমি যদি না জান, যদি তুমি না বোঝ কি ঘটে গেল, তুমি বলবে "উঃ কি অপ্রীতিকর স্বপ্নই না দেখলাম!" কিন্তু আসলে তোমার নিজের চিন্তা নিজের কাছে ফিরে এসেছে, এই মূর্তিতে। মা বলছেন, so be on your guard, সতর্ক থেকো। যদি স্বপ্নে কেউ তোমার সঙ্গে নির্দয় ব্যবহার করল, মা বলছেন, প্রথমেই নিজেকে তুমি জিজ্ঞেস করবে, "ওর বিরুদ্ধে আমার মধ্যে কোন অপ্রিয় ভাব পুষে রাখিনি তো?"

চিন্তাগুলি অস্তিত্বশীল এবং জোরাল থাকে সাধারণতঃ যতক্ষণ না তারা সাফল্য লাভ করে বা তাদের অভীষ্টসিদ্ধি হচ্ছে। কিছু মানুষ আছে যারা নিজেদের চিন্তায় আচ্ছন্ন বা আবিষ্ট হয়ে থাকে। তারা একটা কিছু ভাবল, ধরুন চিন্তা বাইরে গেল, আবার ফিরে এসে তার মাথার মধ্যে পাক খেতে থাকল, যেন বাইরে থেকে এসে ঢুকেছে। মা বলছেন, আসলে বুঝতে হবে যে সেটি সেই মানুষটির সম্বন্ধে সৃষ্ট একটি মননমূর্তি ফিরে ফিরে আসছে আর যা মারছে তার জনক মনকে। এটি হল ব্যাপারটির এক দিক।

কিছু চিন্তা অনেক সময় কথা বা একটি বাক্য (sentence) হয়ে, মনের মধ্যে মধ্যে ফিরে ফিরে আসে। ঘ্যান ঘ্যান করে। তখন তাদের হাত থেকে মুক্তির উপায় কি?

মা বলছেন, এক টুকরো কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে সেই বাক্য বা কথাটিকে লিখে ফেল। ব্যাস্, ঐ তার শেষ, সেটি আর ফিরে আসবে না। এইভাবে ওগুলিকে বের করে ফেলে দেওয়া যায়। কেন চলে গেল? ঐ যে মা বলছেন, যতক্ষণ না সফল হচ্ছে ততক্ষণ ওদের অস্তিত্ব থেকে যায়। এ ক্ষেত্রে কি হল? চিন্তাটি খুশী হল, কারণ যেই না লিখে ফেলা সে তো প্রকাশ পেল। সে তো সফল হল। তাই আর সে ফিরবে না।

মা, এতক্ষণ তুমি যে সব চিন্তার কথা বললে সেগুলি হল রাশি রাশি চিন্তাস্রোতে চুনো-পুঁটির দল। এবার বল আমার মধ্যে যখন মন্দ চিন্তা জাগে, আঁকড়ে বসে; তাদের দেখে আমি হয়ত কখনও চটে যাই, বিরক্ত হই, আবার নিজের অজান্তে সেই সব মন্দচিন্তাদের

ভালবাসি প্রশ্রয় দিই—তাদের নিয়ে কি করব?

মা বলছেন, অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে, যতটা সম্ভব সচেতনতা দিয়ে, অত্যন্ত যত্নে তাদের লিখে ফেল। এবার কাগজের টুকরোটিকে তোল, একাগ্র (concentrate) হয়ে কাগজটিকে ছিঁড়ে ফেল। তোমার সংকল্প হবে কি না যেমন ভাবে কাগজের টুকরোটিকে ছিঁড়লাম ঠিক সেই ভাবে চিন্তাটিও যেন মন থেকে খণ্ড খণ্ড হয়ে ছিঁড়ে পড়ে যায়। এই হল মন্দ চিন্তা তাড়াবার মায়ের দেওয়া উপায়।

আগেই বলে নিয়েছি মন হল সংগঠনের যন্ত্র। বাইরের স্তরে অনেকের মন বেশ সুসংগঠিত। তারা তাদের চিন্তা ভাবনাগুলিকে বেশ গুছিয়ে নিতে পারে। ঐ পারাটিও নেহাৎই একটা মামুলি ব্যাপার নয়।

মা বলছেন, যদি তুমি নিজের ভেতরটা দেখ, দেখতে পাবে যথেষ্ট পরস্পরবিরোধী চিন্তা আছে তোমার মধ্যে, এবং যদি তুমি তাদের সংগঠনের কাজে যত্ন না নিয়ে থাক, তাহলে দেখবে তোমার মাথার মধ্যে তারা পাশাপাশি বাস করছে এবং তীব্র বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে।

মা বলছেন, "আমি আর একটি জিনিস লক্ষ্য করেছি। যাদের মনের ভিতরে অরাজকতা, তাদের ঘরে এবং জিনিসপত্রে একই প্রকার বিশৃঙ্খলা দেখা যায়।" বলছেন, আমি দেখেছি যাদের মন সুবিন্যস্ত নয়, যদি তুমি তাদের দেরাজ কিংবা আলমারি খোল, দেখবে সেখানে যেন এক একটি মিনি কুরুক্ষেত্র—সব কিছু তালগোল পাকিয়ে আছে। মা বলছেন, অনেক বুদ্ধিজীবী লোকের, বিশেষ করে লেখকদের অভ্যাস থাকে টুকরো টুকরো কাগজের স্লিপে নোট লিখে রাখা। কিন্তু বেশির ভাগই লেখার পরই তারা ভুলে যায় টুকরোটিকে কোথায় রাখল। তারপর হঠাৎ যখন দরকার পড়ে, তখন খোঁজ খোঁজ, মনে নেই, উপরের জিনিস নীচে, নীচেরগুলি উপরে হাঁটকে হাঁটকে অস্থির। হয়ত সেটি পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত কাপড়ের আলমারিতে গোঁজা অবস্থায়।

অপর দিকে কিছু মানুষ আছেন যাঁরা তেমন বুদ্ধির কারবারী নন। একটু সাদামাঠা। তাদের হয়ত ধারণা-ভাবনা কম, কিন্তু তারা কষ্ট করে টুনির ধন গুছিয়ে রেখেছে। মা বলছেন, যদি তুমি তাদের আলমারি খোল, দেখবে তাদের হয়ত অল্পই জিনিস-পত্র। কিন্তু সেগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে সাজানো, কারণ মা বলছেন, মনটি তাদের যেমন ভাবে গুছানো তাদের বাইরের জিনিসপত্রগুলিও ঠিকঠাক সাজানো। মন যখন সংগঠনের যন্ত্র তখন ভিতর বাইরে দুইই তার কাজের মধ্যে পড়ে।

এই সংগঠন করতে পারা বা করতে চাওয়া জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ, মা বলছেন। বলছেন, যদি সংগঠন করতে শিখতে চাও তবে তোমার দেরাজ-আলমারি টেবিলের ড্রয়ার থেকেই আরম্ভ কর এবং দেখতে দেখতে শেষে মাথার ভিতরটাও গুছিয়ে তুলতে পারবে! কিন্তু লোকের একসঙ্গে দুই করা দরকার। প্রথম কাজ হল মনের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা-কল্পনা-গুলি দেখতে পারা, তবেই তো গুছানোর কাজ আরম্ভ হবে। অন্তত দেরাজের মধ্যে কাপড়-জামাগুলি তো দেখতে পাওয়া যায়। কি গুছাবো তাতো দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু মনের ভিতর? অনেকে যে মনের ভেতরটা দেখতে পায় না। তারা গুছাবে কি? তাই বলছেন যে বেশ কিছু যত্ন দিতে হবে। সময়ও একটু দিতে হবে। এ ব্যাপারে একটু বুদ্ধি লাগানো দরকার যেমন ধরুন মা বলছেন, প্রতিদিন যেগুলি ব্যবহার করা হয় সেগুলিকে

নাসে একবারে ব্যবহারের জিনিসের নিচে রাখবেন না।

মন হল কর্মের যন্ত্র। কি ভাবে, না চিন্তা থেকেই তৈরী হয় প্ল্যান। মন কি করল না প্ল্যান অর একশন স্থির করে নিল এবং ঐ যে স্বাধীন সক্রিয় মনন্মূর্তিদের কথা মা বলছেন, যা একটু আগে আলোচনা করলাম, তাদের সাহায্যে মন আমাদের সত্তার অন্য অংশগুলিকে সক্রিয় বা প্ররোচিত বা উত্তেজিত করে কাজে লাগিয়ে দেয়। বলা বাহুল্য, সত্তার যে অন্য অংশগুলিকে মন অনুপ্রাণিত করে সেগুলি হল vital and physical অর্থাৎ প্রাণময় এবং অন্নময় অংশ।

মা বলছেন, অনেক সময় দেখা যায় যে একটি কাজ করবে ভেবেছ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে কাজে হাত দিচ্ছ না, কিন্তু যে চিন্তাটি কাজে প্রকাশিত হতে চাইছে সেটি ফিরে ফিরে আসছে তোমার কাছে। হয়ত তুমি মনে মনে নিজেকে বলছ, "এ কাজ আমাকে করতেই হবে, করতেই হবে।" এই চিন্তাটি চলতেই থাকল তোমার মধ্যে যতক্ষণ না তুমি সব কিছু ছেড়ে কাজটি করতে লেগে না গেলে। মা বলছেন, এইটি হল মনের কর্মশক্তি। এই কর্মশক্তিকে আয়ত্ত করার আগে, মা চাইছেন আমরা যেন নিজের মনকে সংগঠিত করতে শিখে নিই। শিখে নিই কেমন করে মনে সৌষম্য আনতে হয় এবং তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। সে ক্ষমতাটি করায়ত্ত হলে, মা বলছেন, তবেই কাজ করতে পারা যাবে purposefully, নয়তো ব্যাপারটা দাঁড়াবে যা বহুলোকের ক্ষেত্রে হয়—চিন্তাগুলি জলের উপর মোচার খোলার মতো নেচে ভেসে বেড়ায় এবং তাদের নিজের তৈরী মনন্মূর্তিগুলির সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞান।

এবার দেখি অসংগঠিত মন দেখতে কেমন? মা বলছেন সেতো একটি পাবলিক পার্ক। মন যদি পাবলিক পার্কের মতো হয় তাহলে দেখা যাক তুলনা করলে কেমন দেখায়? মা বলছেন, চতুর্দিক থেকে চিন্তাগুলি বেড়াতে আসে মাথার মধ্যে, যেমন আমরা যাই পার্কে হাওয়া খেতে। এসে চিন্তাগুলি জড় হয়। অনেকসময় তাদের মধ্যে খটাপটি বাধে। দাঙ্গাও। বিচিত্র কোলাহল। কি করণীয় তা সব সময় ঠাহর করা যায় না, পরিষ্কার বোঝাও যায় না।

আবার অনেক মানুষ আছে যারা মোটামুটি অক্রিয় (neutral) মানসিক স্থিতিতে বাস করে। তারা যখন সুগঠিত মনের কোন মানুষের সংস্পর্শে আসে তখন তার অক্রিয় মন সাড়া দেয় এবং বেশ স্বচ্ছ ভাবেই ভাবতে পারে। তেমনি আবার উল্টোটিও দেখা যায়। সাধারণতঃ যে মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতা বেশ স্পষ্ট তারা সেই রকম লোকের আওতায় এলে তাদের সব কেমন যেন গুলিয়ে যায়। কি বলতে চাইছিল তার খেই হারিয়ে গেল। এই মানসিক ব্যাধিটি ছোঁয়াচে।

মা একটি পরোক্ষ আধ্যাত্মিক প্রভাবের কথাও বলছেন। বলছেন যে মানুষটি চিন্তায় সংযম এনেছে, মনকে করেছে নীরব, সেই রকম মানুষের সংস্পর্শে এলে আপনা থেকেই সহসা শান্তি নীরবতা নেমে আসে তোমার মধ্যে। অবশ্য এরূপ ঘটনা ক্বচিৎ কখনও ঘটে। কিন্তু ঘটে।

শ্রীমায়ের রচনা Science of Living মূল প্রবন্ধটি আলোচনার সময় আমরা পড়েছিলাম একটি অংশ যেখানে মা একটি অনুশীলনের কথা বলেছিলেন। সেই অংশটি

পড়ছেন তাঁর আসরে

There is another practice which can be very helpful to the progress of the consciousness. Whenever there is a disagreement on any matter, such as a decision to be taken, or an action to be carried out, one must never remain closed up in one's own conception or point of view. On the contrary, one must make an effort to understand the other's point of view, to put oneself in his place and instead of quarrelling or even fighting, find the solution which can reasonably satisfy both parties; there always is one for men of goodwill."[3]

মা বলছেন, এই অভ্যাসটি চেতনার উন্নতিতে সাহায্য করে। মা বলছেন, যখন বিবাদ বাধে কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে কিংবা কোন কাজ সম্পন্ন করতে, তখন কেবল নিজের দৃষ্টিকোণ এবং নিজের ধারণার খোয়াটোপের মধ্যে আটকে থাকলে লাভ নেই। বরং উল্টোটি করার কথা মা বলছেন। অর্থাৎ ধৈর্যের সঙ্গে চেষ্টা করতে হবে যাতে অন্য লোকের বক্তব্য বুঝতে পারি, দরকার পড়লে আমি যেন নিজেকে সরিয়ে আনতে পারি সঠিক স্থানে। ঝগড়া মারামারি না করে এমন একটি সমাধান বার করা উচিত যা মোটামুটি দুই পক্ষকেই খুশী করতে পারে। মা বলছেন men of goodwill. মঙ্গলকামী মানুষের সব সময়েই একটি পথ থাকে।

স্বভাবতই আমরা সবাই কেবল নিজের দৃষ্টিকোণটিই দেখে থাকি এবং সেটিকেই স্থির সত্য বলে জানি। অন্য লোকের দৃষ্টিকোণের সত্যতা স্বীকার করা খুবই শক্ত ব্যাপার, মনে হয় স্বীকার করলে আমার পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। কোন একটি সমস্যার সত্যকার সমাধান হয়েছে তখনই বলা যায় যখন দুই পক্ষ কেবল আলোচনার টেবিলে সমাধানটিকে মেনে নিল কেবল তাই নয় বরং পরে নিজ নিজ ক্ষেত্রে সেটিকে কার্যকরী করল। দুইপক্ষের goodwill এর প্রমাণ হল তাই। সেইটি হয়না, বিশেষ করে একটু জাতির ক্ষেত্রে। দেখা যায় দুটি পররাষ্ট্র মন্ত্রীর মধ্যে অতি মনোরম পরিবেশে আলোচনা চলল। ভোজসভায় সুন্দর ভাষণ হল। বড় আশা নিয়ে দেশে ফিরলেন বিদেশ-মন্ত্রী। পরদিন সকালে সংবাদপত্রে দেখা গেল মারণ-অস্ত্র বোঝাই জাহাজ তাদের ঘাটে ভিড়তে দেরী নেই। সবটাই মৌখিক। মা বলছেন আসল কথা যেটিকে স্বীকার করতে হবে তা হল, প্রত্যেক জাতির বাঁচার অধিকার আছে : এবং তাকে বাঁচার স্থান দিতে হবে, দিতে হবে অধিকার। এখানেই goodwill এর প্রশ্ন।

ব্যক্তির ক্ষেত্রেও তাই। প্রত্যেকের বলার অধিকার আছে। তা যে মানতে হবে। একজন যদি আমার মতের বিপরীত প্রস্তাব তোলে এবং তার চিন্তায় সত্য যদি কিছু থাকে, তবে সেটি দেখতে পারা চাই। তার কারণগুলি আমার থেকে ভালও হতে পারে। এখানেই goodwill-এর প্রশ্ন মা তুলছেন।

মনে রাখতে হবে যে মা compromise চাইছেন না। আপস-মীমাংসা অন্তর্বর্তিকালীন একটা ঢিলে ব্যবস্থা হতে পারে তবে তা টেকে না। মা বলছেন, A kind

of harmonisation must be found. একটি সুসঙ্গতিপূর্ণ অবস্থা খুঁজে বার করার কথা।

এবার মায়ের আসর, ২৫ জানুয়ারী ১৯৫১। এই আসরে মা আলোচনা করছেন vital বা প্রাণ সম্বন্ধে।

শ্রীমা পড়ছেন

The vital being in us is the seat of impulses and desires, of enthusiasm and violence, of dynamic energy and desperate depressions, of passions and revolts. It can set everything in motion, build and realise; but it can also destroy and mar everything.... It seems to be, in the human being, the most difficult part to train."[4]

মা বলছেন, প্রাণসত্তাই হল আবেগ এবং বাসনার বাস্তুভূমি, সেখানকার বাসিন্দা হল পবন উদ্যম এবং হিংসা, সেই উৎসমুখ থেকেই আসে বেগবান শক্তি-স্রোত. অন্যদিকে থাকে বিষণ্ণতা কিংবা হতোদ্যম, রোষ, ক্রোধ, আসক্তি বা বিদ্রোহ। প্রাণের গুণ হল যে সে সব কিছুকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে, গড়তে পারে, এনে দিতে পারে সাফল্য। অন্যদিকে সব কিছুকে ধ্বংসও করতে পারে। তাই এই বস্তুটিকে সুশিক্ষিত করা কঠিন।

এবার দেখা যাক আমাদের মধ্যে প্রয়োজনই বা কোনটি এবং কোনটিকেই বা বলব বাসনা। এই দুটির—প্রয়োজন এবং বাসনা—মধ্যে কোথায় টানব সীমারেখা ? যোগপথে এলে অবশ্য বাসনা তো দূরে থাক প্রয়োজন বলে কিছু রাখতে নেই, তাই সে সব চাহিদার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

মা কিন্তু Science of Living প্রবন্ধটি সেই ধরনের যোগীদের জন্য লেখেননি। মা লিখেছিলেন সেই মানুষের জন্য যে যোগী নয় অথচ নিজেকে খুঁজতে চায় এবং নিজের উপর আপন কর্তৃত্ব আনতে চায়।

মা বলছেন যে এ কাজে হাত দিলে বেশ একটি বড় সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয় এবং সেই মুহূর্তের দাবী হল অস্বাভাবিক সারল্য, কারণ মা বলছেন, জীবনের সঙ্গে প্রাণের প্রথম সাক্ষাৎ হয় বাসনার মাধ্যমে।

কিন্তু জীবনের কিছু প্রয়োজন আছে।

কেমন করে জানব যে যে-বস্তুটিকে আমি চাইছি তা আমার নিছক প্রয়োজন মেটানর জন্য না, সেটি চাইছি বাসনা-কামনা তৃপ্তির জন্য ?

মা বলছেন, সেটি বুঝতে হলে তোমায় নিজেকে নিরীক্ষণ করতে হবে গভীর মনোযোগে এবং চাহিদা সংগ্রহ করার জন্য, যদি কিছু অন্তরে, হয়ত খুবই ক্ষুদ্র, তীব্র ভাইব্রেশন্ জেগে, তাহলে চোখ বুজে ধরে নিতে পারবে যে সেখানে বাসনা আছে। মা উদাহরণ দিচ্ছেন। বলছেন, "যেমন ধরা যাক অন্ন। তোমরা বলবে, 'এই খাবার আমার প্রয়োজন' তুমি বিশ্বাস কর, তুমি কল্পনা কর যে তোমার ঐ জিনিসগুলি দরকার এবং সেগুলি পাবার প্রয়োজনীয় উপায় তুমি আবিষ্কার কর। এখন সেইটা বাসনা না প্রয়োজন কার এক্তিয়ারে পড়ে জানতে হলে, মা বলছেন, নিজেকে খতিয়ে দেখে জিজ্ঞাসা কর, "কি হবে যদি আমি ঐ

জিনিসটি না পাই ?" যদি তৎক্ষণাৎ জবাব আসে, "না, না খুব খারাপ হবে" তাহলে সন্দেহ নেই যে সেটি বাসনা। মা বলছেন সব ব্যাপারেই এই একই ফরমুলা।

বলছেন, প্রত্যেকটি সমস্যার ব্যাপারেই তুমি অল্প পিছিয়ে এস (step back). দেখ নিজের দিকে এবং প্রশ্ন কর, "আমাকে কি ওটিকে পেতেই হবে ?" যদি সেই মুহূর্তটিতে তোমার অন্তর সেই আকাঙ্খিত বস্তুটিকে পাবার আনন্দে নেচে ওঠে, তাহলে অবশ্যই বাসনা আছে।" অপর দিকে তোমার ভিতর থেকে উঠল, 'থাকুগে, ওটা আমার চাইনা' লক্ষ করতে হবে যে সেই কথা বলার পর আমি যদি বেশ বিষণ্ণ বোধ করি, তাহলেও সেটি বাসনা। তারপর মা বলছেন If the vital is not to deceive you, you must not only be very mindful but your sincerity must also be almost miraculous — it is not to discourage you that I have used the word "miraculous"; on the contrary, it is in order to give you a greater aspiration for sincerity"

আমরা যদি চাই যে প্রাণ আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করুক তবে আমাদের যে শুধু সতর্কই হতে হবে তাই নয়, আমাদের আন্তরিকতাকে প্রায় অলৌকিক পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। সঙ্গে সঙ্গেই মা বলছেন, 'মিরাকুলাস' বা অলৌকিক কথাটি তোমায় নিরুৎসাহ করার জন্য বলিনি, বলেছি তোমার আন্তরিকতার মধ্যে অনেক বেশী আশ্পৃহা সংযোজনের জন্য।

Science of Living প্রবন্ধটির আর এক জায়গায় আছে "With the collaboration of the vital no realisation seems impossible, no transformation impracticable."[5] প্রাণের সহযোগিতা থাকলে কোন সিদ্ধিই আর অসম্ভব মনে হবে না, কোন রূপান্তরই আর স্বপ্ন নয়। এই দুটি লাইন পড়ে মা বলছেন, প্রাণ নিজের শক্তি সম্বন্ধে খুব সচেতন এবং সেইজন্যই তার এত গুরুত্ব প্রাণ এমন সক্রিয় শক্তিসম্পন্ন যে তার সামনে কোন বাধাই খুব বড় বাধা নয়। কখন প্রাণ বাধা নয় ? মা বলছেন, যদি সে অবশ্য তোমার স্বপক্ষে থাকে। যদি সে সহযোগিতা করে তবে সবকিছুই চমৎকার ; কিন্তু তার সহযোগিতা সব সময় পাওয়া সহজ ব্যাপার নয়।

মা বলছেন, প্রাণ নামক শ্রমিকটি খুব ভাল। খুব, খুব ভাল খাটতে পারে, কিন্তু কাজের মধ্যে সে সব সময় কেবল নিজের তৃপ্তি খোঁজে। কাজের মধ্যে থেকে সে কিছু একটা নিজের জন্য আদায় করে নিতে চায়। সেটি কি না যতটা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি নিংড়ে নেওয়া যায়, যতটা সুবিধে পাওয়া যায়।

যদি কোন কারণে, অনেক কারণ তো থাকতে পারে, মা বলছেন—তাকে যেই তৃপ্তি আহরণে বঞ্চিত করা হল, অমনি সে আর খুশী নয়, গেল বিগড়ে। সোচ্চার হল প্রাণ, 'এ অবিচার, ঘোর অবিচার, আমি খাটলাম, আর কিনা তার বদলে আমায় খালি হাতে বিদায় দিলে।" ব্যাস্, অমনি তার চাপা রাগে মুখ কাল হয়ে উঠল, আর সে নড়ে না, অবস্থান ধর্মঘট আরম্ভ করে দিল। মুখটি টেপা। কথাটি নেই।

আবার ক্ষেত্র বিশেষে প্রাণ আলটিমেটাম্ দিয়ে বসে। বলে, "আমি নেই," "I do not exist"—যখন প্রাণ এই কাণ্ড করে বসে তখন আমাদের অবস্থাটি কেমন হয় ?

মা বলছেন, মনে হবে শরীরের সব শক্তি যেন নিঙড়ে বেরিয়ে গেছে। ক্লান্ত, অবসন্ন লাগে, যেন কিছু করার ক্ষমতা ফুরিয়ে গেছে।

মা বলছেন, অনেক সময় ব্যাপারটা কিন্তু নেহাৎই খারাপের দিকে মোড় নিতে পারে, কারণ, বলে রাখি, মনের সঙ্গে প্রাণের বড় গলাগলি বন্ধুত্ব; এ মন কিন্তু যুক্তিবাদী মন নয়, এ হল physical mind, অন্নময় মন—এই অন্নময় মন প্রাণের বড় অন্তরঙ্গ বন্ধু। যেই প্রাণ বলতে আরম্ভ করে, 'আমার আর ঐ ব্যাপারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে, আমি হাত ধুয়ে ফেলেছি।' মনটি তখন গুটিগুটি এসে দাঁড়িয়েছে প্রাণের পাশে উস্কানি দিতে। ভাল ভাল কারণ দেখিয়ে চমৎকার ব্যাখ্যা খাড়া করা হল এবং দেখতে দেখতে সেই অনেক শোনা অনেক দেখা নাটকের শেষ অঙ্কের পুনরাবৃত্তি, কিনা আমরা বলে উঠি, "এ জীবন বাঁচার যোগ্য নয়, মানুষগুলো নিদারুণ বিরক্তিকর, সব পরিবেশ আমার বিরুদ্ধে, সব কিছু ছেড়েছুড়ে পালাতে পারলে আমি বাঁচি।" এই সব আরও কত কি।

যদি প্রাণের পাগলামি বেড়ে ওঠে এবং সময়মত যদি তার প্রতিকারে সক্রিয় না হওয়া যায়, মা বলছেন, তাহলে তুমি ডুবে যাবে হতাশায়। বলবে, "এ জীবন আমার মতো মানুষের জন্য সৃষ্টি হয়নি ; হেথা নয়, অন্য কোনখানে আমি ভাল থাকব, ভাল থাকব স্বর্গে যেখানে সবাই কত ভাল, শুধু তাই নয়, সেখানে যে যা চায় তাই করতে পারে," ইত্যাদি বাজে কথা।

মা বলছেন, এসব তো প্রায়ই হয়, কিন্তু এক এক যুক্তির ছোট্ট একটি ফুটফুটে ছোনাকি উঠল জ্বলে, সে বলল : 'আঃ প্রহসন তো যথেষ্ট হল।'

মা বলছেন, যদি জীবন, অস্তিত্ব তোমার বাসনার সুরে সুর না মেলায়, অমনি উথলে ওঠে কান্না, "যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়, এই পৃথিবী বড় দুঃখের, বড় প্রতারণাপূর্ণ, আমার মরণই ভাল।" তারপর আসে সেই মুহূর্ত যখন অবস্থা হয়ে ওঠে সঙ্কটজনক ; তখন নিষ্ক্রিয়তা বদলে যায় বিদ্রোহে এবং বিষণ্ণতা পালটায় অসন্তোষে। যারা স্বভাব-রাগী তারা চটে ওঠে, বিদ্রোহ করে, ভেঙে ফেলতে চায় সব কিছু, উদ্ধত আস্ফালন করে চিৎকার করে, "দেখ আমি যা চাই তা করা হচ্ছে না, ওদের কপালে শাস্তি আছে।" দেখতে দেখতে ব্যাপারটি আরও গুরুতর রূপ নেয়, কারণ মন তো বুদ্ধি যোগাতে সর্বদাই তৈরী। অতএব জাগে তখন প্রতিশোধস্পৃহা। মা বলছেন, আত্মবিশ্বাসহীনতা থেকে মানুষ এক ধরনের বোকামির কাজ করে, বিদ্বেষভাব থেকে আসে আর এক ধরনের আচরণ। আত্মবিশ্বাসহীনের নির্বুদ্ধিতার উদ্বেগ হল ব্যক্তিগত কিন্তু বিদ্বেষভাবের নির্বুদ্ধিতা অন্যদের উদ্বিগ্ন করে, এবং সময় সময় বেশ গুরুতর আকার ধারণ করে। এ ধরনের আকস্মিক প্রকোপ যখন পেয়ে বসে, তখন আমি কি করব?

মা বলছেন ঠিক সেই অবস্থাটিতে কিছু না করতে। নিজেকে বলবে, "আমি নড়ছি না, আমি ঝড় বয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করব।" কেন শান্ত থাকব? কারণ, মা বলছেন, যে মাত্র কয়েক মুহূর্তের ঝড় অনেকদিনের প্রয়াসকে নষ্ট করে দিতে পারে।* রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,

* "An idiot hour destroys what centuries made"
— *Savitri*, Sri Aurobindo

বহুযুগের তাপসদের সাধনধন যত
দানব পদ দলনে হল গুঁড়া

দানবকে নম্র হতে সময় দিতে হবে তাই শান্ত হতে হবে।

মা এবার আশ্বাস দিচ্ছেন। Science of Living প্রবন্ধ থেকে আর একটি অংশ তুলে ধরছেন,

"These crises are of less duration and are less dangerous in the case of those who have established a contact with their psychic being sufficient to keep alive in them the flame of aspiration and the consciousness of the ideal to be realised. They can, with the help of this consciousness, deal with their vital as one deals with a child in revolt, with patience and perseverance showing it the truth and light, endeavouring to convince it and awaken in it the goodwill which for a moment was veiled."[6]

কি আশ্বাস? বলছেন যারা নিজের চৈত্যসত্তার সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলেছেন, তাঁদের জন্য এই সঙ্কটকালগুলি অল্পসময়াদি কিংবা কম বিপদজনক হয়, কারণ ঐ সত্তার সঙ্গে যোগাযোগই যে যথেষ্ট। ঝড়ের রাতে ঐ যোগাযোগটুকুই যে আস্পৃহার দীপশিখাটিকে বাঁচিয়ে রাখে। আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখে। যাঁদের চৈত্যসত্তার সঙ্গে আদানপ্রদান আছে, তাঁরা সেই চেতনার সাহায্যে প্রাণের অবুঝপনার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে পারেন, অনেকটা যেমন করে একজন মা অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে তার বেয়াড়া শিশুকে শোধরাতে বলে। মা বলছেন, ধৈর্যের সঙ্গে অধ্যবসায়ের সঙ্গে বারবার প্রাণের মুখটি ফেরাতে হবে সত্যের দিকে, আলোর দিকে। চেষ্টা করে প্রাণের মধ্যে প্রত্যয় জাগাতে হবে, জাগাতে হবে মঙ্গলকামনা, যে দিকে তার চোখ অন্ধ ছিল।

কথা হল, সবাই কি তা পারে? যাদের চৈত্যের সঙ্গে যোগাযোগ নেই, দেওয়া-নেওয়া নেই বা এখনও গড়ে ওঠেনি, তাদের কি হবে? তাদের জন্যও উপায় বলে দিচ্ছেন মা। বলছেন, যারা সত্যিই আন্তরিক, সত্যই মঙ্গলকামী, তারা এই সব হঠাৎ-আসা আক্রমণগুলিকে দেখতে পারেন উন্নতির পথ বলে। প্রতিটি আক্রমণ রূপান্তরিত হতে পারে, নৈক্যের দিকে দেখা দিতে পারে এক একটি নতুন পদক্ষেপরূপে।

যদি? যদি কি? মা বলছেন যদি তোমার যথেষ্ট আন্তরিকতা থাকে নিজের অন্তরে সরাসরি মুখোমুখি হবার। কার সঙ্গে? মা সেই 'পেয়ে বসা পাগলামির' কারণটির সঙ্গে! কারণটি কী হতে পারে? হয়ত যে ভুলটি আমি করেছি, চিন্তায় যে ক্লেদটুকু ছিল মিশে, যে ভুলটিকে আমি ভেবেছিলাম ঠিক। দেখতে পাওয়া চাই সেই দুর্বলতাটুকুকে, চিনতে পারা চাই হিংসা ভাবটি অথবা দম্ভের ছোঁয়াচ লাগা অবস্থাটি। এখানে একটা কথা বলে রাখি, মা বলছেন যে মনের থেকে প্রাণ দার্ঢ্যিক অনেক বেশী। তা এই দুর্বলতাই বলুন, হিংসা কিংবা দম্ভই বলুন, মা বলছেন, যদি তাদের চোখে চোখ রাখতে পার সোজাসুজি এবং যদি স্বীকার কর, নিজের অন্তরে, আন্তরিকভাবে, যে যা হয়েছে তা

তোমার ভুলের জন্য হয়েছে, তবে আগুনের পরশমণি ছুঁইয়ে সেই আক্রান্ত স্থানটিতে পূর্ণের পরশ দিতে পারবে। সেই দুর্বলতাটি পরিবর্তিত হবে নতুন চেতনায়। সে হবে পূর্ণ। ঝড় বয়ে যাবার পর দেখবে বিধ্বস্ত হওনি, বরং বড় হয়েছ একটু, সত্যি কিছু উন্নতি করেছ তুমি।

তবে এক ঝড়েই যে কালবৈশাখীর শেষ হয় না। বারবার আকাশ কালো করে। বারবার ঘূর্ণীঝড় বেসামাল ঝাপটা মারে। উন্নতি কারু একটু হল হয়ত, কিন্তু তা টেকে কই?

মা Science of Living থেকে দিচ্ছেন তার উত্তর "Progress may be slow, falls may be frequent, but if a courageous will is maintained one is sure to triumph some day and see all difficulties melt and vanish before the radiant consciousness of truth."[7]

বলছেন উন্নতির গতি মন্থর হতে পারে, পতন হতে পারে বারবার, কিন্তু যদি একটি দৃঢ়চেতা সঙ্কল্প টিকিয়ে রাখা যায় তাহলে জয় একদিন অনিবার্য এবং সে দেখতে পাবে, সমস্ত বাধা মিলিয়ে যাচ্ছে, উবে যাচ্ছে।

মা বলছেন, "আমি যে এখানে দোষ এবং বাধাগুলির উপর জোর দিচ্ছি তা কিন্তু তোমাকে নিরুৎসাহ করার জন্য নয়, বরং বলতে চাই যে প্রয়োজনীয় সাহসের সঙ্গে কাজ করতে এবং হতোদ্যম না হতে। হয়ত তুমি প্রথম চেষ্টায় সফল হওনি; কিন্তু যদি আশ্বাস থাকে তোমার মধ্যে, যদি থাকে সংকল্প, তবে জেনে রেখো অনিবার্যভাবে একদিন, হয়ত কিছুদিন আগে কিংবা পরে, তুমি সফল হবে।"

মা এবার জোর দিয়ে বলছেন, আশ্রমের বাইরে যারা থাকে, যারা সাধারণ চেতনার মানুষ, যারা সংসারের ঝড়ঝাপটায় টালমাটাল, তাদের কথা। বলছেন, এই পথে আশ্রমের অনুকূল পরিবেশে না থেকেও মানুষ নিজেকে জানতে পারে, জয় করতে পারে। নিজে নিজের প্রভু হয়ে, নিজের উপর আপন কর্তৃত্ব কায়েম করতে পারে।

মা বলছেন রণে ভঙ্গ দিলে চলবে না। বলছেন, একটি কথা সব সময় মনে রাখতে হবে, তা হল, খেলার মাঠ ছেড়ে কখনও চলে যেওনা। এ খেলায় জয় পতাকা তুলতে হলে সম্পূর্ণ খেলাটি পুরো সময় অবধি খেলে যেতে হবে।

মন-প্রাণের ছেড়ে এবার মায়ের কথা দেহ সম্বন্ধে। Science of Living থেকে মা পড়লেন এই লাইন কয়টি

"Lastly, we must, by means of a rational and clear seeing physical education, make our body strong and supple so that it may become in the material world a fit instrument for the truth-force which wills to manifest through us."[8]

মা বলছেন, যুক্তি-বিচার দিয়ে গড়া ব্যায়ামের দ্বারা দেহকে শিক্ষা দিতে হবে। ব্যায়ামে আবার যুক্তিবিচার? হ্যাঁ, কারণ প্রত্যেক মানুষের তার শরীরের প্রয়োজনে তো ব্যায়াম? যার দেহ সবল তার হয়ত সবলত্ব রাখার ব্যায়াম। কারু বা শারীরিক অসুবিধা

সামলাবার ব্যাপার, আবার বয়স বাড়লে দেহ সচল রাখার ব্যাপার হবে ভিন্ন। উদ্দেশ্য কি না, মা বলছেন, দেহকে যথেষ্ট সবল এবং নমনীয় করতে হবে যাতে এই পার্থিব জগতে যে সত্য শক্তি ফুটে উঠতে চাইছে, তার যেন যোগ্য আধার হতে পারে দেহটি।

মা বলছেন প্রাণের চেয়ে দেহকে সংগঠিত করা অনেক সহজ। কিন্তু মন আর প্রাণ তাদের মর্জি-মেজাজ নিয়ে কি নাস্তানাবুদই না করে তাদের দাসানুদাস বেচারী দেহটিকে। প্রচুর দুর্ব্যবহার করার পর, অনেক ক্ষেত্রে প্রায় ধ্বংস করে দিয়েও দেহের নিস্তার নেই। মা বলছেন, তখনও দুটি স্যাঙ্গাৎকে বলতে শোনা যায়, "কী জন্তুরে বাবা, আমাদের তালে তাল মেলাতে পারে না।" পালাবার পথ জানা নেই, দেহ তাই আবার নির্দ্বিধায় মনের আর প্রাণের হুকুম তামিল করে চলে। মন বুলি কপচায় :"তুমি এটি খেও না, ক্ষতি হবে, ওটি করোনা, খুব খারাপ।" মন যদি বুদ্ধিমান ও স্পষ্টদর্শী না হয় তাহলে দেহের কপালে অনেক দুর্গতি। প্রাণের দরবার থেকে অর্থাৎ vital থেকে সে সব হুকুমনামা আসে, মা বলছেন, সেগুলি নাহয় বাদই দিলাম। সুযোগ পেলেই মন তার কঠোর নীতি-নিয়ম এবং প্রাণ তার অমিতাচার, আকস্মিক আবেগের ধমকে দেহের ভারসাম্য নষ্ট করে, এবং তখনই আসে ক্লান্তি অবসাদ এবং রোগ।

Science of Living প্রবন্ধটিতে তারপর মা বলছেন দেহকে মনের এবং প্রাণের পীড়ন থেকে রক্ষা করতে হবে এবং সেটি একমাত্র সম্ভব সত্তার চৈত্যকেন্দ্রের সঙ্গে অবিরাম যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে।

আবার কয়েকটি লাইন মা পড়লেন। "The body has a remarkable capacity of adaptation and endurance. It is fit to do so many more things than one can usually imagine. If instead of the ignorant and despotic masters that govern it, it is ruled by the central truth of the being, one will be surprised at what it is capable of doing."[9] মানিয়ে চলার ক্ষমতা দেহের অবিশ্বাস্য। সে বড় সহনশীল। মা বলছেন, দেহ অভাবনীয় অনেক কিছু করতে পারে। বলছেন যে দেহের বর্তমান স্বৈরাচারী মনিব দুটির স্থানে কর্তৃত্ব যদি থাকত সত্তার কেন্দ্রীয় সত্যটির হাতে তাহলে, "তুমি আবাক হয়ে যাবে দেখে যে সে কি করতে পারে।" তারপর বলছেন, "In this sound and balanced life a new harmony will manifest in the body, reflecting the harmony of the higher regions, which will give it perfect proportions and the ideal beauty of form",[10] এ ধরনের সুস্থ এবং ছন্দোময় জীবনে একটি নতুন সমন্বয় বা সঙ্গতি বিকশিত হবে দেহে যা হবে উর্ধ্বভূমির সমন্বয়ের প্রতিফলন, যা এনে দেবে নিখুঁত সৌষম্য এবং আদর্শ দেহশ্রী।

মা বলছেন ও যে উর্ধ্বায়ণের শেষ সিঁড়ি। কিন্তু এখন মানবদেহ যে পর্যায়ে আছে তার সঙ্গে যদি ঐ উন্নত অবস্থার তুলনা করা যায় তাহলে অবশ্য মা বলছেন, "খুব অল্প লোকই সে পরীক্ষায় পাস করবে।"

বলছেন, প্রায় প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কিছু না কিছু proportion-এর গোলমাল

P30252

আছে, কিন্তু আমরা সেই অসামঞ্জস্যে এতই অভ্যস্ত যে সে সব খুঁতগুলি সাধারণ চোখে আমাদের যদিও নজরে পড়েনা, তবে, মা বলছেন যখন উচ্চতর সৌন্দর্যের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় তখন সেগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যাই হোক, সে কথা এখন অবান্তর, কারণ perfect সৌন্দর্যের যে মান মা ধরে দিয়েছেন তার কাছাকাছি অল্প কয়জন আছেন হয়ত, তাও আমার জানা নেই।

মা বলছেন, এই অভাবের, অসামঞ্জস্যের হাজার রকম কারণ থাকতে পারে বটে, তবে প্রতিকারের পথ আছে একটিই, এবং সেটি হল কি না সত্তার মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে হবে সেই সহজ প্রবৃত্তি (instinct) যার সাহায্যে সত্য এবং সর্বোত্তম সৌন্দর্যের একটি ধারণা কার্যকরী হবে দেহের কোষে কোষে এবং দেহকে সেই সৌন্দর্য প্রকাশে সক্ষম করে তুলবে।

মা বলছেন, তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ যে যারা আন্তরশান্তি, আন্তরসৌন্দর্যে এবং পরম মঙ্গল কামনায় ভরপুর তাদের অভিব্যক্তি এবং বদখেয়ালী মানুষ—যারা নিজেদের প্রকৃতির নিচতলায় বাস করে—তাদের অভিব্যক্তি এক নয়।

দেহকে সৌন্দর্যময় করে তুলতে অহং কিংবা দম্ভের সাহায্য নিয়ে লাভ নেই, কারণ, মা বলছেন, একটি গভীর কিছুর আছে সেই পরিবর্তন আনার ক্ষমতা। বলছেন, যদি কেউ নিজেকে সংযত করতে পারে, বা নিরস্ত করতে পারে, কু-ইচ্ছা বা ক্ষতি-সাধক চিন্তা থেকে তাহলে দেখা যাবে এক ধরনের সৌষম্য ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাচ্ছে সেই মানুষটির রূপে, গঠনে, অবয়বে, কারণ দেহ যে আন্তর অবস্থার প্রতিচ্ছবি। এতো দেহের নিয়ম।

মা এবার বলছেন যে তোমরা একটি জিনিস ভুলে যাও সেটি কিন্তু সারাদিন প্রায় পাঁচ-ছয় ঘন্টা দিব্য তুমি হয়ত রইলে উর্ধ্বতর চেতনায়, ভাবলে বেশ যথেষ্টই তো হল, ভেবে বাকী সময়টুকু জৈব জীবন বাস করতে ফিরে গেলে, নিজেকে মেলে দিলে, আগল যত আলগা করে দিলে। কি হল? না পারিপার্শ্বিক ঘটনাস্রোত সুযোগ পেয়ে তাড়িয়ে নিয়ে চলল তোমায় এবং সেই সময় তুমি কিন্তু উর্ধ্বে অবস্থিত চেতনাটির কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত, ভুলে গেলে তার সান্নিধ্যে আসতে, একমাত্র যার ক্ষমতা আছে প্রকৃতির নিম্ন অঞ্চলগুলিতে নেমে যাওয়া থেকে আমাকে ধরাতে পারে।

মা বলছেন, দেহকে যেন অবজ্ঞা করো না বা বেশী ধমকধামক দিও না, কারণ সে তো দোষী নয়। বলছেন, ভেবেচিন্তে, দেখেশুনে, নিজের উপযুক্ত কোন একটি যুতসই পদ্ধতি বেছে নিয়ে যদি অনুশীলন কর, শিক্ষিত কর তোমার দেহকে তাহলে তার কাছ থেকে যা তোমার আদায় হবে তা বর্তমানে যা হচ্ছে তার তুলনায় অপরিসীন। এই চর্চার ফল-স্বরূপ দেহে আসবে সৌষম্য এবং সেই সৌষম্য ক্রমশঃ উন্নতিশীল হবে। "This harmony will be progressive, for the truth of the being is never static"...[10]। এই সমন্বয় হবে প্রগতিশীল, কারণ মা বলছেন যে সত্তার সত্য কখনও স্থাণু নয়, সে যে ক্রমবর্ধমান পূর্ণতার চিরন্তন ফুটে ওঠা।

তারপর খানিকটা ছেড়ে আবার মা পড়ছেন "...These four attributes of the Truth will spontaneously express themselves in our being. The psychic will be the vehicle of true and pure love,

the mind that of infallible knowledge, the vital will manifest an inivincible power and strength and the body will be the expression of a perfect beauty and a perfect harmony"[11]. এই attribute-গুলি কি? মা বলছেন, যখন আমরা পূর্ণতার সেই শিখরে পৌঁছব যা আমাদের লক্ষ্য, আমরা দেখব, যে সত্যের কথা মা বলছেন তার চারটি দিক আছে প্রেম, জ্ঞান, শক্তি এবং সৌন্দর্য। বলছেন, সত্যের এই রূপগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফুটে উঠবে সত্তায়। চৈত্য বয়ে আনবে পবিত্র প্রেম, মন আনবে অভ্রান্ত জ্ঞান, প্রাণে বিকশিত হবে অজেয় শক্তি এবং দেহ হবে নিখুঁত সৌন্দর্য এবং সমন্বয়ের প্রকাশ।

মা বলছেন, সত্তার বিভিন্ন অংশে দিব্য নিজেকে প্রকাশ করেন ভিন্ন ভিন্ন রূপে —এ তত্ত্বটি ধর্মনেতা বা মিস্টিক্‌দের প্রায় অজানা।

মা বলছেন, সত্তার ঊর্ধ্বতর অংশগুলিতে দিব্য ধরা দেন শক্তিরূপে, প্রেমরূপে কিন্তু দেহে তাঁর বিকাশ হয় সৌষম্যে এবং সৌন্দর্যে। সেইজন্য মা বলছেন, দেহে সৌন্দর্যের বিকাশের প্রশ্ন হল একটি আধ্যাত্মিক প্রশ্ন।

নির্দেশিকা

[1] *Collected Works of the Mother*, Cent. Ed., Vol. 12, pp. 5-6.
[2] *Ibid.*, Vol. 15, p. 330.
[3] *Ibid.*, Vol. 12, p. 6.
[4] *Ibid.*
[5] *Ibid.*
[6] *Ibid.*, Vol. 4, p. 52.
[7] *Ibid.*
[8] *Ibid.*, Vol. 5, p. 53.
[9] *Ibid.*, Vol. 5, p. 54.
[10] *Ibid.*
[11] *Ibid.*, Vol. 4, p. 56.

মোলিয়ের

পাতি ভদ্দরলোক

সমীরকান্ত গুপ্ত

পাতি ভদ্দরলোক

মোলিয়েরকে ক্লাসিকাল নাট্যকার হিসেবে ধরা হয়। তাঁর 'বুর্জোয়া জাঁতিয়োম' (Bourgeois Gentilhomme) কমেডি বা হাস্যরসের সৃষ্টি হিসাবে সুবিখ্যাত।

পণ্ডিচেরীতে নাটকটি স্থানীয় কলেজের ছাত্রছাত্রীরা একবার মঞ্চস্থ করেন। সেটা সম্ভবত ১৯৪৫।৪৬-এর দিকে। উদ্যোক্তারা কিছু টিকিট আশ্রমের কাছে বিক্রি করেছিলেন। শ্রীমা সেই সূত্রে ফরাসীভাষা জানা আশ্রমের ছেলেমেয়েদের নাটকটি দেখতে পাঠিয়েছিলেন—বলা বাহুল্য তখন এদের সংখ্যা আজকের তুলনায় বেশ কমই ছিল। নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল রু্য রোন্যাঁ রোলাঁয় অবস্থিত নিতান্ত সাধারণ একটি প্রেক্ষাগৃহে, তার নাম ছিল—সাল জান দার্ক (Salle Jeanne d'Arc)

কিছু পরে নাটকটি চলচ্চিত্রের রূপ ধরে আসে। এখন নেহেরু ষ্ট্রীটের (সেকালের ডুপ্লে ষ্ট্রীট) যেটি বুধু সিল্ক হাউস ও টাটা টেক্সটাইলস সেখানে 'অলিম্পিয়া' হাউসেই ছবিটি দেখানো হয়। এখানেও অভিনয়ে এবং ফরাসী ভাষায় উৎসাহী জনাকয়েক ছাত্রছাত্রীকে শ্রীমা নাটকটি দেখতে যেতে অনুমতি দেন।

আশ্রমের ছেলেমেয়েরা নাটকটি মঞ্চস্থ করেন ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে অগাষ্ট। ফরাসীদেশ থেকে বারবারা পিটেফ (Varvara Pitoëff) বলে ফরাসী নাট্যমহলে সুপরিচিতা ও অভিনয়নিপুণা এক মহিলা (আশ্রমে তাঁর নাম হয়েছিল শ্রীময়ী) তখন আশ্রমে এসেছিলেন—তাঁরই প্রশিক্ষণে ও প্রযোজনায় নাটকটি অভিনীত হয়। তিনি অবশ্য মায়ের নির্দেশ ও উপদেশ অনুযায়ীই চলতেন এবং সেই রকমটিই ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য আমাদের খেলার মাঠে মুক্তাঙ্গনের মঞ্চ তখন স্থানান্তরিত হয়েছে বর্তমানের আধুনিক পাকাবাড়ি প্রেক্ষাগৃহে এবং বুর্জোয়ে জাঁতিয়োম সেখানেই অভিনীত হয়—অভিনয়ের আগে একদিন প্রত্যেক চরিত্রের বিশিষ্ট পোশাকে সজ্জিত হয়ে অভিনেতা অভিনেত্রীরা আশ্রমে মায়ের ঘরে তাঁর দর্শন পেয়েছিলেন।

সেই অভিনয়ে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন

মঁসিয় জুরদ্যাঁ	উদার পিন্টো	দোরিমেন	ঋনুর ভট্টাচার্য
মাদাম জুরদ্যাঁ	আরতি দাশগুপ্ত	গানের মাষ্টার	কালু সরকার
লুসিল	অমিতা সেন	নাচের মাষ্টার	মধুসূদন প্যাটেল
নিকোল	ছন্দা ঘোষ	অসিযুদ্ধের মাষ্টার	মনা সরকার
ক্লেয়ঁৎ	মুকুল সরকার	দর্শনের মাষ্টার	মনোজ দাশগুপ্ত
কোভিয়েল	শ্রীময়ী	দরজি	নরেন্দ্র জহর
দোয়াঁৎ	সমরেন্দ্র সরকার	দুই ভৃত্য	অমরেন্দ্র, প্রতাকর

পা ত্র পা ত্রী

মঁসিয় জুরদাঁ
মাদাম জুরদাঁ
লুসিল
নিকোল
ক্লেঁয়ৎ
কোভিয়েল
দোরাঁৎ
দোরিমেন
গানের মাষ্টার
নাচের মাষ্টার
অসিযুদ্ধের মাষ্টার
দর্শনের মাষ্টার
হেড দরজি
ছোকরা দরজি
দুই ভৃত্য

ভদ্দরলোক
ভদ্দরলোকের স্ত্রী
মঁ জুরদাঁর কন্যা
দাসী
লুসিলের প্রেমিক
ক্লেঁয়তের ভৃত্য
কাউন্ট, দোরিমেনের প্রেমিক
মার্কুইসনী

অনকয়েক গায়ক গায়িকা, যন্ত্রবাদক, নাচি, পাচক, ছোকরা দরজি
এবং অন্তর্বর্তী নাচগানের দল।

প্রথম অঙ্ক

পর্দা অপসৃত হতেই দেখা গেল নানা বাদ্যযন্ত্রের সমাবেশ ; মঞ্চের ঠিক মাঝখানে সংগীত শিক্ষকের ছাত্র—সে একটি টেবিলের সামনে 'ভদ্দরলোকের' বায়না নাফিক একটা রাগ সাধছে।

প্রথম দৃশ্য

গানের মাষ্টার, নাচের মাষ্টার, তিনজন সুরশিল্পী, দু'জন বেহালাবাদক, চারজন নর্তক

গানের মাষ্টার

(নিজের ছাত্রদের প্রতি) আসুন, চুকতে আজ্ঞা হোক, দাঁড়ান ওখানে—যতক্ষণ উনি না আসছেন।

নাচের মাষ্টার

(নর্তকদের প্রতি) আপনারাও, এ-পাশে।

গানের মাষ্টার

(ছাত্রদের প্রতি) হয়েছে ?

ছাত্র

হ্যাঁ।

গানের মাষ্টার

দেখি...ঠিকই হয়েছে।

নাচের মাষ্টার

নতুন কিছু ওটা ?

গানের মাষ্টার

একটা সুরের কলি ওকে রচনা করতে দিয়েছিলাম—যতক্ষণ না ভদ্দরলোকটি ঘুম থেকে উঠছেন ততক্ষণে।

নাচের মাষ্টার

দেখতে পারি কি ওটা ?

গানের মাষ্টার

উনি এসে পড়লে স্বৈতবন্ধে শুনতেই পাবেন। তার দেরি নেই।

নাচের মাষ্টার

আপনার আর আমার কাজ এখন এমন ফেলনা নয় আদৌ।

গানের মাষ্টার

তা ঠিক। আমাদের দু'জনেরই মনের মতো লোক খুঁজে পেয়েছি। এই মঁসিয় জুরদ্যাঁ লোকটি আভিজাত্য ও জাঁকজমকের চিহ্ন মাথায় সেঁটে বেড়াবার স্বপ্নে মশগুল আমাদের মিঠে মহাজন। আপনার নাচ আর আমার সংগীত খুশী হবে তামাম দুনিয়ার লোক এরকম হলে।

নাচের মাষ্টার

অতটা নয়; আমার বরং ভালো লাগত আমরা তাকে যা দিই তার যদি আরও একটু তারিফ করতে পারত।

গানের মাষ্টার

ও-সবের কদর সে জানে না, তা ঠিক, তবে দাম দেয় বেশ; আর আজকাল অন্য সব জিনিসের চেয়ে আমাদের শিল্পের পক্ষে তারই প্রয়োজন বেশি।

নাচের মাষ্টার

নিজের বেলা, আপনার কাছে স্বীকার করছি, আমি নামডাক একটু পছন্দ করি। করতালি আমাকে স্পর্শ করে; আমি মনে করি আমাদের ললিতকলাশিল্পে মূর্খদের সামনে নিজেকে দাঁড় করানো বা আমার সৃষ্টিকে মূঢ়ের বর্বর বিচারের সামনে আনা একটা মর্মান্তিক শাস্তি। ওকথা আর বলবেন না, তেমন লোকের জন্য কাজ করে সুখ আছে যারা কলা-শিল্পের সূক্ষ্মতার সমঝদার, যারা আপনার পুরস্কার দিতে জানে মনকাড়া সায় জানিয়ে। ঠিক যা সৃষ্টি করছি তার উত্তরে সেরা পুরস্কার হল তাদের স্বীকৃতি পাওয়া, অভিনন্দিত হতে দেখা শ্রোতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সম্মানের করতালিতে। আমার মনে হয় আমাদের পরিশ্রমের তার চেয়ে ভালো দাম হতে পারে না এসব হল সমঝদারি প্রশংসার অতীব মিষ্টতা

গানের মাষ্টার

আপনার সঙ্গে একমত, ওই রকমের স্বাদ আমার কাছেও। যে-রকম তারিফের কথা বললেন তার চেয়ে তৃপ্তিকর অবশ্য আর কিছুই নেই কিন্তু শুধু ধূপধুনোর গন্ধে তো জীবন চলে না। নিছক প্রশংসা মানুষকে স্বস্তি দেয় না; তার সঙ্গে জমাট কিছু মিশিয়ে দিতে হয়; আর সবার সেরা প্রশংসা হল হাত দিয়ে দেওয়া প্রশংসা। এ-লোকটার বোধশক্তি

নিতান্ত কম, সব জিনিস নিয়ে উদ্ভট কথা বলে এবং অস্থানে বাহবা জানায়. তবে তাও অর্থ বুদ্ধির অনর্থ পুষিয়ে দিয়েছে। তার রঙ্গপেটিকা হীরা চেনে। তার স্মৃতি এখন চালু অর্থ এই মূর্খ বুর্জোয়াটি, দেখতেই তো পাচ্ছেন, ওই যে পরিচয় হল ভদ্রলোকটির সঙ্গে, তাঁর চেয়ে আমাদের কাছে অনেক বেশি মূল্যবান।

নাচের মাষ্টার

যা বললেন তাতে কিছু সত্য আছে. তবে আমার মনে হচ্ছে আপনি টাকার উপর অতিরিক্ত নির্ভর করছেন, নির্জলা স্বার্থ এমন হীন জিনিস যে তাতে রুচিবান কারো আসক্তি খোঁজা উচিত নয়।

গানের মাষ্টার

কিন্তু আমাদের মহাশয়টি যে অর্থ দেন তা তো আপনি বেশ লুফে নেন।

নাচের মাষ্টার

অবশ্য ; তবে তাতেই আমার পুরো তৃপ্তি হয় না. মনে হয় যদি তার স্বচ্ছলতার সঙ্গে কিছু সুরুচিও থাকত।

গানের মাষ্টার

আমারও তাই মনে হয়, আর সেই জন্যই তো আমরা দু'জনে যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। তবে ইনি আমাদের বিখ্যাত হবার সুযোগ দিয়েছেন. ইনি অন্যদেরও বেতন দেবেন, যাঁরা তার প্রশংসা গাইবেন।

নাচের মাষ্টার

ওই যে উনি আসছেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মঁ জুরদাঁ, দু'জন ভৃত্য, গানের মাষ্টার, নাচের মাষ্টার, বেহালা বাদকরা, গায়ক ও নর্তকরা

মঁ জুরদাঁ

তারপর, মহাশয়রা ? কী ব্যাপার ? আমাকে দেখতে হবে আপনাদের নাটিকা ?

নাচের মাষ্টার

কী বলছেন ? নাটিকা কী ?

মঁ জুরদাঁ

আঃ! যাকগে...কী যেন বলেন আপনারা? আপনাদের ভূমিকা না নাচ-গানের পালা।

নাচের মাষ্টার

বুঝলাম, বুঝলাম।

গানের মাষ্টার

দেখছেনই তো, সেজন্য আমরা তৈরি।

মঁ জুরদাঁ

আপনাদের একটু বসিয়ে রেখেছি, কারণ আজ তালেবরদের মতো সাজপোশাকে দর্শন দিতে চাই, আর আমার দরজি যে রেশমের বোঝা পাঠিয়েছে ভাবিনি যে জীবনে পরতে পারব।

গানের মাষ্টার

আপনার ফুরসুতের অপেক্ষায়ই তো আমরা রয়েছি।

মঁ জুরদাঁ

আপনাদের উভয়কে আমার অনুরোধ আমার পোশাক না-আনা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে, যাতে সেই লাটবেশে আমাকে দেখতে পান।

নাচের মাষ্টার

আপনার যেমন মর্জি।

মঁ জুরদাঁ

দেখবেন আমাকে বেশবাসে সুসজ্জিত, যেমনটি হওয়া উচিত—একেবারে আপাদ-মস্তক।

গানের মাষ্টার

তাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

মঁ জুরদাঁ

এই ভারতীয় জিনিসটি নিজের জন্য করিয়েছি।

নাচের মাষ্টার

খাসা জিনিসটি।

মঁ জুরদাঁ

আমার দরজি বলে যে ভদ্রলোকেরাই সকালে এই পোশাক পরে।

গানের মাষ্টার

কি মানিয়েছে আপনাকে!

মঁ জুরদাঁ

এই নোকর। বেটা দো নোকর।

প্রথম ভৃত্য

হজুর, কী হুকুম?

মঁ জুরদাঁ

কিছু না। দেখলাম আমার কথা শুনিস কি না। (দু'জন মাষ্টারের প্রতি) এ-দু'জনের তক্‌মাটা কেমন?

নাচের মাষ্টার

আহা মরি!

মঁ জুরদাঁ

(জোব্বাটা খুলে দেখালেন, তলায় পরনে লাল ভেলভেটের ব্রিচেস আর সবুজ ভেলভেটের জ্যাকেট) এটা হল সকালে ব্যায়াম করবার সাদাসিধে পোশাক।

গানের মাষ্টার

পোশাক খোলা।

মঁ জুরদাঁ

হুকুমবরদার।

প্রথম ভৃত্য

হজুর?

মঁ জুরদাঁ

অন্য নোকর!

দ্বিতীয় ভৃত্য
হুজুর ?

মঁ জুরদাঁ
বর আমার গাউন। (গানের আর নাচের মাষ্টারের প্রতি) আমার তকমাজোড়া কেমন ?

নাচের মাষ্টার
দেখে বলিহারি যাই।

মঁ জুরদাঁ
বেয়ারা !

প্রথম ভৃত্য
হুজুর।

মঁ জুরদাঁ
দুসরা বেয়ারা !

দ্বিতীয় ভৃত্য
হুজুর

মঁ জুরদাঁ
বর জামাটা। কেমন দেখায় এ-বেশে ?

নাচের মাষ্টার
দারুণ। ওর চেয়ে সরেস আর ভাবাই যায় না।

মঁ জুরদাঁ
দেখা যাক এবার একটু আপনাদের খেল।

গানের মাষ্টার
আমার প্রার্থনা, প্রথমে আপনি শুনুন এই যে গুণী আপনার ফরমাশমতো রচনা করেছেন পালার একাংশ। এ ধরণের আবদারের জন্য এর প্রতিভার জুড়ি মেলা ভার।

মঁ জুরদাঁ

তোবা, তবে এজন্য এক ছোকরা ছাত্রকে লাগান ঠিক হয় নি ; আপনি নিজেও এ-ব্যাপারে খুব পাকাপোক্ত প্যাঁচ দেখালেন না।

গানের মাষ্টার

মহাশয়, ছাত্র বলেই একে অপমান করা উচিত নয়। এ-বয়সের ছাত্ররা এসব কাজ সেরা ওস্তাদের মতোই জানে, কলিটি যথাসম্ভব সুন্দরই ও তৈরি করেছে। একটু খানি শুনুন।

মঁ জুরদাঁ

আমার জোব্বাটা দাও, ভালো শুনতে পাবি যাতে... দাঁড়াও, মনে হচ্ছে জোব্বা ছাড়াই আমাকে মানাবে ভালো... না, ওটা আবার দাও, তা-ই হবে ভালো।

গায়ক (গানরত)

দিন যে না যায়, না যায় রাতি
দুখ আমার অশেষ মানি
যবে তোমার অতুল নয়ন
এত আমার আপন জানি ;
ইরিসমণি ভালোবেসে
এমন যদি আমায় হানো,
হায় হায় গো, অরির ভয়ে
ললাটলিখন কিবা জানি !

মঁ জুরদাঁ

গানটা আমার কাছে কিম্ভুত লাগছে, ঘুমপাড়ানি। আমি বলি, আপনি ওটাকে এখানে ওখানে রগড়ে একটু চাগিয়ে তুলুন।

গানের মাষ্টার

মহাশয়, সুর তো কথা-মাফিকই হবে।

মঁ জুরদাঁ

এক সময়ে আমি শিখেছিলাম বেশ একটি। দাঁড়ান... ওই যে... কি যে বলে তার নাম ?

গানের মাষ্টার

মাপ করবেন, আমার জানা নেই।

নঁ জুরদঁ্যা

আরে তার মধ্যে ভেড়ার মাংস আছে।

নাচের মাষ্টার

ভেড়ার মাংস ?

নঁ জুরদঁ্যা

হাঁ্যা। এই যে। (নঁ. জুরদঁ্যা গানে মত্ত)

জানেৎ জানি নরমসরম
পরন রুপ্‌সী,
জানেৎ জানি ভেড়ার মাস
নরন তপ্‌সি
হায় হায় রে!

তার হৃদয় নিঠুর
নিঠুর নিঠুর,
বনচরানি বাঘের চেয়ে
কঠোর অবিশ্যি
হায় হায় রে!

খাসা নয় ?

গানের মাষ্টার

জগতে এর তুলনা নেই।

নাচের মাষ্টার

আপনি তো ওটি গাইলেন তোফা।

নঁ, জুরদঁ্যা

তাও তো গান না শিখেই।

গানের মাষ্টার

মহাশয়, ওটিও আপনাকে শিখতে হবে, যেমন শিখছেন নাচ। এ দু'টি কলার অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ।

নাচের মাষ্টার

যারা মানবচিত্তকে সুন্দর সব জিনিসের দিকে খুলে ধরে।

মঁ. জুরদাঁ

গুণী লোকেরা কি গানও শেখে?

গানের মাষ্টার

হাঁ, মহাশয়।

মঁ জুরদাঁ

তাহলে আমি আলবৎ শিখব। তবে জানি না কতটা সময় দিতে পারব। কারণ, অস্ত্রশিক্ষক যিনি ও-বিদ্যা শেখান, তিনি ছাড়াও আর একজন দর্শন-শিক্ষককে নিযুক্ত করেছি—আজ সকাল থেকেই তাঁর পাঠ শুরু।

গানের মাষ্টার

দর্শন একটা জিনিস বটে; কিন্তু গান, মশাই, গান...

নাচের মাষ্টার

গান এবং নাচ...গান এবং নাচ, এই হল সব কিছু।

গানের মাষ্টার

দুনিয়ায় গানের মতো উপকারী আর কিছু নেই।

নাচের মাষ্টার

মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয় নাচের মতো আর কিছু নেই।

গানের মাষ্টার

গান ছাড়া রাজ্য টিঁকতে পারে না।

নাচের মাষ্টার

নাচ না থাকলে মানুষ কিছুই করতে পারত না।

গানের মাষ্টার

পৃথিবীতে দেখা যায় যত বিপর্যয়, যত যুদ্ধবিগ্রহ তা ঘটেছে গান না-জানার দরুনই।

নাচের মাষ্টার

মানুষের যত দুর্ভোগ, ইতিহাসে যত মারাত্মক পরাজয়, রাজনীতিকদের লাঞ্ছনা এবং সেনাপতিদের ব্যর্থতা—এসব হতে পারত না নাচ জানা থাকলে।

মঁ জুরদাঁ

কেমন, কেমন?

গানের মাষ্টার

যুদ্ধ কি মানুষে মানুষে মিলের অভাবে ঘটে না?

মঁ জুরদাঁ

তা সত্যি।

গানের মাষ্টার

যদি সকলে গান জানত, তাহলে তাই কি মিলমিশের হেতু হতে পারত না, দেখা যেত না বিশ্বে সর্বব্যাপী শান্তি?

মঁ জুরদাঁ

তাও ঠিক।

নাচের মাষ্টার

কেউ যখন দোষ করে ফেলে—তা সে সংসারের ক্ষেত্রে কিম্বা রাজ্যের শাসনে হোক, অথবা একটা সেনাবাহিনী চালনায় হোক—তখন কি আমরা সর্বদা বলি না "অমুক অমুক ক্ষেত্রে ভুল পা ফেলেছে?"

মঁ জুরদাঁ

ঠিক, তা বলি বটে।

নাচের মাষ্টার

ভুল পা ফেলা, তা নাচ না জানা ছাড়া আর কিসের থেকে হতে পারে?

মঁ জুরদাঁ

সেকথা খাঁটি, আপনারা দু'জনেই নির্ভুল।

নাচের মাষ্টার

সে তো আপনাকে নাচগানের সার্থকতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার জন্য।

মঁ জুরদাঁ

এখন তো হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

গানের মাষ্টার

দেখবেন তাহলে আমাদের দু'জনার কাজ?

মঁ জুরদাঁ

হুঁ।

গানের মাষ্টার

আপনাকে আগেই বলেছি এই ছোট্ট গহনাটি এককালে গড়েছিলাম নানা আবেগ দিয়ে সংগীতে ফুটিয়ে তুলতে।

মঁ জুরদাঁ

উত্তম, সাধু।

গানের মাষ্টার

চলুন সামনে। ভেবে নেবেন কিন্তু ওদের মেষপালকের বেশে।

মঁ জুরদাঁ

সর্বক্ষণ মেষপালক কেন? ও তো আকছার দেখা যায়।

নাচের মাষ্টার

গানে যখন ইতরজনের কণ্ঠ দিতে হবে তখন তো মেষপালকের গানের অনুকূল পরিবেশ দিতেই হবে। সে গান তো চিরকাল তাদেরই অন্তরঙ্গ তখন আদৌ স্বাভাবিক হবে না রাজকুমারের কিম্বা ধনীভদ্রের আবেগময় সুর।

মঁ জুরদাঁ

বেশ, বেশ, দেখা যাক।

গানে ডাক ও পাল্টাই
জনৈকা গায়িকা ও দুজন গায়ক

গায়িকা

প্রেমের দেশে একটি হৃদয়,
হাজার তারে কাঁচায় বেঁধে —

শুনি সহজ তার নেওয়া
দুঃখ বিষান সেধে ;
তবু যাই বলো যাই বলো,
মুক্তি মোদের সেরা
বলতে বাধে ?

প্রথম গায়ক

দু'টি হৃদয় দুলিয়ে যায়
একটি সুরের টানে,
এই তো প্রেমের অতুল মধুর বঁধু
প্রেম চাওয়া বিনে সুখ তো হায়
নেই জীবনে—
চাও গো চাও প্রেমলগনে
নাও তার খুশির খুশি
মন যে ভরায়।

দ্বিতীয় গায়ক

প্রেমের বাঁধন সাধিয়া বরণ
সে প্রেম যদি গো মরমে যায়,
হায়, তবু হায়—নিঠুর বিধান !
নেই তো অটল গোপিনীজীবন ;
যে ভুলায় ছলে হৃদয় দলে'
প্রেম তার তরে পাতে না আসন।

প্রথম গায়ক

মধুর দোলা দোদুল !

গায়িকা

সুখী সরলতা !

দ্বিতীয় গায়ক

জীবন-নাশিনী রমণী !

প্রথম গায়ক

তুমি আমার কত দামি।

গায়িকা

কত শিহরণ জাগাও চিত্তে মোর !

প্রথম গায়ক

ওহে, যদি চাও প্রেম
সরাও ঘৃণা মোর :

গায়িকা

পারি পারি তোমায় দেখাবারে
একসেবী সেই গোপালিকারে।

দ্বিতীয় গায়ক

হায়, কোথায় তারে পাব ?

গায়িকা

রাখব বজায় মোদের গরব
দেব দেব হৃদয় দেব।

প্রথম গায়ক

ওহে মেষপালিকা.
বুঝি কেমনে
নয় সে হৃদয়ঘাতিনী ?

গায়িকা

দেখি দেখি,
দু'জনার সেরা প্রেমিকটি কিনি।

দ্বিতীয় গায়ক

যে হারাল অনুরাগ
তার নিঃস্বরিক্ত দশা,
কপালে সর্বস্বান্তের ডাক !

তিন জনে

এই যে শোভন মাতনে
যাই যাই ডুবে যাই গো ,

দুটি হৃদয় বাঁধা যখন
সেই সে-প্রেমের তুল নাই নাইকো।

মঁ জুরদাঁ

এই সব ?

গানের মাষ্টার

যে আজ্ঞা

মঁ জুরদাঁ

রচনা সরেসই মনে হচ্ছে : মাঝে মধ্যে চুটকি বেশ ভালো কথাও আছে।

নাচের মাষ্টার

আমার বিষয় সম্পর্কে, এ রচনা মোহন ভঙ্গি ও চারু চারণা দিয়ে গড়া যত বিচিত্র সম্ভব নৃত্যকল্পনা।

মঁ জুরদাঁ

এখানেও কি মেষপালক ?

নাচের মাষ্টার

তাতে আপনি মুগ্ধ হবেন। চলুন।

(চারজন নৃত্যশিল্পী শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী সব রকমের অঙ্গভঙ্গি এবং পদক্ষেপ দেখাল ; এই নাচটি দিয়ে অন্তর্বিরতি)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মঁসিয় জুরদাঁ, গানের মাষ্টার, নাচের মাষ্টার, ভৃত্য

মঁ জুরদাঁ

এটা তত নীরস নয়, লোকগুলো হেলছে দুলছে বেশ।

গানের মাষ্টার

নাচ যখন গানের সঙ্গে চলবে তখন তার তেজ দেখবেন, দেখবেন আপনার জন্য তৈরি এই কথানৃত্য কি উদ্দীপনাময়।

মঁ জুরদাঁ

সবুর করুন ; যে-ব্যক্তির জন্য এসব ফরমায়েস দিয়েছি তিনি এখানে আমার সঙ্গে নৈশভোজে আসছেন।

নাচের মাষ্টার

আমরা প্রস্তুত।

গানের মাষ্টার

তবে মশাই ধাকিটা যথেষ্ট নয়,—আপনি হলেন কিনা কেউকেটা লোক — থাকেন সাড়ম্বরে, রুচিও সূক্ষ্ম জিনিসে—আপনার বাড়িতে প্রতি বিষ্যুৎবার কিম্বা বুধবার কনসার্ট বসানো উচিত।

মঁ জুরদাঁ

কেন? ভদ্রলোকেরা কিএই রকমে আপ্যায়িত করে?

গানের মাষ্টার

হাঁ, মহাশয়।

মঁ জুরদাঁ

আমিও তাহলে চালু করব। ভালোই হবে তো?

গানের মাষ্টার

নিঃসন্দেহে। তিনটি গলা থাকবে—চড়া, মধ্যম আর খাদ। সঙ্গে থাকবে কোমল

বেহালা, বাঁশি আর একটা হার্প।

মঁ জুরদ্যাঁ

ওর সঙ্গে জুড়ে দিন নৌসিঙা। নৌসিঙা আবার কানে মধু ঢালে আর বড় মোলায়েম।

গানের মাষ্টার

ওসব আমাদের হাতে ছেড়ে দিন।

মঁ জুরদ্যাঁ

সে যাই হোক, খাবার সময়ে গায়কদের গাইতে পাঠানোয় যেন ভুল না হয়।

গানের মাষ্টার

আপনার যা যা থাকা উচিত সব পাবেন।

মঁ জুরদ্যাঁ

আসল কথা, নাচগানটা যেন বেশ একটু রসাল হয়।

গানের মাষ্টার

আপনি খুশি হবেন, অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে কয়েকটি ঘূর্ণিনাচও পাবেন।

মঁ জুরদ্যাঁ

হাঁ, ও-নাচ আমার মনের মতন ; ইচ্ছা আছে আমার ও-নাচ আপনাদের দেখাবার। আসুন, মাষ্টারমশাই।

নাচের মাষ্টার

মহাশয়, এই যে টুপিটা দয়া করে নিন। লা লা লা ; লা লা লা লা লা লা ; লা লা লা, দু'বার ; লা লা লা ; লা লা। দয়া করে পা মিলিয়ে। লা লা লা লা। ডান পা। লা লা লা। কাঁধ অত ঝাঁকাবেন না। লা লা লা লা লা লা লা লা লা লা। আপনার দুই হাত বেতাল। লা লা লা লা লা। মাথা সোজা করুন। পায়ের ডগা বাইরের দিকে ঘুরিয়ে দিন। লা লা লা। গতরখানা সটান রাখুন।

মঁ জুরদ্যাঁ

এবার কেমন ?

গানের মাষ্টার

দুনিয়া মাৎ।

মঁ জুরদাঁ।

আসল প্রসঙ্গ। শিখিয়ে দিন তো জাঁদরেল মার্কুইসনীকে কিভাবে অভিবাদন করতে হয়, অচিরে মওকা মিলবে।

নাচের মাষ্টার

মার্কুইসনীকে সেলামের নমুনা ?

মঁ জুরদাঁ।

সেই মার্কুসনীর নাম ভোলিমেন।

নাচের মাষ্টার

নিন, হাত দিন।

মঁ জুরদাঁ।

না, আপনি শুধু দেখিয়ে দিন, আমি তুলে নেব।

নাচের মাষ্টার

আপনি যদি গণ্যমান্য মহিলাটিকে সসম্মানে অভিবাদন করতে চান তাহলে প্রথমে নত হয়ে পেছিয়ে যাবেন, পরে তাঁর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে তিন বার নত হবেন, শেষবার নত হবার সময়ে ভদ্রমহিলার হাঁটু সমান নিচু হবেন।

মঁ জুরদাঁ।

দেখান তো একটু। তোফা।

ভৃত্য।

মহাশয়, আপনার অসিবিদ্যার শিক্ষক এসেছেন।

মঁ জুরদাঁ।

তাঁকে বলগে এখানে এসে আমার পাঠ দিতে। তুইও দাঁড়িয়ে দেখ, আমার নজর।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অসিযুদ্ধের মাষ্টার, গানের মাষ্টার, নাচের মাষ্টার, মঁ জুরদাঁ, জনৈক ভৃত্য

অসিযুদ্ধের মাষ্টার (জুরদাঁর হাতে তরোয়াল ধরিয়ে দিয়ে)

আসুন মশাই, শিখুন সেলাম। দেহ সোজা। বাঁ জানুর উপর একটু ভর দিতে হবে। দুই পায়ের মধ্যে অতটা ফাঁক নয়। দু'পা এক লাইনে। কব্জি থাকবে ঠিক পশ্চাদ্দেশের বিপরীত। তরোয়ালের ডগা থাকবে কাঁধ বরাবর। হাত অতটা দেহ ছাড়িয়ে নয়। বাঁ হাত উঠবে চোখ বরাবর। মাথা সোজা। দৃষ্টি নির্ভয়। এগোন। দেহ স্থির। চালান, খোঁচা মারুন। এক, দুই। আবার ফিরে যান। ফের শুরু, পা থাকবে অনড়। এক, দুই। লাফিয়ে পেছোন। মশাই, যখন খোঁচা মারবেন তখন প্রথমেই তরোয়ালটা ছাড়িয়ে নেবেন, শরীর অতটা খুলে দেখাবেন না। এক, দুই। আসুন, লাগান কোপ, চালিয়ে দিন। এগোন। দেহ নিশ্চিল। সামনে যান। ওখান থেকে শুরু। এক, দুই। আবার ফিরে যান। একই কায়দা। এক, দুই। লাফিয়ে পেছোন। সাবধান মশাই, সাবধান। (মাষ্টার 'সাবধান' চেঁচিয়ে দু'তিন খোঁচা দিলেন)

মঁ জুরদাঁ

ওহ্!

গানের মাষ্টার

আপনার কি কেরামতি

অসিযুদ্ধের মাষ্টার

আগেই আপনাকে বলেছি, এ-যুদ্ধের সমস্ত রহস্য দু'টি জিনিসে—দেওয়া এবং না-পাওয়া। সেদিন তো দেখিয়ে দিয়েছি মহড়া দিয়ে যে আঘাত লাগবেই না যদি আপনি জানেন শত্রুর তরোয়াল গা বরাবর আসা থেকে হেলিয়ে দিতে; তার জন্য প্রয়োজন ভেতরের কিম্বা বাইরের দিকে শুধু কব্জি একটু ঘুরিয়ে দেওয়া।

মঁ জুরদাঁ

এভাবে ভীরু যে সে প্রতিপক্ষকে খুন করে বসবে এবং নিজে অক্ষত থাকবে?

অসিযুদ্ধের মাষ্টার

নিঃসন্দেহে। দেখেন নি মহড়ায়?

মঁ জুরদাঁ

হুঁ।

অসিযুদ্ধের মাষ্টার

এতেই দেখা যায় রাষ্ট্রে আমাদের কি সমাদর পাওয়া উচিত, এবং অসিযুদ্ধের বিজ্ঞান অন্য সব ফালতু বিজ্ঞানের কত উর্ধ্বে যেমন নাচ গান...

নাচের মাষ্টার

থামুন মশাই, অস্ত্রবিদ। নাচের সম্বন্ধে মুখ সামলে ফুট কাটবেন।

গানের মাষ্টার

দেখুন, দয়া করে গানের গরিমা আর একটু সুনজরে দেখবেন।

অসিযুদ্ধের মাষ্টার

বেড়ে লোক আপনারা, আমার বিদ্যার সঙ্গে আপনাদের বিদ্যার তুলনা করেন!

গানের মাষ্টার

দেখুন দেখুন হামবড়াই লোকটাকে!

নাচের মাষ্টার

পেটে চামড়া-বাঁধা খোশনেজাজী জানোয়ার রে!

অসিযুদ্ধের মাষ্টার

ওহে নাচের মাষ্টার, তোমাকে দিয়ে আসল নাচ করাব। আর আপনি, আলহাদী গায়ক, আসল গাওয়া শেখাব আপনাকে।

নাচের মাষ্টার

লৌহপাতের খেলোয়াড়, তোমার খেল তোমাকে শেখাব।

মঁ জুরদাঁ (নাচের মাষ্টারকে)

আপনি কি পাগল হয়েছেন যে ওঁর সঙ্গে কোঁদল করছেন যিনি খোঁচা ও কোপ মারেন, যিনি মহড়ায় ছলে খুনের প্যাঁচ লাগান?

নাচের মাষ্টার

ওর পাঁয়তাড়ার কায়দা, ওর খোঁচা ও কোপের নিকুচি করি।

মঁ জুরদাঁ

আস্তে আস্তে, আমার অনুরোধ।

অসিযুদ্ধের মাষ্টার
বটে! পেশাদারী বেল্লিক!

নাচের মাষ্টার
বটে! বুজরুক!

মাঁ জুরদাঁ
ওহে, নাচের মাষ্টার।

অসিযুদ্ধের মাষ্টার
আপনার উপর যদি লাফিয়ে পড়ি...

মঁ জুরদাঁ
আস্তে আস্তে।

নাচের মাষ্টার
যদি আপনার গায়ে হাত তুলি...

মঁ জুরদাঁ
ধীরে।

অসিযুদ্ধের মাষ্টার
আপনাকে এমনভাবে কুচিকুচি করে'...

মঁ জুরদাঁ
রক্ষে করুন...

নাচের মাষ্টার
এমন ধোলাই দেব...

মঁ জুরদাঁ
দোহাই আপনার...

গানের মাষ্টার
আমাদের একটু ছেড়ে দিন না বেটাকে শিখিয়ে দিই কি করে কথা বলতে হয়।

মঁ জুরদাঁ

দোহাই ভগবান, পানুন আপনারা।

তৃতীয় দৃশ্য

দর্শনের মাষ্টার, গানের মাষ্টার, নাচের মাষ্টার, অসিযুদ্ধের মাষ্টার, মঁ জুরদাঁ, ভৃত্য

মঁ জুরদাঁ

এই যে। দর্শনের মাষ্টারমশাই, আপনি সময়মতো এসে পড়েছেন আপনার দর্শন নিয়ে। এই এদের মধ্যে একটু ভাব-ভালোবাসা করিয়ে দিন তো।

দর্শনের মাষ্টার

কী ব্যাপার? মশাইরা, কী হয়েছে?

মঁ জুরদাঁ

এঁরা নিজের নিজের বিদ্যের বাহাদুরি নিয়ে রেগে কাঁই, এমন কথা-কাটাকাটিতে বড় যে হাতাহাতি লাগবার উপক্রম।

দর্শনের মাষ্টার

হল কি! মশাইরা, ওরকম আত্মবিস্মৃত হওয়া কি উচিত? আপনারা কি সেনেকা-রচিত ক্রোধের উপর গবেষণামূলক প্রবন্ধ পড়েন নি? এই যে প্রবৃত্তি যা মানুষকে হিংস্র পশু করে তোলে তার চেয়ে হীন ও জঘন্য আর কী আছে? যুক্তিরই কি আমাদের আচরণের প্রভু হওয়া উচিত নয়?

নাচের মাষ্টার

আচ্ছা তো। মহাশয় যে আমাদের দু'জনকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করছেন—আমার জীবিকা নাচ এবং এঁর ব্যবসা গানকে অশ্রদ্ধা ক'রে।

দর্শনের মাষ্টার

জ্ঞানী ব্যক্তি সকল কটূক্তির ঊর্ধ্বে যাবতীয় দুর্বাক্যের উত্তরে মহৎ প্রতিক্রিয়া তিনি দেখাবেন সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য দিয়ে।

অসিযুদ্ধের মাষ্টার

ওদের দু'জনেই আস্পর্ধা। নিজেদের বিষয় নিয়ে আমার বিষয়ের সঙ্গে তুলনা করে।

দর্শনের মাষ্টার

তাতে বিচলিত হবার কি? মিথ্যা গৌরব ও পদবাহাদুরী নিয়ে তর্ক করা উচিত নয়, একের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য স্পষ্ট দেখিয়ে দেবে জ্ঞান ও সদ্‌গুণ।

নাচের মাষ্টার

আমি ওঁকে বলছিলাম যে নাচ এমন বিজ্ঞান যে তার গুণগান গেয়ে শেষ করা যায় না।

গানের মাষ্টার

আমি বলছিলাম, গান এমনই বিজ্ঞান যে যুগযুগান্ত তাকে সম্ভ্রম দেখিয়ে এসেছে।

অসিযুদ্ধের মাষ্টার

আর আমি, ওদের দুজনকে বলছিলাম যে সকল শাস্ত্রের সেরা এবং প্রয়োজনীয় হল অস্ত্রচালনা।

দর্শনের মাষ্টার

দর্শনের তাহলে কী হাল? তোমাদের তিন জনকেই দেখছি বেশ উদ্ধত, আমার সামনে এমন অহংকারে অক্লেশে বললে যে-সব বিষয়ের নাম বিজ্ঞান, যাদের শিল্প নামের আখ্যা দেওয়াই উচিত নয়, যাদের কেবল বলা চলে পাশব দাপ্পা, গলাবাজি, এবং বেইনৃত্যের জাতভাই।

অসিযুদ্ধের মাষ্টার

ভাগ্, দার্শনিক কুত্তা।

গানের মাষ্টার

দূর হ, বাঁদর পণ্ডিত!

নাচের মাষ্টার

যা, লেজঝোটা বাক্যবাগীশ।

দর্শনের মাষ্টার

কী বললি, উল্লুক যত সব...

(দার্শনিক তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, এবং তিনজনের মারামারি করতে করতে প্রস্থান)

মঁ জুরদাঁ।
দার্শনিক মশাই!

দর্শনের মাষ্টার
নচ্ছার, বেল্লিক, বদমাশ!

অসিযুদ্ধের মাষ্টার
বেটা জানোয়ার।

মঁ জুরদাঁ।
ও মশাইরা!

দর্শনের মাষ্টার
হনুমান যত সব।

মঁ জুরদাঁ।
দার্শনিক মশাই।

নাচের মাষ্টার
জাহান্নামে যাক গর্দভচন্দ্র!

মঁ জুরদাঁ।
ও মশাইরা।

দর্শনের মাষ্টার
রাস্কেল।

মঁ জুরদাঁ।
দার্শনিক মশাই।

গানের মাষ্টার
যমালয়ে যাক হতচ্ছাড়া গোঁয়ার।

মঁ জুরদাঁ।
ও মশাইরা।

দর্শনের মাষ্টার

শয়তান! গুণ্ডা! বিশ্বাসঘাতক! উঃ!

(সকলের প্রস্থান)

মঁ জুরদাঁ

দার্শনিক মশাই, ও মশাইরা, দার্শনিক মশাই, ও মশাইরা, ও দার্শনিক মশাই। উঃ, মনের সুখে ধোলাই খান, জানি না কি করা যায়, তবে আপনাদের ছাড়াতে গিয়ে জামা নোংরা করব না। ওদের মধ্যে গিয়ে পড়া এবং চাঁটিচাপাটি খাওয়া আমার পক্ষে বোকামি হবে।

চতুর্থ দৃশ্য

দর্শনের মাষ্টার, মঁ জুরদাঁ

দর্শনের মাষ্টার (গলায় তোয়ালে জড়াতে জড়াতে)

চলুন পাঠে বসা যাক।

মঁ জুরদাঁ

আহা! মশায়, ওরা যে আপনাকে উত্তম-মধ্যম দিল তাতে আমি রেগে গিয়েছি।

দর্শনের মাষ্টার

ও কিছু নয়। দার্শনিক জ্ঞানে যা আসে তা কিভাবে গ্রহণ করা উচিত, আমি ওদের নিয়ে জুভেনালের ঢংয়ে ব্যঙ্গ রচনা করব—তাতে ওদের ছিঁড়ে যাব। ওকথা থাক। কি পড়বেন আপনি?

মঁ জুরদাঁ

যা-কিছু আমার পক্ষে সম্ভব, কারণ পণ্ডিত হবার জন্যে বিদ্যের যাবতীয় খিদে আমার পেটে, আর ছোটবেলায় বাবা-মা আমাকে সকল শিল্প ও বিজ্ঞানে পাঠ দেন নি বলে তাঁদের উপর রাগ আমার।

দর্শনের মাষ্টার

এ-ভাবটা নিতান্ত যুক্তিসঙ্গত। Nam sine doctrina vita est quasi mortis imago. শুনলেন তো, আর লাতিন তো নিশ্চয় জানেন?

মঁ জুরদাঁ

তা জানি, তবে মনে করুন যেন জানিই না। ব্যাখ্যা করুন তো ওটার অর্থ কি।

দর্শনের মাষ্টার

ওটার মানে বিজ্ঞান ছাড়া জীবন মৃত্যুরই মূর্তি।

মঁ জুরদাঁ

ও লাতিনটা হক কথা।

দর্শনের মাষ্টার

আপনি কি বিজ্ঞানের কোনো সূত্র, কিছু অআকখ, জানেন না?

মঁ জুরদাঁ

ও, হ্যাঁ, লিখতে পড়তে জানি।

দর্শনের মাষ্টার

কোথা থেকে আরম্ভ করতে চান আপনি? তর্কশাস্ত্র দিয়ে শুরু করবেন?

মঁ জুরদাঁ

এ লজিক জিনিসটা কী?

দর্শনের মাষ্টার

এটি মনের তিনটি ক্রিয়া শেখায়।

মঁ জুরদাঁ

মনের তিনটি ক্রিয়া, কী রকম তারা?

দর্শনের মাষ্টার

প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়। প্রথম হল শাব্দিকের মাধ্যমে ধারণা দ্বিতীয়, শ্রেণী-মাধ্যমে বিচার; আর তৃতীয়, প্রতিভার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নির্ণয়। বারবারা, সেলারেন্ট, দারিয়াই, ফেরিও, বারালিপটন, প্রভৃতি।

মঁ জুরদাঁ

কথাগুলির বেশ গালভরা আওয়াজ। কিন্তু এই তর্কশাস্ত্র আমার পোষাবে না। আরো ভালো কিছু শেখান।

দর্শনের মাষ্টার
নীতিশাস্ত্র শিখবেন ?

মঁ জুরদাঁ
নীতিশাস্ত্র ?

দর্শনের মাষ্টার
হাঁ।

মঁ জুরদাঁ
কী বলে আপনার এই নীতিশাস্ত্র ?

দর্শনের মাষ্টার
এর বিষয় বস্তুগত, মানুষকে শেখায় কি ভাবে রিপু সংযত এবং...

মঁ জুরদাঁ
না, বাদ দিন ওটা। সব বদরাগীর মতো আমিও মেজাজী ; আর আমার যখন মেজাজ হয় তখন কোনো নীতিফিতি তাকে রুখতে পারে না—আমার রাগ চড়ে আবার সপ্তমে।

দর্শনের মাষ্টার
আপনি কি পদার্থবিজ্ঞান শিখতে চান ?

মঁ জুরদাঁ
এই পদার্থবিজ্ঞান, এর গলায় কি গান ?

দর্শনের মাষ্টার
পদার্থবিজ্ঞান হল তাই যা প্রাকৃতিক বস্তুর নীতিসূত্রগুলি এবং পদার্থের উপাদান ব্যাখ্যা করে , যা সব মৌল উপাদান, ধাতু, খনিজদ্রব্য, পাথর, উদ্ভিদ এবং জন্তুজানোয়ারের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে, এবং যাবতীয় উল্কা, রামধনু, উড়ন্ত আগুন, ধূমকেতু, বিদ্যুচ্চমক, মেঘগর্জন, বজ্রপাত, বৃষ্টি, তুষারপাত, বায়ুবেগ এবং ঝড়ের কারণ জানায়।

মঁ জুরদাঁ
ওর মধ্যে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি, অতিরিক্ত বিড়ম্বনা।

দর্শনের মাষ্টার

তাহলে কী শেখাব আপনাকে ?

মঁ জুরদাঁ

বানান শেখান।

দর্শনের মাষ্টার

খুব আনন্দের সঙ্গে।

মঁ জুরদাঁ

পরে আপনি আমাকে শেখাবেন গ্রহাবস্থান—জানবার জন্য, কখন চাঁদ দেখা যায়, কখন যায় না।

দর্শনের মাষ্টার

বেশ তো। তবে আপনার ভাবটা ঠিকমতো অনুসরণ করতে হলে, তাকে দর্শনের বিচার্য করে দেখতে হলে, আরম্ভ করতে হবে জিনিসের ক্রমানুয় অনুসারে, অক্ষরের প্রকৃতির নিখুঁত জ্ঞানটি ধরে, প্রত্যেকটি উচ্চারণের ধরণটি জেনে। এই সম্পর্কেই আপনাকে বলছি যে অক্ষরগুলিতে এক ভাগ স্বরবর্ণ আছে, তাদের স্বরবর্ণ বলা হয়—কারণ স্বর ফুটিয়ে তোলে তারা ; আর আছে ব্যঞ্জনবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ তাদের নাম কারণ স্বরবর্ণের যোগেই তাদের ধ্বনি, ধ্বনির খাদ আর চড়া পর্দা নির্দেশই তাদের কাজ। পাঁচটি ভাওয়েল বা স্বর আছে—A E I O U.

মঁ জুরদাঁ

সব বুঝলাম।

দর্শনের মাষ্টার

A (আ) স্বরটি বের হয় হাঁটি আকর্ণ বিস্তার করলে—A.

মঁ জুরদাঁ

A, A, তাই তো।

দর্শনের মাষ্টার

E (অ্যা) স্বরটা পাওয়া যায় নিচের চোয়াল ওপরটার কাছে তুলে—A, E.

মঁ জুরদাঁ

A, E; A, E. আরে, ঠিক তো ! কি সুন্দর !

দর্শনের মাষ্টার

আবার I (ই) স্বরটি, তার জন্য নিচে-ওপরের চোয়াল আরো কাছাকাছি এনে মুখের দুই প্রান্ত কানের দিকে টেনে—A, E, I

মঁ জুরদাঁ

A, E, I, I, I, I, I, ঠিক তো। জয় হোক বিজ্ঞানের।

দর্শনের মাষ্টার

O স্বর ফোটে দু'টি চোয়াল ফাঁক ক'রে এবং উপরের ও নিচের ঠোঁট দুই প্রান্ত থেকে কাছে টেনে এনে—O.

মঁ জুরদাঁ

O, O, এর চেয়ে খাটি কিছু নেই, A, E, I, O, I, O. বাহবা।

দর্শনের মাষ্টার

মুখ হাঁ করলে আংটির মতো হয়, দেখায় যেন O.

মঁ জুরদাঁ

O, O, O. আপনার কথা ঠিক, O. একটা জিনিস জানা কি মজার!

দর্শনের মাষ্টার

স্বরবর্ণ U দু'পাটি দাঁত একেবারে না চেপে কাছাকাছি আনলে, দু'টি ঠোঁটই ছুঁচলো করে'—এদেরও একেবারে বন্ধ না করে কাছে এনে, U.

মঁ জুরদাঁ

U, U. এর চেয়ে হক কিছু নেই।

দর্শনের মাষ্টার

আপনার ঠোঁট ছুঁচলো হয়, যেন ভ্যাঙ্গাতে যাচ্ছেন। যখন কারো দিকে অমন করবেন এবং তাকে বোকা বানাবেন তখন তাকে কিছু না বলে বলবেন U.

মঁ জুরদাঁ

U,U. একদম ঠিক। উঃ, কেন যে আরো আগে শিখিনি, তা'হলে এসবই জানা থাকত!

দর্শনের মাষ্টার

কাল অন্য হরফগুলি ধরা যাবে, যেগুলি ব্যঞ্জনবর্ণ।

মঁ জুরদাঁ

এদের মতো ওগুলিও কি মজাদার?

দর্শনের মাষ্টার

অবশ্য। ধরুন ব্যঞ্জনবর্ণ D, জিবের ডগা টাকরার ঠুকে দিন. DE.

মঁ জুরদাঁ

DE, DE. অবিকল। :! কি মজার জিনিস! কি মজার জিনিস!

দর্শনের মাষ্টার

F হয় ওপরের পাটি দাঁত নিচের ঠোঁটের ওপর বসলে. E F.

মঁ জুরদাঁ

EF, EF. বটেই তো। আহা, জনক-জননী আমার, তোমাদের বিরুদ্ধে আনার প্রচণ্ড অভিযোগ।

দর্শনের মাষ্টার

আর R—তা বলতে জিবের ডগা মূর্ধায় ছোঁয়াতে হয়, তখন যে দম জোরে বেরিয়ে আসে তাতে লেগে সে কেঁপে ওঠে. সেই নির্গত হাওয়া আবার ফিরে যায় সেই একই জায়গায় একটা কম্পন তুলে R, ra.

মঁ জুরদাঁ

র র র রা। র র র র র রা। অবিকল। কি মগজ তোমার! আর কতই না সময় হেলায় হারিয়েছি। R, r, r, ra.

দর্শনের মাষ্টার

এসব রহস্য খুলে বুঝিয়ে দেব আপনাকে।

মঁ জুরদাঁ

দোহাই, তা দিন। তবে আমিও একটা গোপন কথা বলব। আমি জনৈকা মৌলুসী মহিলার প্রেমে পড়েছি, তাঁর পায়ে নিবেদন করতে চাই এমন একটি প্রেমপত্র যদি লিখে দেন তো বড় কৃতার্থ হই।

দর্শনের মাষ্টার

সাধু, সাধু।

মঁ জুরদাঁ

বেশ গরম গরম হবে ব্যাপারটা, নয়?

দর্শনের মাষ্টার

সন্দেহ কি তাতে! আপনি কি পদ্যে লিখতে চান?

মঁ জুরদাঁ

না, পদ্যেও নয়, গদ্যেও নয়।

দর্শনের মাষ্টার

হয় এটা নয় ওটা, হতেই হবে।

মঁ জুরদাঁ

কেন?

দর্শনের মাষ্টার

কারণ, গদ্যে বা পদ্যে ছাড়া ভাবপ্রকাশের আর পথ নেই।

মঁ জুরদাঁ

গদ্য বা পদ্য ছাড়া অন্য কিছু নেই তাহলে?

দর্শনের মাষ্টার

না, মশাই। যা গদ্য নয় তা পদ্য, আর যা পদ্য নয় তা গদ্য।

মঁ জুরদাঁ

তাহ'লে কথা যা বলি তা কী?

দর্শনের মাষ্টার

গদ্য।

মঁ জুরদাঁ

মানে? আমি যখন বলি—নিকোল, আমার চটিজোড়া নিয়ে আয়, আমার রাতটুপি দে, তা সব গদ্য?

দর্শনের মাষ্টার

হ্যাঁ, মশাই।

মঁ জুরদাঁ

তাহ'লে না-জেনে চল্লিশ বছরেরও বেশি আমি গদ্য বলে এসেছি, তবে একথা জানানোর জন্য আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। তা'হলে আমার চিঠিতে লিখব—সুন্দরী মার্কুইসনী, আপনার মদালস নয়ন আমাকে প্রেমে পাগল ক'রে তুলেছে. লিখতে চাই দুরন্ত কায়দায়, আমার স্বভাব তো নরম।

দর্শনের মাষ্টার

সেই সঙ্গে যোগ করে দিন—তাঁর নয়নাগ্নি আপনার কলিজা পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে; আর দিনরাত যন্ত্রণায় কাটান...

মঁ জুরদাঁ

না, না, না, ওসব পারব না। যা বলেছি তা'ছাড়া অন্য কিছু চাই না। সুন্দরী মার্কুইসনী, আপনার মদালস নয়ন আমাকে প্রেমে পাগল করে তুলেছে।

দর্শনের মাষ্টার

বিষয়টা টেনেটুনে একটু বাড়াতে হবে তো।

মঁ জুরদাঁ

না, বলছি শুনুন। যা বলেছি তা ছাড়া চিঠিতে অন্য কোনো কথা চাই না; তবে একটু কেতাদুরস্তভাবে, ছিমছাম ছাঁদে। দেখিয়ে দিন না একটু, যাতে দু'চারটা নমুনা দেখে বেছে নিতে পারি।

দর্শনের মাষ্টার

প্রথম লেখা যায়, যেমন আপনি বলেছেন—সুন্দরী মার্কুইসনী, আপনার মদালস নয়ন আমাকে প্রেমে পাগল ক'রে তুলেছে। কিম্বা হয়ত—আপনার মদির আঁখি প্রেমে পাগল করে আমাকে, অলোকা মার্কুইসনী। নয়ত ধরুন—আপনার চোখের জন্য প্রাণ দিতে, সুন্দরী মার্কুইসনী, প্রেমে পাগল আমি। আর না হ'লে—আপনার শোভন লোচন ছাড়া নিক আমার, সুন্দরী মার্কুইসনী, প্রেমে যে উন্মত্ত।

মঁ জুরদাঁ

এদের মধ্যে সবচেয়ে বোকম কোনটি?

দর্শনের মাষ্টার

ঘ। আপনি বলেছিলেন—সুন্দরী মার্কুইসনী, আপনার মদালস নয়ন আমাকে প্রেমে পাগল ক'রে তুলেছে।

মঁ জুরদাঁ

তবু, আমি কিন্তু লেখাপড়া শিখিনি, অথচ কেমন একবারেই লক্ষ্যভেদ করলাম। আপনাকে সর্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আর আশা করি কাল ঠিক সময়ে আসবেন।

দর্শনের মাষ্টার

অবশ্য আসব।

মঁ জুরদাঁ (ভৃত্যের প্রতি)

আরে, আমার জামা এখনো এল না?

ভৃত্য

না, মশাই।

মঁ জুরদাঁ

এই হতভাগা দরজি বেটা আমাকে খামকা বসিয়ে রাখল, দিনভর আমার কত যে কাজ করার থাকে। পাগল হয়ে যাব আমি। জাহান্নমে যাক বেটা দরজি। যমের বাড়ি যাক বেটা। হতভাগাকে এখানে পেলে, নচ্ছার দরজিটাকে, নিমকহারাম দরজিটাকে পেলে আমি...

পঞ্চম দৃশ্য

প্রধান দরজি, ছোকরা দরজি (মঁ জুরদাঁর পোশাক হাতে), মঁ জুরদাঁ, ভৃত্য

মঁ জুরদাঁ

এই যে। এসে পড়েছ? তোমার ওপর রেগে যাচ্ছিলাম।

প্রধান দরজি

এর আগে আসতে পারলাম না, আপনার জামা বানাতে এক কুড়ি ছোকরা লাগিয়ে ছিলাম।

মঁ জুরদাঁ

তুমি আমাকে একজোড়া এত সরু মোজা পাঠিয়েছ যে তা পরতে কি গলদঘর্ম, দু'জায়গায় কেঁসেই গিয়েছে।

প্রধান দরজি

ওরা আরো খুলবে।

মঁ জুরদাঁ

হাঁ, রোজ যদি খানিকটা সেলাই ছিঁড়তে পারি। তুমি আমার একজোড়া জুতো বানিয়েছ, তা পায়ে ভীষণ বিঁধছে।

প্রধান দরজি

মোটেই না মশাই।

মঁ জুরদাঁ

মোটেই না, মানে কী?

প্রধান দরজি

না, একটুও বিঁধছে না।

মঁ জুরদাঁ

বলছি বিঁধছে।

প্রধান দরজি

ওটা আপনার মনের ধারণা।

মঁ জুরদাঁ

হাঁ, আমি টের পাচ্ছি বলে। তোমার ওটা খাশা যুক্তি বটে।

প্রধান দরজি

এই নিন, রাজসভার সবচেয়ে সৌখীন পোশাক, সবচেয়ে মানানসই। কালো হবে না অথচ কাপড়েরই এমন তারিফী জামা তৈরিতে রীতিমতো ওস্তাদের কাজ; শহরের যেকোনো ওস্তাদ দরজিকে এমনটি বানাতে ছ'বার সুযোগ দিতে রাজি আছি।

মঁ জুরদাঁ

এখানে এসব কী? ফুলগুলি যে উল্টো করে বসিয়েছ।

প্রধান দরজি

তা আপনি তো বলেননি যে উপরের দিক মুখ করে বসাতে হবে।

মঁ জুরদাঁ

তোমাকে সেটাও বলে দেবার দরকার ছিল?

প্রধান দরজি

অবশ্য, নিশ্চয়। সব খানদানি লোকরাই ওরকম পরে।

মঁ জুরদাঁ

খানদানি লোকেরা ওরকম মুখনিচু ফুল পরে?

প্রধান দরজি

তা আর বলতে।

মঁ জুরদাঁ

তা'হলে ঠিক আছে।

প্রধান দরজি

আপনি চাইলে ফুলগুলি উপরমুখী ক'রে বসিয়ে দিতে পারি।

মঁ জুরদাঁ

না, না।

প্রধান দরজি

শুধু আপনার হুকুমের ওয়াস্তা।

মঁ জুরদাঁ

না, বলছি তো, ঠিক করেছ তুমি। তোমার কি মনে হয় ওসব জানা আমার গায়ে লাগবে?

প্রধান দরজি

এ একটা কথা হল। আমি বাজি ধরছি কোনো চিত্রকর পেন্সিল দিয়ে এর চেয়ে ঠিক ঠিক মাপনতো জামা আঁকতে পারবে না। আমার কাছে এক ছোকরা কাজ করে, কোট বানাতে দুনিয়ায় তার জুড়ি নেই; আর একজন আছে জ্যাকেট বানাতে যার মতো আধুনিক প্রতিভা আর দু'টি নেই।

মঁ জুরদাঁ

পরচুলো আর পালক ঠিক আছে তো ?

প্রধান দরজি

সব একদম ঠিক।

মঁ জুরদাঁ (দরজির হাতে পোশাক দেখে)

আহা ! বহি বহি। দরজি মশাই, এগো আমার আগের জামার টুকরো থেকে বানিয়েছেন ! দেখেই চিনেছি।

প্রধান দরজি

কাপড়টা এত চনৎকার লেগেছিল যে তার একটু ছাঁট নিজের জামার জন্য কেটে রেখেছিলাম।

মঁ জুরদাঁ

ঠিক, কিন্তু আমার কাপড় থেকে ওরকম নেয়ে দেওয়া উচিত হয় নি।

প্রধান দরজি

জামাটা গায়ে দেবেন ?

মঁ জুরদাঁ

যাচা দাও।

প্রধান দরজি

দাঁড়ান। ওরকম ভাবে হয় না। সঙ্গে লোক এনেছি গানের সঙ্গে আপনাকে জামা পরাবার জন্য, এ-রকম পোশাক যে উৎসব ক'রে পরাতে হয়। ওহে, তোমরা সবাই এস। গণ্যমান্য লোককে যেমন করো তেমনি করে ভদ্রমশাইকে জামাটা পরাও।

(চারজন ছোকরা দরজির প্রবেশ, দু'জন টেনে খুলে ফেলল তাঁর ব্যায়ামের আঁটসাঁট চোগা, আর দু'জন নিলে ভিতরের কোট ; গানের সঙ্গে তাঁকে তারপর পরাল নতুন পোশাক . মঁ জুরদাঁ দেখিয়ে দেখিয়ে তাদের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে লাগলেন—যাতে তারা ধরতে পারে সেটা মাপনতো হয়েছে কি না।)

সাকরেদ দরজি

বাবুমশাই, দরজির মজুরদের পানের জন্য কিছু বকশিশ চাই।

শ্রীযববিশ মল্লির ধরিকা

মঁ জুরদাঁ।

কি বলে ডাকলে?

সাকরেদ দরজি

প্রিয় বাবুমশাই।

মঁ জুরদাঁ।

আমার প্রিয় বাবুমশাই। দেখলে তো খানদানি লোকের মতো পোশাক পরার গুণ। সাধারণ লোকের সাজে সারা জীবন কাটালেও কেউ তোমাকে প্রিয় বাবুমশাই বলে ডাকবে না। নাও, 'বাবুমশাই'এর দরুণ ।

ছোকরা দরজি

মহাশয়, আমরা বড় কেতাব হলাম।

মঁ জুরদাঁ।

'মহাশয়', ওহো, ওঃ হোঃ, 'মহাশয়'! দাঁড়াও বন্ধু! 'মহাশয়ের' কিছু পাওনা হয়, তা শুধু ছোট একটু কথা 'মশাই' মাত্র নয়। ধরো, মহাশয় এইটি তোমাদের দিচ্ছেন।

ছোকরা দরজি

মহাশয়, আমরা মহানান্য মশাইয়ের স্বাস্থ্য কামনা ক'রে চুমুক দেব।

মঁ জুরদাঁ।

'আপনি মহানান্য'! ও হো হো। দাঁড়াও, যেও না। আমাকে বলা 'মহামান্য'! বাপ্‌রে, শেষে গিয়ে ঠেকবে মহা মহা মহানান্যে, আমার খোলা ফতুর করে দেবে। ধরো, মহা 'মহানান্যের' জন্য!

ছোকরা দরজি

মহাশয়, আমরা আপনার কৃপাকে তার উদারতার জন্য এতটার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মঁ জুরদাঁ।

সে বেশ বলেছে, তাকে সর্বস্ব দিতে যাচ্ছিলাম।

(চারজন ছোকরা দরজির আনন্দে নৃত্য—তা' দিয়ে দ্বিতীয় অঙ্কবিরতি)

দরজির ছাত্র (ভাই সরকার), মঁ জুরদাঁ (উদয়), দরজি (নরেন্দ্র জহর)

গানের মাষ্টার (কালু সরকার), নাচের মাষ্টার (নরেন্দ্র), অসিযুদ্ধের মাষ্টার (মনা সরকার), ভৃত্য (অমরেন্দ্র), দর্শনের মাষ্টার (মনোজ দাশগুপ্ত), মঁ জুরদাঁ (উদয়)

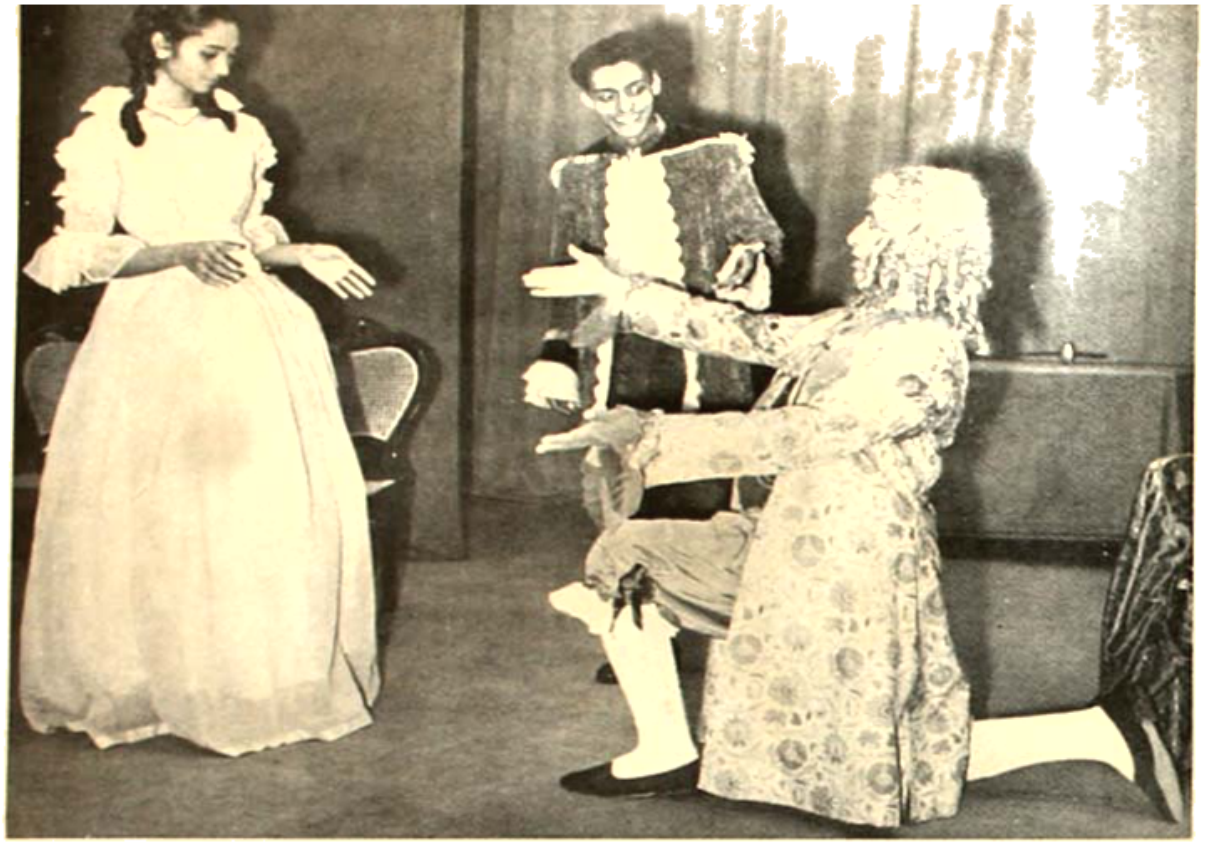

সোরিনেন (খুনুর), সোরাঁৎ (গানা সরকার), মঁ জুরদাঁ (উদার)

নিকোল (ছন্দা ঘোষ), মঁ জুরদাঁ (উদার), বাদান (আরতি দাশগুপ্ত)

লুসিন (অমিতা সেন), ক্লেগ্নৎ (মুকুল সরকার), কোডিয়েল (শ্রীময়ী),
নিকোল (ছন্দা ঘোষ)

(নরেন্দ্র, মুকুল, মনা, অমরেন্দ্র, ব্রজকিশোর, তাই প্রভৃতি) তুর্কীদল পরিবেষ্টিত
মঁ অরদঁ্যা (উদার)

বঁ জুবর্ণ্যা (উদয়ন), মাদাম (আরতি দাশগুপ্ত)

বুসিন (অমিতা সেন), ক্লেমঁৎ (মুকুল সরকার), কোডিয়েল (শ্রীময়ী), নিকোল (ছন্দা ঘোষ)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মঁ জুরদাঁ, দুইজন ভৃত্য

মঁ জুরদাঁ

পেছনে পেছনে আয়, যাতে শহরে গিয়ে একটু ঘুরে আমার সাজপোশাক দেখাতে পারি ; বেশ নজর রাখবি দু'জনে, ঠিক আমার পেছনে থাকবি, যাতে লোকেরা বুঝতে পারে তোরা আমারই ভৃত্য।

ভৃত্যদ্বয়

যেমন মর্জি আপনার, প্রভু।

মঁ জুরদাঁ

নিকোলকে ডাক, কিছু হুকুম দিতে চাই। তোদের আর যেতে হবে না, ওই সে আসছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মঁ জুরদাঁ, নিকোল, ভৃত্যদ্বয়

মঁ জুরদাঁ

নিকোল !

নিকোল

আজ্ঞে, হুকুম হোক।

মঁ জুরদাঁ

শোন।

নিকোল (অট্টহাসি)

হি-হি-হি-হি-হি।

মঁ জুরদাঁ।

কাকে দেখে হাসছিস?

নিকোল

হি-হি-হি-হি-হি-হি!

মঁ জুরদাঁ।

এই বেহায়াপনার মানে কী?

নিকোল

হি-হি-হি। কি আপনার পোশাক! হি-হি-হি।

মঁ জুরদাঁ।

কী হয়েছে তাতে?

নিকোল

হো-হো। হে ঈশ্বর! হি-হি-হি-হি-হি।

মঁ জুরদাঁ।

কি চমৎকার ভাঁড় তুই! আমাকে নিয়ে ঠাট্টা?

নিকোল

না, না, মশাই। তাতে আমার দিল চৌচির হবে। হি-হি-হি-হি-হি-হি!

মঁ জুরদাঁ।

এক ঘুষি মারব তোর নাকে, ফের যদি হাসিস।

নিকোল

মহাশয়, না হেসে যে পারছি না। হি-হি-হি-হি-হি-হি।

মঁ জুরদাঁ।

তুই থামবি?

নিকোল

বাবুমশায়, মাপ করবেন, কিন্তু আপনি এমন হাস্যকর যে না হেসে পারি না। হি-হি-হি।

মঁ জুরদঁ্যা

এটা ভ্যাঠামি, জানিস না ?

নিকোল

আপনি ও-বেশে একেবারেই কাঠখোট্টা। হি-হি।

মঁ জুরদঁ্যা

আমি তোকে...

নিকোল

দয়া করে মাপ করবেন। হি-হি-হি-হি !

মঁ জুরদঁ্যা

দেখ, যদি আবার একটুও হাসিস তবে তোর গালে এমন থাপ্পড় কষাব যে তেমনটি আর জন্মে খাস নি।

নিকোল

মশায়, ওতেই হবে, বেশ আর হাসব না।

মঁ জুরদঁ্যা

মনে থাকে যেন। এখন লেগে যা ঝাড়পোঁছ...

নিকোল

হি-হি !

মঁ জুরদঁ্যা

ঠিকমতো ঝাড়পোঁছ করবি...

নিকোল

হি-হি !

মঁ জুরদঁ্যা

আবার বলি, ঘর ঝাড়পোঁছ করবি, আর...

নিকোল

হি-হি।

মঁ জুরদাঁ

আবার ?

নিকোল

নিন মশাই, তার চেয়ে বরং দু'ঘা দিন কিন্তু পেটে ভরে হাসতে দিন, তাতে আমার উপকার হবে। হি-হি-হি-হি-হি !

মঁ জুরদাঁ

রাগ হচ্ছে আমার।

নিকোল

দয়া করুন মশাই, একটু হাসতে দিন। হি-হি-হি !

মঁ জুরদাঁ

তোকে ধরে'...

নিকোল

মশাই-ই.... পেট ফেটে-যে যাবে...যদি হাসতে না পারি। হি-হি-হি।

মঁ জুরদাঁ

এমন বেয়েবানুষ আর দেখেছিস যে বেলাজভাবে আমার হুকুম না শুনে মুখের ওপর হাসে ?

নিকোল

মহাশয়, আপনি কী চান আমি করি ?

মঁ জুরদাঁ

নচ্ছার, এখনই যে লোকজন সব আসবে তাদের জন্য ঘরদোর গুছানোয় একটু মন দে।

নিকোল

ওহো ! আরো তো হাসতে ইচ্ছা করছে ; আপনার সাজোপাজরা এমন অজাল জড়ো করে যে তাদের কথা উঠলেই আমার মেজাজ বিগড়ে যায়।

মঁ জুরদাঁ

তা'হলে তোর খাতিরে আর সকলের জন্য দরজা বন্ধ রাখতে হবে ?

নিকোল

কিছু লোকের জন্য বন্ধ রাগলে ভালো করতেন।

তৃতীয় দৃশ্য

মাদাম জুরদাঁ, মঁ জুরদাঁ, নিকোল, ভৃত্য

মাদাম

আহা রে, এ এক নয়া কাহিনী। বাবুসাহেব, এ সব কী, এই লটবহর? ওরকম নক্‌কা পায়রা সেজে তুমি দেখছি সকলের উপহাসের খোরাক। তোমার কি সাধ যে সকলে তোমাকে নিয়ে মস্করা করুক?

মঁ জুরদাঁ

গিন্নী, শুধু বুদ্ধু আর বুদ্ধুনীরাই আমাকে ঠাট্টা করবে।

মাদাম

কেবল এখনকার জন্যই নয়, অনেক দিন থেকেই তোমার হালচাল সকলের হাসি জাগায়।

মঁ জুরদাঁ

দয়া করে বলুন তো কারা দুনিয়ার এই লোকরা?

মাদাম

এরা তারাই যাদের ঘটে সুবুদ্ধি আছে এবং তোমার চেয়ে বিচক্ষণ। আমার কথা, তোমার হাবভাবে তো আমার মাথা কাটা যায়। এটা যে আমাদের বাড়ি তা ভুলেই গেছি। লোকে বলবে এটা নিত্য বহুরূপীর নাচঘর। সকাল থেকে,—না হলেই যেন ভয়ের ব্যাপার, —শুরু হয় বেহালার আর গায়কদের তারস্বর—যাতে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে প্রতিবেশীরা।

নিকোল

মাদাম হক কথা বলেছেন। এই সব রবাহুত বাউণ্ডুলেদের ভূতনেত্যয় ঘরদোর ছিমছাম রাখা মাথায় উঠল আমার। এরা গোটা শহরের যত পাড়া মাড়িয়ে ধুলো কুড়িয়ে আনে এখানে। বেচারী ফ্রাঁসোয়াজ নেচে ঘষে ঘষে পা ধরিয়ে ফেলল, যে-নেচেয় আপনার সৌখিন বন্ধুরা রোজ ঢালছেন আবর্জনা।

মঁ জুরদাঁ।

এই। বেটি ঝি নিকোল! জিবের ধার তো বেশ, ঠিক যতখানি গেঁয়ো!

মাদাম

নিকোল ঠিকই বলেছে, তার বুদ্ধি তোমার চেয়েও বেশি। আমি জানতে চাই এ বয়েসে নাচের মাষ্টার দিয়ে কী হচ্ছে।

নিকোল

আর একটা বদখত অসিযুদ্ধের মাষ্টার দিয়ে, যে-লোকটা দাপাদাপিতে সারা বাড়ি কাঁপায়, হলঘরের মেঝে খুঁড়ে ফেলে?

মঁ জুরদাঁ।

দাসী বেটি, গিন্নী, তোমরা থাম তো!

মাদাম

সর্বনাশ! তুমি কি পা জোড়া খোঁড়া করার জন্য নাচ শিখছো?

নিকোল

সর্বনাশ! আপনার কি মানুষ খুনের মতলব?

মঁা জুরদাঁ।

চুপ কর। বলছি, তোমরা মূর্খ, দু'জনেই—এসবের উপকারিতা জান না।

মাদাম

মেয়ের বয়েস হ'ল, তোমার এখন তার বিয়ের সম্বন্ধে ভাবা উচিত।

মঁ জুরদাঁ।

মনের মতো পাত্র যখন উদয় হবে তখনই মেয়ের বিয়ের কথা ভাবব; কিন্তু অন্য ভালো জিনিস শেখার কথাও ভাবব।

নিকোল

মাদাম, আবার বোঝার ওপর যে শাকের আঁটি, শুনলাম উনি আজ থেকে আরো জুটিয়েছেন একটি তত্ত্বকথার মাষ্টার।

মঁ জুরদাঁ।

আলবৎ। আমি একটু রসবোধ অর্জনের ইচ্ছা করেছি, শিখতে চাই বিজ্ঞ

লোকদের সঙ্গে তর্ক করতে।

মাদাম

এখন ইস্কুলে যেতে কেমন লাগবে, আর এ-বয়েসে লাঠ্যৌষধি?

মঁ জুরদাঁ

না-ই বা কেন। সকলের সামনে এই মুহূর্তেই যদি ঠ্যাঙানি খাই তো জানলাও স্কুলে কি শেখা হয়।

নিকোল

হ্যাঁ, তাতে আপনার খাসা উপকার হবে।

মঁ জুরদাঁ

সন্দেহ নেই।

মাদাম

তোমার ঘরদোর সামলানর পক্ষে তার বড়ই প্রয়োজন।

মঁ জুরদাঁ

তোরা দু'জনেই কথা বলিস উজবুকের মতো। তোদের অজ্ঞতা দেখে আমার মাথা হেঁট হয়। (মাদাম জুরদাঁর প্রতি) উদাহরণ নাও, যেমন, জান এখন কী বলছ?

মাদাম

হ্যাঁ, যা বলছি খাঁটি কথা বলছি, আর তোমাদের ভাবসাব অন্যরকম হওয়া উচিত।

মঁ জুরদাঁ

সেকথা বলছি না। জিজ্ঞাসা করি, যে কথাগুলি বলছ তা কী?

মাদাম

সেসব কথার অর্থ গভীর, আর তোমার ব্যবহার অর্থহীন।

মঁ জুরদাঁ

সে কথা বলছি না, বুঝলে? জিজ্ঞাসা করছি—যা এইমাত্র বললাম তা কী?

মাদাম

বুঝুনি।

মঁ জুরদাঁ

না, না, তা নয়। এখন যে ছন্দে আলাপ করছি তা কী?

নাদান

মানে?

মঁ জুরদাঁ

কী বলে তাকে?

নাদান

যা খুশি বলা যায়।

মঁ জুরদাঁ

হাঁদিরাম, ওটার নাম গদ্য।

নাদান

গদ্য?

মঁ জুরদাঁ

হাঁ, গদ্য। যা গদ্য তা পদ্য নয়; আবার যা-কিছু পদ্য নয় তা গদ্য। দেখলে তো পড়াশুনোর ফল। আর তুই (নিকোলের প্রতি), তুই জানিস U বলতে কী করতে হয়?

নিকোল

সে কী।

মঁ জুরদাঁ

হাঁ। যখন U বলিস তখন কী করিস?

নিকোল

কী?

মঁ জুরদাঁ

U বলতো একবার, বলেই দেখ।

নিকোল।

বেশ তো, U.

মঁ জুরদাঁ।

কী করলি?

নিকোল

বললাম U.

ম জুরদাঁ।

তা তো বটেই, তবে যখন বলিস তখন করিস কী?

নিকোল

আপনি যেমন বলেন তেমনি করি।

মঁ জুরদাঁ।

উঃ। বোকাদের নিয়ে কারবার কি মুশকিল! তুই ঠোঁট লম্বা করিস, তারপর নিচের চোয়াল ওপরের চোয়ালের দিকে টেনে তুলিস, U, দেখলি তো? মুখভঙ্গি করলাম, U.

নিকোল

ভারি মজাদার তো।

বাদাব

মজা, বলে মজা!

মঁ জুরদাঁ।

তাও যদি দেখতিস O, DE, DE আর EF, EF.

বাদাব

এসব আবার কি হাসির জিনিস?

নিকোল

এসবে আমাদের লাভ?

মঁ জুরদাঁ।

মূর্খ বেয়েমানুষদের দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যায়।

বাদাম

যাও, জঞ্জালসহ এই হতভাগাদের ঝেঁটিয়ে বের করা উচিত তোমার।

নিকোল

সবার আগে ওই চাঙা অস্ত্রধরকে, যে স্যাঙাৎ আমার সারা বাড়িতে ধুলো ছড়ায়।

মঁ জুরদাঁ

সাবাস! ওই লড়িয়ে লোকটা তোর কলিজা বেশ কেড়েছে মনে হয়! তোর আস্পর্ধার সমুচিত শিক্ষা দিচ্ছি এখনই। (হুকুম হতেই এরোয়াল এল, তার একটি নিকোলকে দিয়ে) দাঁড়া। হাতে-কলমে হয়ে যাক। দেহটা সটান। প্রথম খোঁচা দিলে এই রকম করতে হয় দ্বিতীয় খোঁচা দিলে শুধু এই রকম। খুন না হবার এই কায়দা; কারো সঙ্গে লড়াইয়ে নামলে নিজের শক্ত খুঁটি ধরা ঠিক নয়? দেখাচ্ছি, একটু ঠেল তো আমাকে।

নিকোল

কেমন, ঠিক? (নিকোল কয়েক ঘা খোঁচা মেরে ঠেলল)

মঁ জুরদাঁ

খাসা! আরে বাপরে! উঃ! একটু আস্তে! বেটিকে যমেও নেয় না!

নিকোল

আপনিই তো আমাকে ঠেলতে বললেন।

মঁ জুরদাঁ

তা বটে; তবে তুই কেন প্রথম প্যাঁচের খোঁচা না মেরেই দ্বিতীয় প্যাঁচের খোঁচা দিলি, আমি যে সরব তার জন্য অপেক্ষা করারও তর সয় না তোর।

বাদাম

কর্ত্তামশাই, যত বিটকেলেমি ধরে তুমি পাগল হয়েছ, আর এর শুরু হয়েছে যবে থেকে বড়লোকের পা চাটছ।

মঁ জুরদাঁ

বড়লোকেদের সঙ্গে মিশি বলে বুদ্ধিও তাদের মতো দেখাতে চাই; তোমার ছোটলোকদের সঙ্গে মেশার চেয়ে তা ভালো।

বাদাম

সে তো ঠিকই! তোমার রাজরাজড়াদের সঙ্গ লাভজনক বটে, আর ওই আজব

কাউন্টটার সঙ্গে তো বেশ লটকেছ...

মঁ জুরদাঁ

চুপ। ভেবেচিন্তে কথা ব'লো। গিন্নী, তুমি জানো ওর সম্বন্ধে যখন কথা বলছ তখন কার সম্বন্ধে বলছ? তুমি যত না ভাবতে পার তার চেয়েও সম্ভ্রান্ত লোক এ-ব্যক্তি; লোকটির রাজদরবারে দাপট, আমি যেমন তোমার সঙ্গে কথা বলি, ঠিক তেমনি সে রাজার সঙ্গে কথা বলে। এমন জিনিস আমার কাছে সম্মানের নয় যে লোকে দেখছে এরকম দুর্দান্ত লোক ঘন ঘন আমার বাড়ী আসছে, আমাকে বন্ধু বলে আর তার সমান ভাবে আমাকে? আমার জন্য তার সদিচ্ছা কল্পনাতীত; সকলের সামনে সে আমাকে দেখায় যে প্রীতি তাতে আমি অভিভূত।

মাদাম

ঠিক, তোমার জন্য তার সদিচ্ছা আছে এবং দেখার অনুরাগ, কিন্তু তোমার অর্থও গেলে বেশ।

মঁ জুরদাঁ

তাতে কি! এটা আমার পক্ষে কি সম্মানের নয় এমন অবস্থার লোককে ধার দেওয়া? যে মহাশয় আমাকে তার প্রিয় বন্ধু বলে ডেকেছে তার জন্য এর চেয়ে কম আর কী করা যায়?

মাদাম

বলি মশাই, তোমার জন্য কী করেন উনি?

মঁ জুরদাঁ

সেসব শুনলে আক্কলে গুড়ুম হয়ে যাবে।

মাদাম।

কী সেটা?

মঁ জুরদাঁ

যাকগে, ব্যাখ্যা করতে পারব না। এটাই যথেষ্ট, যদি ধার দিয়ে থাকি তবে ঠিক-ঠিকই সে শিগগির দেনা শোধ করবে।

মাদাম

হ্যাঁ, হ্যাঁ। পিত্যেশে বসে থাক তার জন্য।

মঁ জুরদাঁ

নিশ্চয়। তাই সে বলেনি?

নাদার

ঠিক, ঠিক, তোমাকে হতাশ করতে ব্যর্থ সে হবে না।

মঁ জুরদাঁ

সে ভদ্রলোকের নামে দিব্যি কেটেছে।

নাদার

ওটা কথার কথা!

মঁ জুরদাঁ

উঃ, সহধর্মিনী, তুমি বেজায় চেঁচা বলে দিচ্ছি সে কথা রাখবে—তাতে আমার এক বিন্দু সন্দেহ নেই।

নাদার

আর আমি, আমারও সন্দেহ নেই যে রাখবে না; আর যেসব নাবন্‌তা সে করে তা বশ করার জন্য।

মঁ জুরদাঁ

চুপ। ওই যে আসছে।

নাদার

অন্য কিছুই ওঁর কাছ থেকে পাওয়া যাবে না। উনি আসছেন বোধ হয় আবার তোমাকে মোহন করতে, লোকটার ছায়া দেখলেও বমি আসে।

মঁ জুরদাঁ

চুপ করো বলছি।

চতুর্থ দৃশ্য

দোরাঁৎ, মঁ জুরদাঁ, মাদাম জুরদাঁ, নিকোল

দোরাঁৎ

মঁ জুরদাঁ, প্রিয় বন্ধু, কেমন আছেন?

মঁ জুরদাঁ

দারুন ভালো, বশাই, আপনার কোনো কাজে লাগি যদি।

দোরাঁৎ

এই যে মাদাম জুরদাঁ, আপনি কেমন?

মাদাম

মাদাম জুরদাঁর যেমন দিন চলে।

দোরাঁৎ

সে আবার কি! মঁসিয় জুরদাঁ, আপনি তো বিশ্বের সেরা সাজুকী!

মঁ জুরদাঁ

তা যেমন দেখছেন।

দোরাঁৎ

এই পোশাকে আপনাকে যা মানিয়েছে, রাজসভায় ছোকরারা আপনার কাছেই লাগে

মঁ জুরদাঁ

হেঁ, হেঁ।

মাদাম (স্বগত)

ঠিক চুলকানির জায়গায় এ হাত বুলাতে জানে!

দোরাঁৎ

পিছন ফিরুন তো। যা মানিয়েছে না।

বাদান (মৃদুস্বরে)

সামনে যেমন পিছনেও তেমনি, হাবা গঙ্গারাম।

দোর্রাঁৎ

মঁ জুরদাঁ্যা, বিশ্বাস করুন, আপনাকে দেখার জন্য কি ব্যাগ্রতা জেগেছিল। সারা দুনিয়ায় আপনার মতো লোককে সবচেয়ে বেশি সমীহ করি, রাজবাড়িতে আজ সকালেও আপনার কথা বলছিলাম।

মঁ জুরদাঁ্যা

মহাশয়, আপনি আমাকে বেজায় খাতির দেখাচ্ছেন। (মাদাম জুরদাঁ্যার প্রতি) খোদ রাজার মতো।

দোর্রাঁৎ

আসুন, পরে নিন...

মঁ জুরদাঁ্যা

মহাশয়, জানি কি সম্মান আপনারও প্রাপ্য।

দোর্রাঁৎ

দোহাই ঈশ্বর, পরে' ফেলুন, আমাদের মধ্যে লৌকিকতার কি প্রয়োজন।

মঁ জুরদাঁ্যা

মহাশয়...

দোর্রাঁৎ

বলছি তো, মঁ জুরদাঁ্যা, পরে' নিন; আপনি আমার বন্ধু।

মঁ জুরদাঁ্যা

আমি আপনার গোলাম।

দোর্রাঁৎ

আপনি মাথা না ঢাকলে আমিও ঢাকা দেব না।

মঁ জুরদাঁ্যা

আমি অস্বস্তির চেয়ে অভব্যতা পছন্দ করি।

দোরাঁৎ

আমি আপনার কাছে ঋণী, জানেন তো।

বাদাম (স্বগত)

সেকথা হাড়ে হাড়ে জানি।

দোরাঁৎ

অনেকবার আপনি আমাকে মুক্তহস্তে ধার দিয়েছেন, তাতে নিঃসন্দেহে দেখিয়েছেন শ্রেষ্ঠ সহৃদয়তা।

মঁ জুরদাঁ

মশাই আপনি ঠাট্টা করছেন।

দোরাঁৎ

অবিশ্যি আমাকে দান করলে তার প্রতিদান দিতে আমি জানি, আমাকে খুশি করলে তার প্রত্যুত্তরও দেই।

মঁ জুরদাঁ

তাতে সন্দেহ নেই মশাই।

দোরাঁৎ

এই লেনদেন থেকে মুক্তি চাই, আমি এসেছি আমাদের হিসাবটা মিটিয়ে ফেলতে।

মঁ জুরদাঁ (খাটো গলায় বাদামের প্রতি)

বলিনি একথা!

দোরাঁৎ

দেখা যাক আপনার পাওনাগণ্ডা।

মঁ জুরদাঁ (চুপি চুপি বাদামকে)

এবার দেখলে তো তোমার হীন সন্দেহ!

দোরাঁৎ

আপনার মনে আছে নিশ্চয় কত আমাকে ধার দিয়েছেন।

মঁ জুরদাঁ

মনে তো হয় আছে। মুখস্তই বলতে পারি। এই যে। একবার দিয়েছি দু'শো 'লুই'।

দোরাঁৎ

তা ঠিক।

মঁ জুরদাঁ

আর একবার, ছ'কুড়ি।

দোরাঁৎ

ঠিক।

মঁ জুরদাঁ

আর একবার একশ' চল্লিশ।

দোরাঁৎ

নির্ভুল আপনার হিসাব।

মঁ জুরদাঁ

এই তিন খেপে মোট হল গিয়ে চারশো' ঘাট লুই, তার মূল্য পাঁচ হাজার ঘাট 'লিভ্র'।

দোরাঁৎ

হিসাব নিখুঁত। পাঁচ হাজার ঘাট 'লিভ্র'।

মঁ জুরদাঁ

এক হাজার আটশো বত্রিশ 'লিভ্র' আপনার ঝুটি বননেওয়ালাকে।

দোরাঁৎ

নির্ভুল।

মঁ জুরদাঁ

দু'হাজার সাত শো আশি 'লিভ্র' আপনার দরজিকে।

দোরাঁৎ

তা ঠিক।

মঁ জুরদাঁ

চার হাজার তিন শো সাতানব্বই 'লিভ্র্', বারো 'সোল', আট 'দিনার' আপনার দোকানীকে।

দোরাঁৎ

অবশ্য। বারো সোল, আট দিনার; হিসাব ঠিক।

মঁ জুরদাঁ

আর দশ হাজার সাতশ' আট চল্লিশ লিভ্র্, সাত সোল, চার দিনার আপনার সহিসকে।

দোরাঁৎ

সবই ঠিক। কিন্তু মোট কতত্তে দাঁড়াল এসে?

মঁ জুরদাঁ

মোট পনরো হাজার আটশো' 'লিভ্র্'।

দোরাঁৎ

তের ঠিক আছে—পনরো হাজার আটশো 'লিভ্র্। এর সঙ্গে আরো যোগ দিন এখন যে ধার দেবেন দু'শো 'পিস্তোল'। তা নিয়ে মোটমাট আঠার হাজার ক্রঁ, সব আপনাকে পয়লা ফিরিয়ে দেব।

মাদাম (চুপিচুপি মঁ জুরদাঁকে)

কেমন আন্দাজ ঠিক নয়?

মঁ জুরদাঁ (মাদামকে চুপিচুপি)

থাম!

দোরাঁৎ

আমার দাবি মেটাতে অসুবিধা আছে?

মঁ জুরদাঁ

আরে না!

মাদাম (চুপিচুপি মঁসিয়েকে)
লোকটা তোমাকে পেয়েছে দুধ দুইবার গাই।

মঁ জুরদাঁ (নিচু গলায় মাদামকে)
চুপ করো।

দোরাঁৎ
আপনার অসুবিধা থাকলে অন্যত্র চেষ্টা করব।

মঁ জুরদাঁ
না, মশাই।

মাদাম (মঁসিয়েকে চাপা গলায়)
তোমাকে ফতুর না করে লোকটা ছাড়বে না।

মঁ জুরদাঁ (মাদামকে গোপনে)
বলছি চুপ করো।

দোরাঁৎ
শুধু বলে দিন যদি আপনার অসুবিধা থাকে।

মঁ জুরদাঁ
আদৌ না।

মাদাম (মঁসিয়েকে জনান্তে)
লোকটা কথার যাদুকর।

মঁ জুরদাঁ (মাদামকে জনান্তে)
মুখ বুজে থাক।

মাদাম (মঁসিয়েকে চাপাকণ্ঠে)
শেষ কড়িটি পর্যন্ত ও তোমাকে চুষবে।

মঁ জুরদাঁ (মাদামকে চুপিচুপি)
কথা থামাবে?

দোরাঁৎ

আমার বহু লোক আছে যারা সানন্দে ধার দেবে . কিন্তু আপনি সেরা বন্ধু তাই ভাবলাম অন্যের কাছে চাইলে আপনার প্রতি অন্যায় করা হবে।

মঁ জুরদাঁ

আপনি এতে আমার প্রতি দারুন সম্মান দেখালেন। যাচ্ছি আপনার দক্ষিণা দেখতে।

মাদাম (নঁসিয়কে চুপিচুপি)

কি! আবার নচ্ছারটাকে ধার দিতে যাচ্ছ?

মঁ জুরদাঁ (মাদামকে নিম্নস্বরে)

কী করা যায়? এমন অবস্থায় লোককে ফেরানো চলে কি, যে আমার কথা রাজগৃহে তুলেছে?

মাদাম (নঁসিয়কে চাপা গলায়)

যাও, তুমি ঠকবার উপযুক্ত পাত্র।

পঞ্চম দৃশ্য

দোরাঁৎ, মাদাম জুরদাঁ, নিকোল

দোরাঁৎ

আপনাকে খুব মনমরা লাগছে। মাদাম জুরদাঁ, কী হয়েছে আপনার?

মাদাম

ফেঁপে ফুলে না উঠলেও মাথাটা আমার বুঠোর চেয়ে বড়।

দোরাঁৎ

আপনার মেয়েটি কোথায়, তাকে দেখতে পাই না যে?

মাদাম

আমার মেয়ে যেখানে থাকবার সেখানেই বেশ আছে।

দোরাঁৎ

কেমন যাচ্ছে তার?

মাদাম

দু'পায়ে যেমন সে চলতে পারে।

দোরাঁৎ

আসুন না একদিন ওকে নিয়ে, রাজবাড়িতে নাচ নাটক দেখতে।

মাদাম

হ্যাঁ, আমাদের খুবই ইচ্ছা করে প্রাণ খুলে হাসতে, দারুণ মনে হয় প্রাণ ভরে হাসি।

দোরাঁৎ

মাদাম জুরদাঁ, বুঝতে পারি বয়েসকালে অনেক উমেদার ছিল আপনার, যেমন রূপসী ও সুরসিকা ছিলেন আপনি!

মাদাম

দেখুন মশায়! মাদাম জুরদাঁ কি অথর্ব হয়েছেন, না বৃদ্ধী রোগে মাথা তার টালমাটাল করে?

দোরাঁৎ

মাদাম জুরদাঁ, ক্ষমা করবেন আমাকে। কত যৌবন-সমৃদ্ধ আপনি, তা ভেবে বলি নি। আমি প্রায়ই ভুলোমন হয়ে থাকি। আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য

মঁ জুরদাঁ, মাদাম জুরদাঁ, দোরাঁৎ, নিকোল

মঁ জুরদাঁ

এই নিন গোনাগুনতি দু'শো 'লুই'।

দোরাঁৎ

মঁ জুরদাঁ, আপনাকে কথা দিচ্ছি আমি আপনার বশম্বদ, আপনার জন্য রাজসভায় কিছু করতে ছটকাটিয়ে মরছি।

মঁ জুরদাঁ

বড়ই কৃতার্থ হলাম।

দোরাঁৎ

মাদাম জুরদাঁ। যদি রাজবেশ। দেখতে চান আমি তাঁকে সবচেয়ে ভাল আসনটি দিতে পারি।

মাদাম

যথেষ্ট হয়েছে।

দোরাঁৎ (চুপিসারে মঁ জুরদাঁকে)

আমি তো আপনাকে লিখেছি, আমাদের সুন্দরী বার্কুইসনী নাচ ও ভোজের জন্য এখনি এসে পড়বেন ; আপনার কথামতো উপহার নিতে শেষমেষ তাঁকে রাজী করাতে পারলাম।

মঁ জুরদাঁ।

চলুন, একটু তফাতে দাঁড়াই, কারণ আছে।

দোরাঁৎ

সাত দিন আপনার সঙ্গে দেখা হয় নি, তাই জানাতে পারি নি আপনার দেওয়া হীরেটা তাঁকে দিয়েছি ; অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তাঁর সংস্কার ভেঙে রাজী করালাম। আর আজই তিনি মত দিলেন সেটা নিতে।

মঁ জুরদাঁ।

কেমন লাগল ওটা তাঁর কাছে ?

দোরাঁৎ

গ্রেক মারাত্মক আর আদৌ আশ্চর্য হব না যদি এই হীরে তাঁর ওপর গভীর প্রভাব ফেলে।

মঁ জুরদাঁ।

ঈশ্বরের দয়া !

মাদাম (নিকোলকে)

লোকটা একবার ওঁকে পেলে ছিনে জোঁকের মতো কামড়ে থাকে।

দোরাঁৎ

আমি তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছি হীরেটির দাম আর আপনার প্রেমের মাহাত্ম্য।

মঁ জুরদাঁ

এমন ঔদার্য আমাকে অভিভূত করে ফেলে . আমি তো অবাক দেখে যে আপনার মতো সমঝদার লোক আমার জন্য নেমে এসেছেন এত সব করতে।

দোরাঁৎ

ঠাট্টা করছেন? বন্ধুদের জন্য ওরকম সংস্কারের বাধা মানলে চলে? সুযোগ এলে আপনিই কি আমার জন্য আমার মতো করতেন না?

মঁ জুরদাঁ

ওঃ নিশ্চয়, সানন্দে।

নাদাব (নিকোলকে)

লোকটার হাজিরা বোধা হয়ে চাপছে আমার কাঁধে!

দোরাঁৎ

আমি, আমি বন্ধুর উপকার করতে গিয়ে লাভ-লোকসান দেখি না ; আমার পরিচিত মার্কুইসনীর প্রতি আপনার ব্যগ্র প্রেম জানাতেই দেখলেন তো আমি তৎক্ষণাৎ আপনার সাহায্যে লেগে গেলাম।

মঁ জুরদাঁ

সত্যি, এত অনুগ্রহে আমি বিহ্বল।

নাদাব (নিকোলকে)

লোকটা যাবেই না না-কি।

নিকোল

দু'জনে বেশ জুটি বেঁধেছে।

দোরাঁৎ

মহিলাটির হৃদয় জয়ের ঠিক পথ নিয়েছেন আপনি। মেয়েরা তাদের জন্য অর্থ-ব্যয়কে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে ; আপনার যখন-তখন আবেদন, আপনার চালাও আমোদ-প্রমোদ ; তাঁর নয়নরঞ্জনের জন্য জলের ওপর আতসবাজি ; আপনার কাছ থেকে তাঁর পাওয়া হীরে, আর এই যে প্রমদোৎসবের আয়োজন করেছেন , এসব আপনি যা না কথায় পারতেন তার চেয়ে অনেক ভালো প্রকাশ করেছে তাঁর উপর আপনার টান।

মঁ জুরদাঁ

এমন কোনো খরচে আমি পেছপা নই যা দিয়ে তাঁর অন্তরে পৌঁছানো যায়। গুণী মহিলাদের উপর আমার দারুণ দুর্বলতা, যে-কোনো দামে সে সম্মান কিনতে রাজী আমি।

মাদাম (চুপিচুপি নিকোলকে)

দু'জনের এত কী গোপন কথা থাকতে পারে? পা টিপে টিপে যা, শুনে আয় একটু।

দোরাঁৎ

ক্রমশ সুবিধে মতোই তাকে দেখার সৌভাগ্য হবে আপনার, আপনার চোখজোড়া তৃপ্ত হবার অঢেল সময় পাবে।

মঁ জুরদাঁ

পুরো সুবিধের জন্য আমার স্ত্রীকে হুকুম দিয়েছি আমার বোনের বাড়িতে নৈশভোজে যেতে, সারা সন্ধ্যেটা সেখানেই সে থাকবে।

দোরাঁৎ

খুব সুবুদ্ধির কাজ করেছেন, কারণ আপনার স্ত্রী আমাদের বিব্রত করতে পারতেন। বাবুর্চিকে বলে দিয়েছি কি রাঁধতে হবে, আর হুকুম দিয়েছি নাচের জন্য কি দরকার। এটা আমার উদ্ভাবনা : এখন পরিকল্পনা অনুযায়ী যদি কাজ হয় তবেই, অবশ্য আমি নিশ্চিত যে...

মঁ জুরদাঁ (নিকোল আড়ি পাতছে দেখে তার কান মলে দিয়ে)

বলিহারি, তোর আস্পর্দ্ধা তো কম নয়।
(দোরাঁৎকে)
চলুন তাহলে যাওয়া যাক।

সপ্তম দৃশ্য

মাদাম জুরদাঁ, নিকোল

নিকোল

হক বলছি, কৌতূহলের জন্য আমার বেশ খেসারত দিতে হয়েছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস পাথরের তলায় শামুক আছে, কথা হচ্ছিল কোনো ব্যাপার নিয়ে অথচ সেখানে আপনার উপস্থিতি তাদের কাম্য নয়।

বাদাম

এতো আজ নতুন নয় নিকোল যে স্বামীর সম্বন্ধে সন্দেহ জাগছে। পৃথিবীতে সবার চেয়ে বেশি প্রবঞ্চিত আমি ; কিন্তু এ হয়ত কোনো প্রেমোৎসব—দেখতে হবে কি সে জিনিস। কিন্তু আমার মেয়েটার কথা ভাবা যাক। তুই তো জানিস তাকে ক্লেয়ঁৎ কি ভালোবাসে। ছেলেটাকে ভালো লাগে, ওকে সাহায্য করব এবং পারলে ওরই হাতে লুসিলকে দেব।

নিকোল

সত্যি বলতে কি, ঠাকুরাণী, আপনার মনোভাবে আমি মুগ্ধ—কর্তাটি যদি আপনার মন গলিয়েছে, তার ভৃত্যটি আমার হৃদয় কম গলায় নি, আশা আছে তাদের বিয়ের ছাঁদনা-তলায় ছায়ায় আমাদেরটাও যদি হয়ে যায়।

বাদাম

ছুটে যা এক্ষুনি, আমার হয়ে গিয়ে বল চলে আসতে—দু'জনে কর্তার কাছে দাবি করব মেয়েকে।

নিকোল

মহারাণী, ফূর্তিতে ছুটছি আমি, এর চেয়ে মনের মতো কাজ আর হয় না। (স্বগত) যাই, সকলেই খুশি হবে ভাবছি।

অষ্টম দৃশ্য

ক্লেয়ঁৎ, কোভিয়েল, নিকোল

নিকোল

এই যে দেখা হয়ে গেল। আমি আনন্দের দূত, আমি এসেছি...

ক্লেয়ঁৎ

হতভাগী দূর হও, তোমার চতুর বুলিতে আর ভজাতে এস না।

নিকোল

এই ভাবেই কি আপনি অভ্যর্থনা...

ক্লেয়ঁৎ

সরে পড়ো, গোল্লা গিয়ে বলো তোমার কর্তানীকে যে তিনি আর সাদাসিধে ক্লেয়ঁৎকে হেনস্তা করতে পাবেন না।

নিকোল

এ পাগলামির অর্থ কী? বেচারা কোভিয়েল আমার, বল তো ব্যাপারখানা কী?

কোভিয়েল

তোমার বেচারা কোভিয়েল, বজ্জাত! যাও এখনই, আমার চোখের বাইরে যাও পাজি রমনী, শান্তিতে থাকতে দাও আমাকে।

নিকোল

কি! তুমিও আমাকে...

কোভিয়েল

নজর ছাড়িয়ে ভেগে পড়, বলছি; ফাঁদুনি গাইতে হবে না।

নিকোল

সাবাস। দু'জনকে কোন তীরুলে কামড়ালো? কর্তানীকে বলিগে যাই এমন সুন্দর কাহিনী।

নবম দৃশ্য

ক্লেঁৎ, কোভিয়েল

ক্লেঁৎ

বটে। একজন প্রেমিকের সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করা? আর তেমন প্রেমিক যে সবার চেয়ে বেশি বিশ্বস্ত আর উৎসাহী।

কোভিয়েল

আমাদের দু'জনের সঙ্গেই ওরা চরম দুর্ব্যবহার করেছে।

ক্লেঁৎ

আমি জেনেছি তার আকণ্ঠ আকুলতা, নিকষিত প্রেম। জগতে তাকে ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসি না, তাকে ছাড়া আর কাউকে মনে স্থান দিই না। আমার ভাবনা আমার কামনা আমার সুখ সবই সে; শুধু তার কথাই বলি, শুধু তাকেই ভাবি, তারই স্বপ্ন দেখি, তারই জন্য নিঃশ্বাস নিই, আমার হৃদয় তার অন্তরে শশ্বিত আর দেখ, এত ভালোবাসার উপযুক্ত এই পুরস্কার। দু'দিন তার দেখা পাই না, তা আমার কাছে ভয়ঙ্কর দুই শতাব্দী; দৈবাৎ তার সঙ্গে দেখা হয়; সে-দর্শনে হৃদয় আমার উড়ে চলে, আমার আনন্দ ফুটে ওঠে

তার মুখে তার দিকে উন্মাদে ছুটে যাই আর বিশ্বাসঘাতিনী আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, দ্রুতপদে চলে যায় যেন জীবনে আমাকে চিনতই না !

কোভিয়েল

আমিও ওই একই কথা বলব।

ক্লেঁৎ

কোভিয়েল, লুসিলের মতো ভণ্ড অকৃতজ্ঞ আর দু'টি দেখা যায় কি ?

কোভিয়েল

আর পাজি নিকোলের মতোই বা কি ?

ক্লেঁৎ

তাও আবার তার মাধুর্যের জন্য কত অনন্ত ত্যাগ, দীর্ঘনিঃশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি বায়ের পর !

কোভিয়েল

তার হেঁসেলে কত ব্যাকুল স্তুতি, ভাবনা ও সেবা ঢালার পর !

ক্লেঁৎ

তার জানুতে কত ফেলেছি চোখের জল !

কোভিয়েল

কুয়ো থেকে কত বালতি জল তুলে দিয়েছি তার জন্য।

ক্লেঁৎ

নিজের চেয়ে তাকে বেশি ভালোবেসে দেখিয়েছি কত আগ্রহ।

কোভিয়েল

তার ঘরে গ্যাস খুলে দিয়ে সয়েছি কি উত্তাপ।

ক্লেঁৎ

আমাকে দেখে অবজ্ঞায় সে পালিয়ে যায়।

কোভিয়েল

আমাকে দেখে তাচ্ছিল্যভরে সে পিছন ফেরে।

ক্লেয়ঁৎ

এমন বজ্জাতিকে কঠোরতর শাস্তি দেওয়া উচিত।

কোভিয়েল

এ বিশ্বাসঘাতকতার প্রাপ্য হাজার কানমলা।

ক্লেয়ঁৎ

দোহাই তোর, আমাকে আর তার হয়ে ওকালতি করতে উপদেশ দিস না।

কোভিয়েল।

মশাই, আমি? ভগবান রক্ষা করুন!

ক্লেয়ঁৎ

আমার কঠিন শাস্তির পথে আর বাধা দিস না।

কোভিয়েল

সে-ভয় নাই বা করলেন।

ক্লেয়ঁৎ

না, জেনে রাখ, তার স্বপক্ষে বক্তৃতায় কোনো ফল হবে না।

কোভিয়েল

কে সে-কথা ভাবছে?

ক্লেয়ঁৎ

তার প্রতি রাগ বজায় রাখতে আর তার সঙ্গে চিঠি চালাচালি থামিয়ে দিতে আমি দৃঢ়-সংকল্প

কোভিয়েল

আমিও রাজী তাতে।

ক্লেয়ঁৎ

সেই কাউন্ট যখন তার কাছে যায়, তার চোখে হয়ত ভালো-লাগা ফুটে ওঠে. বেশ দেখতে পাচ্ছি তখন তার কল্পনা আলোয় ঝকমক করে ওঠে। কিন্তু নিজের সম্মান রাখতে আমি তার শৈথিল্য জয় করবই। রং-বদলের দিকে সে যত দ্রুত চলেছে—বেশ তা দেখতে পাচ্ছি—আমিও তত দ্রুত যাব. আমাকে বাদ দিয়ে গৌরব অর্জনের সুযোগ দেব না।

কোভিয়েল

চমৎকার বলেছেন, নিজের কথা বলতে গেলে আমার মত আপনার মতের সঙ্গে এক।

ক্লেয়ৎ

সেই প্রেমের অবশিষ্ট যা এখনো সায় চায় তার বিরুদ্ধে আমার বিরক্তি অনুমোদন আর সংকল্প সমর্থন কর। দয়া করে তার বিপক্ষে যত পার কুকথা বল। আমার কাছে তাকে অবাঞ্ছনীয় ক'রে ধর আমার বিতৃষ্ণা জন্মাতে দেখাও যত পার তার গলদ।

কোভিয়েল

মশায়, উনি? উনি হলেন সুন্দরী হতচ্ছাড়ী, অপার ছলনাময়ী, আপনার এত প্রেমের পাত্রী! আমি তো ওঁর মধ্যে নিতান্ত আটপৌরে ছাড়া কিছু দেখি না, আপনি ওঁর চেয়ে আপনার জন্য যোগ্যতর হাজার নেয়ে দেখতে পাবেন। প্রথমত, ওঁর ক্ষুদে চোখ।

ক্লেয়ঁৎ

তা হবে, ওর চোখ ছোট, তবে আগুন তাতে প্রচুর, সবচেয়ে উজ্জ্বল, সকলের চেয়ে মর্মভেদী, সকলের চেয়ে হৃদয়স্পর্শী।

কোভিয়েল

ওঁর হাঁ-টা প্রকাণ্ড।

ক্লেয়ঁৎ

না, কিন্তু সেখানে যে লাবণ্য তা আর কারো মুখে দেখা যায় না; সে-মুখ দেখলে জাগে বাসনা, তা সবার চেয়ে আকর্ষণীয়, সবচেয়ে প্রেমাকুল।

কোভিয়েল

উঠতির মাপে, সে মোটেই লম্বা নয়।

ক্লেয়ঁৎ

না, কিন্তু লাবণ্যময় সুছাঁদ তার।

কোভিয়েল

তার কথায় ও কাজে একটা হেলাফেলার ছাপ।

ক্লেয়ঁৎ

হবে; কিন্তু সেসবে একটা মাধুর্য রয়েছে, আর তার চলাফেরা লক্ষণীয়—জানিনা তার কি যাদু আছে হৃদয়ে পৌঁছবার।

কোভিয়েল

তার রসবোধ...

ক্লেয়ঁৎ

আঃ! কোভিয়েল, তার সূক্ষ্মতার কোমলতার অন্ত নেই।

কোভিয়েল

তার আলাপ...

ক্লেয়ঁৎ

তার আলাপ মনকাড়া।

কোভিয়েল

উনি সব সময়ে হাঁড়িমুখ...

ক্লেয়ঁৎ

তুমি কি চাও সর্বক্ষণ রঙ্গব্যঙ্গ, ফুর্তির খোলা হাট সর্বদা? যে সব মেয়েরা কথায় কথায় খিকখিক করে চলে তাদের চেয়ে বিশ্রী মেয়ে আর দেখেছ?

কোভিয়েল

দুনিয়ায় সবচেয়ে খামখেয়ালী উনি।

ক্লেয়ঁৎ

হ্যাঁ, সে খেয়ালী, আমি তাতে একমত, কিন্তু সুরূপাকে সব মানায়, সুন্দরীর সব খুঁত আমরা মেনে নিই।

কোভিয়েল

যা দেখছি, আপনি বোধ হয় জন্মজন্মান্ত ওঁর প্রেমাকাঙ্খী।

ক্লেয়ঁৎ

আমি মরণ আরো ভালোবাসি; যত ভালোবাসি তত তাকে ঘৃণা করতে যাচ্ছি।

কোভিয়েল

কেন, এতই যদি তাকে জানেন নিখুঁত?

ক্লেয়ৎ

তাতেই তো আমার প্রতিশোধ আরো ফুটে উঠবে. তাতেই বেশি দেখাতে পারব আমার সংকল্পের ধার—শ্রেষ্ঠ সুন্দরী সে. তাকে ঘৃণা করে, ত্যাগ ক'রে ; আমার কাছে সবচেয়ে সুন্দরী, সবচেয়ে অমায়িক সে। ওই তো সে আসছে।

দশম দৃশ্য

ক্লেয়ঁৎ, লুসিল, কোভিয়েল, নিকোল

নিকোল (কেভিয়েলকে)

আমি, আমার বদনামের শেষ নেই।

লুসিল

তা হতে পারে না নিকোল, আমি বলে রাখলাম। ব্যস।

ক্লেয়ঁৎ

আমি শুধু ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই না।

কোভিয়েল

আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করব আমি।

লুসিল

কী খবর ক্লেয়ঁৎ? কী বলতে চাও?

নিকোল

কোভিয়েল তোমার মনে কী?

লুসিল

তুমি এত বদমস্ত কেন?

নিকোল

কোন ভাবনায় নির্বাক তুমি?

লুসিল

তুমি কি বোবা, ক্লেয়ঁৎ?

নিকোল

কোভিয়েল, তুমি কথা হারিয়ে ফেলেছ?

ক্লেয়ৎ

একেবারে অনাথটি যেন!

কোভিয়েল

আহা, যেন স্বয়ং ধর্মপুত্র জুডাস!

লুসিল

বেশ দেখতে পাচ্ছি সাক্ষাতে বিলম্বটাই তোমার মনোভোজ ঘুলিয়ে দিয়েছে।

ক্লেয়ঁৎ (কোভিয়েলকে)

আহা! নিজের কাণ্ডকারখানা নিজে বেশ বুঝেছেন!

নিকোল

সকালে আমাদের অভ্যর্থনাটাই তোমাকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছে।

কোভিয়েল (ক্লেয়ঁৎকে)

ও ঘরে ফেলেছে কাঁটাটি কোথায় বিঁধছে।

লুসিল

ক্লেয়ঁৎ, এটাই কি তোমার বেজার হবার সঠিক কারণ নয়?

ক্লেয়ঁৎ

বিশ্বাসঘাতিনী, হ্যাঁ, ওটাই—বলতেই হবে যখন, আর বলে রাখছি, তেবো না তোমার জোচ্চুরি নিয়ে ওরকম জিতেই যাবে, আর আমি নিজেই ভেগে পড়ব—আমাকে তাড়িয়ে দেবার তোমার আর দরকার হবে না। অবশ্য তোমার ওপর যে টান আছে তা তুলে নিতে বেশ কষ্ট লাগবে; তাতে মন ভেঙে যাবে। কিছুদিন না হয় ভুগব; তবে তার তো শেষ আছে, আর তোমার কাছে ফিরে আসার দুর্বলতা দেখানর চেয়ে না হয় বরং হৃদয়ে দগ্ধ হব।

কোভিয়েল (নিকোলকে)

যেমন প্রভু তেমন ভৃত্য।

লুসিল

থাক, অনেক হয়েছে বিছে আওয়াজ। ক্লেয়ঁৎ, তোমাকে বলতে চাই কেন তোমার কাছে সকালে আসতে পারি নি।

ক্লেয়ঁৎ

কিছু শুনতে চাই না।

নিকোল (কোভিয়েলকে)

তোমাকে বলতে চাই কেন আমরা তরিঘরি চলেছিলাম।

কোভিয়েল

শুনতে চাই না সে-কথা...

লুসিল

শোন, আজ সকালে...

ক্লেয়ঁৎ

না, বলে দিচ্ছি।

নিকোল

জেনে রাখ যে...

কোভিয়েল

না, বিশ্বাসঘাতিনী!

লুসিল

শোনো।

ক্লেয়ঁৎ

কোনো সম্বন্ধ নেই।

নিকোল

আমাকে বলতে দাও।

কোভিয়েল

আমি কালা।

লুসিল

ক্লেয়ঁৎ !

ক্লেয়ঁৎ

না ।

নিকোল

কোভিয়েল !

কোভিয়েল

না, না ।

লুসিল

দাঁড়াও ।

ক্লেয়ঁৎ

রাগরাগিনী !

নিকোল

শোনো আমার কথা ।

কোভিয়েল

ধুত্তোর !

লুসিল

একটুক্ষণ ।

ক্লেয়ঁৎ

মোটেও না ।

নিকোল

একটু ধৈর্য ।

কোভিয়েল

ফ্যাঃ ।

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বস্তিকা

লুসিল

দু'টি কথা।

ক্লেয়ঁৎ

না, কথা আর নেই!

নিকোল

একটি কথা।

কোভিয়েল

আর লেনদেন খতম।

লুসিল

বেশ, তুমি যখন শুনতে চাও না আমার কথা, থাক তবে নিজের ভাবে, কর যা তোমার খুশি।

নিকোল

তুমি যখন ওরকম করছ তখন তুমি যা চাও তাই হোক।

ক্লেয়ঁৎ

শোনা যাক তবে অমন সরেস অভ্যর্থনার বিষয়টা।

লুসিল

বলতে আর আমার ইচ্ছা করছে না।

কোভিয়েল

গল্পটা একটু বলই না।

নিকোল

তোমাকে খোলসা করে বলতে আমার একটুও ইচ্ছে নেই।

ক্লেয়ঁৎ

বলো আমাকে...

লুসিল

না, কিছু বলতে চাই না আমি।

কোভিয়েল

শোনাও আমাকে...

নিকোল

না, কিছুই শোনাব না।

ক্লেয়ঁৎ

দয়া করে...

লুসিল

না, বলে দিচ্ছি।

কোভিয়েল (নিকোলকে)

মেহেরবানি ক'রে।

নিকোল

কোনো সম্বন্ধ নেই।

ক্লেয়ঁৎ

করজোরে অনুরোধ করছি।

লুসিল

যেতে দাও আমাকে।

কোভিয়েল

তোমার পায়ে পড়ি।

নিকোল

ওঠো ওখান থেকে।

ক্লেয়ঁৎ

লুসিল।

লুসিল

না।

কোভিয়েল

নিকোল !

নিকোল

একদম না।

ক্লেয়ঁৎ

ঈশ্বরের দোহাই !

লুসিল

আমি চাই না।

কোভিয়েল

কথা বলো।

নিকোল

ওতে নেই।

ক্লেয়ঁৎ

আমার সন্দেহ দূর কর।

লুসিল

করব না।

কোভিয়েল

আমার মন শান্ত করে দাও।

নিকোল

না, ইচ্ছে করছে না।

ক্লেয়ঁৎ

বেশ, তুমি যখন এত উদাসীন আমার দুঃখ দূর করতে আর সাফাই গেয়েছ আমার উৎসাহ দেখিয়েছে যে কঠিন কার্পণ্য তার পক্ষে, তখন, অকৃতজ্ঞ নারী, এই দেখে নাও আমাকে শেষ বারের মতো, তোমার কাছ থেকে দূরে গিয়ে দুঃখে ও প্রেমে প্রাণ বিসর্জন দেব।

কোভিয়েল (নিকোলকে)

আমি, আমিও ওর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করব।

লুসিল (ক্লেঁৎকে)

ক্লেঁৎ!

নিকোল

কোভিয়েল।

ক্লেঁৎ

কী।

কোভিয়েল

রাজী?

লুসিল

কোথায় যাচ্ছ?

ক্লেঁৎ

যেখানে বললাম।

কোভিয়েল

আমরা মরতে যাচ্ছি।

লুসিল

ক্লেঁৎ, তুমি মরতে যাচ্ছ?

ক্লেঁৎ

হ্যাঁ, নিঠুরাণী, তুমি যে তাই চাও।

লুসিল

আমি চাই যে তুমি মরো?

ক্লেঁৎ

হ্যাঁ, তুমি তাই চাও।

লুসিল

কে বলল ও-কথা ?

ক্লেয়ঁৎ

আমার সন্দেহ দূর করতে না চাওয়াই কি মৃত্যু চাওয়া নয় ?

লুসিল

এটা কি আমার দোষ ? তুমি যদি আমার কথা শুনতে তবে কি বলতাম না যে-ঘটনা নিয়ে তুমি নালিশ করছ তার কারণ আজ সকালে এক বুড়ি খুড়ির আবির্ভাব, যিনি জোর গলায় বলছিলেন যে ছোঁড়াদের সঙ্গই মেয়েদের নষ্টের মূল ? তিনি অনবরত ওই বিষয়ে জ্ঞান দিচ্ছিলেন এবং আমাদের সবাইকে মনে করেন এড়িয়ে চলবার মতো রাক্ষস ?

নিকোল

তাহ'লে এই হ'ল ঘটনার রহস্য ?

ক্লেয়ঁৎ

লুসিল, আমাকে ঠকাচ্ছ না তো ?

কোভিয়েল

বিশ্বাস করাতে অন্য কিছু বলার আছে ?

লুসিল

এর চেয়ে সত্য আর কিছু নেই।

নিকোল

ব্যাপার যা তা এই।

কোভিয়েল।

এতে রাজি হয়ে যাব ?

ক্লেয়ৎ

আঃ। লুসিল, তোমার মুখের একটি কথায় কি ক'রে যে জানো আমার অন্তরের এত জ্বালা শান্ত করে দিতে, আর কত সহজেই না ভালোবাসার জনের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে দেওয়া যায় !

কোভিয়েল

এই সব ভয়ংকর জীবদের দ্বারা কত সহজেই না নিজেদের ভদ্রতাতে দিই !

একাদশ দৃশ্য

বাদাম জুরদ্যাঁ, ক্লেয়ঁৎ, লুসিল, কোভিয়েল, নিকোল

বাদাম

তোমাকে দেখব বড় ইচ্ছা হচ্ছিল, ক্লেয়ঁৎ, আর এই অমনি তুমি এসে পড়লে। আমার কর্তা আসছেন, এই তোমার সুযোগ—লুসিলকে বিয়ে করবে বলে চেয়ে নাও।

ক্লেয়ঁৎ

আঃ ! কত যে মিষ্টি লাগছে কথাগুলি আর কত যে তারা উস্কে দিচ্ছে আমার বাসনা ! এর চেয়ে মধুর হুকুম আর কী হতে পারত, কোন অনুগ্রহ বেশি দামী ?

দ্বাদশ দৃশ্য

মঁ জুরদ্যাঁ, বাদাম জুরদ্যাঁ, ক্লেয়ঁৎ, লুসিল, কোভিয়েল, নিকোল

ক্লেয়ঁৎ

মহাশয়, বহুকাল থেকে যা ভেবেছি চাইব তার জন্য অন্যের ওকালতির সাহায্য না-ই বা নিলাম। এটা আমার এমন অন্তরঙ্গ ব্যাপার যে নিজেই দায়িত্ব নিচ্ছি, অতএব ভণিতা থাক, বলতে চাই যে আপনার পরিবারভুক্ত হওয়া এতই সম্মানজনক যে তা-ই আমার প্রার্থনা।

মঁ জুরদ্যাঁ

তা বাপু, হাঁ-না বলার আগে জানতে চাই—তুমি কি ভদ্রলোক ?

ক্লেয়ঁৎ

মহাশয়, অধিকাংশ লোকের ও নিয়ে মাথাব্যথা নেই। তারা কথাটা অক্লেশে বলে। ওই তিলক কাটতে বিবেকের দরকার হয় না আজ বরং ওর চাপরাশে চোর সাজা যায়, তবে আমার জন্য সত্যি বলছি, এ-বিষয়ে আমার মতামত একটু সূক্ষ্ম। আমার মতে সব রকম ভণ্ডামি সৎ লোকের কাছে অসহ্য ; ঈশ্বর আমাদের যেমন সৃষ্টি করেছেন তা অস্বীকার করা কাপুরুষতা, চুরি-করা পদবীতে সেজে লোক ঠকানো, আমরা যা নই তাই বলে দেখাতে যাওয়া। আমার পিতৃপুরুষরা গণ্যমান্য পদে কাজ করেছেন। আমার সৌভাগ্য

হয়েছিল ছ'বছর সেনাবাহিনীতে কাজের, ফলত জগতে বেশ উঁচু পদের কাজ পাবার যোগ্যতা লাভের তবে এসবের জন্যে পদবী নিতে চাই না, যদিও অন্যরা আমার জায়গায় তার জন্য লালায়িত হতে পারত। সোজাসুজি বলছি, আমি ভদ্দরলোক নই।

মঁ জুরদাঁ

বাপু হে, হাত মেলাও। আমার মেয়ে তোমার জন্য নয়।

ক্লেয়ঁৎ

মানে ?

মঁ জুরদাঁ

তুমি ধোপদুরস্ত ভদ্র নও, তুমি আমার মেয়ে পাবে না।

মাদাম

তোমার ভদ্রলোক নিয়ে ধুয়ে খাবে ? আমরা—অন্যরা সকলে—কি সেন্ট লুইয়ের বংশধর ?

মঁ জুরদাঁ

গিন্নী, চুপ করো, দেখছি পায়ে পায়ে তুমি এগিয়ে আসছ।

মাদাম

আমাদের দু'জনেরই কি ভদ্রঘরের বাইরে ছাড়া অন্যত্র জন্ম হয়েছিল ?

মঁ জুরদাঁ

কি কথার ছিরি !

মাদাম

আমার বাবার মতো তোমার বাবাও ব্যবসাদার ছিলেন না ?

মঁ জুরদাঁ

মাগীটা যেন ওলাউঠা ! ধকের কখনো কমতি নেই। তোমার বাবা দোকানদার ছিলেন, সেটা তাঁর দুর্ভাগ্য ; আমার বাবাকে যারা তা বলে তাঁরা ফন্দীবাজ। তোমাকে এই মোদ্দা কথাটা বলে রাখি, আমি ভদ্দরলোক জামাই চাই।

মাদাম

তোমার মেয়ের চাই উপযুক্ত বর, খোঁড়া ভিখিরি ভদ্রলোকের চেয়ে অর্থবান ও সমর্থ

একটি সৎ ছেলে তার জন্য বেশি কাম্য।

নিকোল

কথাটা ঠিক। আমাদের গাঁয়ে এক ভদ্রলোকের বেটা আছে, সেটা যেমন বদ তেমনি তেভঙ্গ গাড়ল—তেমন রতনটি আর কোথাও দেখিনি!

মঁ জুরদ্যাঁ

থাম, আস্পর্ধানী। তুই সব সময়ে কথার মধ্যে ফোঁড়ন দিস। মেয়ের জন্য অর্থ আমার অঢেল আছে, উপরন্তু যা চাই তা সম্মান,—তাই ওকে মার্কুইসনী বানাতে চাই।

মাদাম

মার্কুইসনী!

মঁ জুরদ্যাঁ

আলবৎ মার্কুইসনী।

মাদাম

সর্বনাশ। ঈশ্বর রক্ষা করুন!

মঁ জুরদ্যাঁ

ব্যাপারটা তাই ঠিক করে ফেলেছি।

মাদাম

ও বিষয়ে আমি একমত নই। ঘরণীর চেয়ে বড় ঘরের সঙ্গে সম্বন্ধ করাটা বিরক্তিকর ও অসুবিধাজনক। আমি চাই না জামাই আমার মেয়ের বাপ-মা'কে গালমন্দ করুক, চাই না তাদের ছেলেপুলেরা আমাকে দিদিমা বলতে লজ্জা পাক। এমন যদি হয় যে সে দাসদাসী নিয়ে সাড়ম্বরে এল এবং অহংকারের চোটে পাড়ার কাউকে অভিবাদন জানাল না, তখন তারাই বলতে ছাড়বে না, "দেখেছ, এই মার্কুইসনীর দেমাক? মঁসিয় জুরদ্যাঁর এই সেই মেয়েটি যে ছোটবেলায় কত হাসিখুশি ছিল দিদিমাকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে কেমন খেলা করত এমন তো নাক-উঁচু সে ছিল না; তার বাপ-ঠাকুর্দা সেন্ট-ইনোসাঁর গেটের তলায় বসে কাপড় বেচত। তারা ছেলেপুলেদের জন্য প্রচুর অর্থ রেখে গেছে, যার জন্য মনে হয় পরলোকে বেশ পস্তাচ্ছে। সাধারণত সৎপথে তো বড়লোক হওয়া যায় না।" আমি এসব কুকথা শুনতে চাই না, এবং এক কথায়, এমন ছেলে চাই যে মেয়ের সুবাদে আমাকে মান্য করবে, যাকে আমি বলতে পারব, "পাত পেড়ে বসো তো বাপু এখানে, পেট পুরে খেয়ে নাও আমার সঙ্গে।"

দঁ জুরদ্যাঁ

কৃপনত্বকেরই উপযুক্ত ভাব, চিরাগ কাল তলায় জীবন কাটাতে চাওয়া। আর উত্তর শুনতে চাই না সারা দুনিয়া বাধা দিলেও মেয়ে আমার মার্কুইসনী হবেই আর যদি আমাকে খুঁচিয়ে রাগাও তবে ওকে ডিউকনী বানিয়ে ছাড়ব।

নাদান

ক্লেয়ঁৎ, তবু সাহসে বুক বাঁধো। এস আমার সঙ্গে, মা আমার, বলবে এস তোমার বাবাকে বেশ স্পষ্ট গলায় যে একে না পেলে আর কাউকেই তুমি বিয়ে করবে না।

এয়োদশ দৃশ্য

ক্লেয়ঁৎ, কোভিয়েল

কোভিয়েল

গভীর আবেগ দিয়ে কাজটি চমৎকার করলেন।

ক্লেয়ঁৎ

কী বলছিস? ও-ব্যাপারে আমার একটা বিবেচনা আছে, অতীতের নজীর দিয়ে তাকে ভাঙা যাবে না।

কোভিয়েল

ও-রকম একটা লোকের সঙ্গে গম্ভীর হয়ে আপনি পরিহাস করলেন? দেখতে পাচ্ছেন না লোকটা উন্মাদ? লোকটার পাগলামির সঙ্গে মানিয়ে নিলে ক্ষতি কি আপনার?

ক্লেয়ঁৎ

ঠিক বলেছিস. তবে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে দঁ জুরদ্যাঁর জামাই হতে হলে কৌলীন্যের প্রমাণ দিতে হবে।

কোভিয়েল

হা:-হা:-হা:!

ক্লেয়ঁৎ

হাসছিস কেন?

কোভিয়েল

একটা খেলা মগজে এসেছে যা ওই লোকটিকে দিয়ে খেলাতে হবে, তাতে আপনার অভীষ্টও সিদ্ধ হবে।

ক্লেয়ঁৎ

সে কী?

কোভিয়েল

খেলাটা খুব মজাদার।

ক্লেয়ঁৎ

কী তা?

কোভিয়েল

অল্প কদিন আগে একটা অভিনয় দেখেছিলাম, সেটা ভদ্রলোকটির জন্য একটা ছলা-নাট্যে ঢুকিয়ে দিতে চাই। সমস্ত ব্যাপারটা লোকটাকে নিয়ে একটু তামাশার মতো দেখাবে, ওঁকে নিয়ে যা খুশি করা চলে, সূক্ষ্ম কিছুর দিকে নজর দেওয়ার দরকার নেই, লোকটি এমন যে চমৎকার নিজের ভূমিকা অভিনয় করে যাবে, যা মাথায় আসে খোশগল্প তা অনায়াসে তাকে বিশ্বাস করানো চলবে। আমি অভিনেতা পেয়েছি, বালমশলা ও যোগাড় করেছি, শুধু খেলাতে দিন আমাকে।

ক্লেয়ঁৎ

খুলে বলো তো।

কোভিয়েল

সবটাই বলছি। চলুন যাওয়া যাক, ওই যে এসে পড়ল।

চতুর্দশ দৃশ্য

মঁ জুরদ্যাঁ, ভৃত্য

মঁ জুরদ্যাঁ

কে ভূতটা ওখানে? আমার বিরুদ্ধে নালিশের জন্য 'বড়লোক' ছাড়া তাদের আর বলবার কিছু নেই, আমি ভদ্দরদের সঙ্গ পাওয়ার চেয়ে ভালো আর কিছু দেখি না তাঁরা সম্মান ও সৌজন্যের প্রতীক, কাউন্ট কিম্বা মার্কুইস হয়ে জন্মাবার জন্য হাতের দু'টি আঙুল হারাতেও আমি রাজি।

ভৃত্য

মহাশয়, এই যে কাউন্ট মশাই একজন মহিলার হাত ধ'রে ঢুকছেন।

ঐ দুরদাঁ

আরে! হেই ভগবান, একটা হুকুম দেওয়া তো চাই আবার! ওদের গিয়ে বলো, আমি এই এলাম বলে।

পঞ্চদশ দৃশ্য

দোরিনেন, দোরাঁৎ, ভৃত্য

ভৃত্য

মহাশয় বললেন, তিনি আসছেন।

দোরাঁৎ

তা বেশ ভালো।

দোরিনেন

দোরাঁৎ আমি জানি না যেখানে কাউকে চিনি না তেমন বাড়িতে আপনার কথায় এসে কেমন কেমন লাগছে।

দোরাঁৎ

মাদাম, তাহলে লোকের কানাঘুষা এড়িয়ে কেমন জায়গা আপনার পছন্দ যেখানে প্রেমিক আপনার মনোরঞ্জন করবে, আপনি যখন আপনার নিজের কিম্বা আমার বাড়িটি অপছন্দ করেন?

দোরিনেন

কিন্তু আপনার প্রেমের জলন্ত চিহ্ন গ্রহণ করতে আমি রোজ কত ব্যগ্র থাকি তার তো উল্লেখ করলেন না? প্রত্যাখ্যানের চেষ্টা বৃথা। আমার আপত্তি আপনি দুর্বল করে ফেলেন, আর আপনার যে রয়েছে বিনীত গোয়ার্তুমি তাতে আপনার মতে শেষ পর্যন্ত রাজী হতেই হয়। আনাগোনা দিয়ে শুরু, তারপর কথার ফুলঝুরি, তার থেকে অভিসার ও আমোদ-প্রমোদ, অবশেষে উপহার। এসবে আমি আপত্তি করেছিলাম, কিন্তু আপনি নিরুৎসাহ হন নি, ধাপে ধাপে আমার ইচ্ছার প্রভু হয়ে উঠেছেন। আমি আর কোনো উত্তর জানি না, আমার বিশ্বাস শেষে আপনি আমাকে বিয়েতেও রাজি করাবেন, তা থেকে আমি এখনো বহু দূরে।

দোরাঁৎ

মাদাম, ইতিমধ্যেই আপনার তাতে পৌঁছান উচিত ছিল। আপনি বিধবা এবং আত্মনির্ভরশীলা। আমার কর্তা আমি এবং আপনাকে নিজের চেয়েও ভালোবাসি। তা'হলে আজ থেকেই কেন আপনি আমার সুখ পূর্ণ না করবেন?

দোরিমেন

দোরাঁৎ, দু'পক্ষের অনেক গুণ থাকা চাই যাতে দু'জনে একত্রে সুখে থাকতে পারে দুনিয়ায় দু'জন বেশ ধাতস্থ লোককেই আপন মনমতো মিলনের জন্য কত না প্রয়াস করতে হয়।

দোরাঁৎ

মাদাম, এ-বিষয়ে নিজের সামনে কত বাধা ভেবে আপনি ভুল করছেন আপনার যে অভিজ্ঞতা তা অপরের বেলা কিছুই না।

দোরিমেন

ওই খানেই তো বার বার ফিরে আসি। দেখছি যা আপনি খরচ করেন আমার জন্য তাতে দু'টি কারণে আমার আশঙ্কা হয়—এক, তারা আমাকে ইচ্ছাতিরিক্ত বশ করে ফেলে. আর এক, আপনাকে দোষ দিচ্ছি না. এ-বদান্যতায় আপনিও নিশ্চয় বিব্রত হন. তাতেও আমার আপত্তি।

দোরাঁৎ

আঃ! মাদাম, ওসব তুচ্ছ, আর ওসব ছাড়া...

দোরিমেন

আমি কি বলছি আমি জানি ; অন্যান্য জিনিসের মধ্যে যে হীরে আমাকে নিতে বাধ্য করলেন তার দাম...

দোরাঁৎ

ওহো, মাদাম, যে-জিনিসকে আমার প্রেম আপনার অযোগ্য মনে করে তার দাম নিয়ে ভাববেন না. আর বেনে নিন...এই যে গৃহকর্তা স্বয়ং।

ষোড়শ দৃশ্য

মঁ জুরদাঁ, দোরিমেন, দোরাঁৎ, ভৃত্য

জুরদাঁ (দু'বার ঝুঁকে অভিবাদন করে দেখলেন দোরিমেনের অতি কাছে এসে পড়েছেন) মাদাম, আর একটু পেছিয়ে যান।

দোরিমেন

মানে ?

মঁ জুরদাঁ

দয়া করে এক পা।

দোরিমেন

বলছেন কী ?

মঁ জুরদাঁ

তৃতীয় সেলামের জন্য একটু পেছিয়ে যান।

দোরাঁৎ

মাদাম, মঁসিয় জুরদাঁ তাঁর আদব কায়দা জানেন।

মঁ জুরদাঁ

মাদাম, আপনার উপস্থিতিকে সম্মানিত করতে দেবার মহৎ ভাগ্য ও অনুগ্রহ দিয়ে আপনি আমাকে এমন সুযোগে অশেষ আনন্দ ও সম্মানের পাত্র করে তুলেছেন ; আমার যদি আপনার উপযুক্ত হবার সমান যোগ্যতা থাকত আর ঈশ্বর যদি...আমার সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে...দিত আমাকে...নিজেকে উপযুক্ত মনে করার সুযোগ...তার...

দোরাঁৎ

মঁ. জুরদাঁ, যথেষ্ট হয়েছে. মাদাম খোশামোদের বাড়াবাড়ি পছন্দ করেন না, তিনি জানেন আপনি ভাবুক মানুষ। (দোরিমেনকে নিচু গলায়) দেখতেই পারছেন এটা আকাট বুর্জোয়া, আকারে প্রকারে তাঁড় বিশেষ।

দোরিমেন (তেমনিভাবে)

তা বোঝা খুব কঠিন নয়।

দোরাঁৎ (সজোরে)

মাদাম, ইনি আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু।

মঁ জুরদাঁ

মাদাম, এই অনুগ্রহের যোগ্য হবার জন্য এখনো পর্যন্ত কিছুই করি নি আমি।

দোরাঁৎ (মঁ জুরদাঁকে নিম্নকণ্ঠে)

সাবধান, ভুলেও উল্লেখ করবেন না ওঁকে দিয়েছেন যে-হীরে তার কথা।

মঁ জুরদাঁ (দোরাঁৎকে চুপিচুপি)

একটু জিজ্ঞাসা করব কেমন লাগল ওটা?

দোরাঁৎ (মঁ জুরদাঁকে চুপিচুপি)

সে কি। স্রেফ চেপে যান। ওটা বোকামি হবে। চেষ্টাই পুরুষের মতো চলতে হলে এমন ভাব দেখাতে হবে যে আপনি যেন উপহারটি দেনই নি। (চড়া গলায়) মাদাম, মহাশয় জুরদাঁ বলছেন যে তাঁর বাড়িতে আপনাকে দেখে তিনি উল্লসিত।

দোরিমেন

উনি আমাকে সম্মান দিলেন প্রচুর।

মঁ জুরদাঁ (দোরাঁৎকে মৃদুস্বরে)

আমার হয়ে ওঁকে অমনভাবে বলার জন্য আপনার কাছে বড় কৃতজ্ঞ রইলাম মশাই।

দোরাঁৎ (মঁ জুরদাঁকে চুপিচুপি)

ওঁকে আনতে কি কম কাঠখর পোড়াতে হয়েছে?

মঁ জুরদাঁ (দোরাঁৎকে নিচু গলায়)

জানিনা সেজন্য কী বলে ধন্যবাদ দেব।

দোরাঁৎ

মাদাম, উনি বলছেন ওঁর চোখে আপনি বিশ্বের সেরা রূপসী।

দোরিমেন

উনি আমার পায়া ভারী করে দিচ্ছেন।

মঁ হুরদাঁ

নাদান আপনিই বলছেন যত সুভাষিত...

দোরাঁৎ

আসুন, খানাপিনার ব্যাপারে মন দেওয়া যাক।

ভৃত্য (মঁ হুরদাঁর প্রতি)

প্রভু, সব তৈরী।

দোরাঁৎ

তা'হলে টেবিলে গিয়ে বসা যাক, গায়করাও আসুক।

(ছ'জন পাচক, যারা মোচ্ছব বানিয়েছিল, নাচতে লাগল—এইটে দিয়ে তৃতীয় অঙ্কবিরতি : তা থামলে আনা হল চর্বচুষ্যে ভরা টেবিল)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সোরাঁৎ, সোরিনেন, মঁ জুরদাঁ, দু'জন গায়ক, একজন গায়িকা, ভৃত্য

সোরিনেন

সোরাঁৎ, এ যে দেখছি দারুণ ভোজ!

মঁ জুরদাঁ

বাদান, আপনি ঠাট্টা করছেন, আমার বাসনা ছিল আপনাকে নিবেদনের যোগ্য হয় এটা। (সকলের টেবিলে উপবেশন)

সোরাঁৎ

বাদান, মঁ জুরদাঁ ঠিক বলেছেন ওকথা, ওঁর বাড়িতে আপনাকে এমন সম্মান দেখিয়ে আমাকে কৃতার্থ করলেন। ওঁর সঙ্গে আমি একমত যে এ-ভূরিভোজ আপনার উপযুক্ত নয়। তবে যেহেতু আমিই এর উদ্যোক্তা আর যেহেতু অন্যান্য বন্ধুদের মতো এ-বিষয়ে আমি ধুরন্ধর নই, তাই এখানে সুপেয়র সঙ্গে সুস্বাদের বর্বর অমিলমিশ দেখা যাবে। যদি এর মধ্যে দাবিশের হাত পড়ত তবে সবই সুশৃঙ্খল হত; পারিপাট্য ও পরিমার্জনার ছাপ পড়ত সর্বত্র, সব আহার্য ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখাত এবং আপনাকে স্বীকার করিয়ে ছাড়ত উত্তম ভোজনের বিজ্ঞানে তার কি দখল, সে শোনাত উনুনে সেঁকা রুটির গল্প—যার উপরটা ভাজাতে সোনালী হয়ে ওঠে, চারদিকে ফেঁপে ওঠা তার কুড়নুড়ে ছালটা মুখে দিলে গুঁড়িয়ে যায়, যে সুরার স্বাদ রেশমের মতো, যার তেজ চাগিয়ে দেয় কিন্তু বিকল ক'রে ফেলে না; বুকের একতাল মাটন শাক দিয়ে ঠাসা; নদীতটের সরস জমিতে পুষ্ট বাছুরের পায়ের দিকের এক চাঁই মাংস—এই লম্বাটে ধবধবে নরম বাদান-ক্ষীরকাঠি দাঁতে কাটার জন্য; অবাক-করা নির্যাসে তারানো তিতির, তারপর যেন প্রমোদ ও প্রহসন হিসাবে জেলি-ব্রথ দিয়ে সুপ, তার সঙ্গে ঠেকা দিতে নাদুস-নুদুস টাকি, আশেপাশে পায়রার মাংস, তার উপর সাদা নিষ্টি-বেশানো পেঁয়াজ। আমি, আমার অজ্ঞতা স্বীকার করছি; আর শেষে, মঁ জুরদাঁ লাগসই বলেছেন, সত্যিই ভোজটা যদি আপনার গ্রহণযোগ্য হ'তো।

সোরিনেন

খেয়ে দেখানো ছাড়া এর আর কোনো উত্তর নেই।

মঁ জুরদাঁ

আঃ, কি সুন্দর হাত দু'খানি।

দোরিমেন

মঁ জুরদাঁ, হাত দু'টি সাধারণ ; তবে যদি হীরের কথা তোলেন, এটি অপূর্ব।

মঁ জুরদাঁ

নাদাম, আমি তুলব। ভগবান রক্ষা করুন ও-বিষয়ে কথা থেকে : ওটা উদ্যোগী পুরুষের কাজ হবে না, আর হীরে তো সামান্য জিনিস।

দোরিমেন

আপনি বড়োই ভালোমানুষ।

মঁ জুরদাঁ

আপনার সময় হওয়া কত...

দোরাঁৎ

আসুন এদিকে, আরও কিছু মাংস দেওয়া যাক মঁ জুরদাঁ আর ওই ভদ্রলোকদের পাতে, যাঁরা আমাদের খুশির গান শোনাবেন।

দোরিমেন

আপনি জবরদস্ত মন্ত্র দিলেন সরেস পানের সঙ্গে গান জুড়ে দিয়ে, আমি যার-পর-নাই খুশি

মঁ জুরদাঁ

নাদাম, এ সামান্য...

দোরাঁৎ

মঁ, জুরদাঁ, ওঁদের জন্য চুপ করা যাক ; আমরা যা-কিছু বলতে পারতাম তার চেয়ে ভালো ওঁরা বলবেন।

(গায়ক এবং গায়িকা হাতে তুলে নিল সুরাপাত্র, গাইল দু'টি পানরসের গান, নানা যন্ত্রের সঙ্গত তার সঙ্গে)

প্রথম গান

ফিলিস, প্রেমের পরশে সবাকারে দাও
উদার ধরিয়া সুরার পাত্র
তোমার সজ-মাধুরী লভিয়া
হাসিয়া উজল পেয়ালা-গাত্র।

তোমাদের তরে হৃদয় আকুল
তুমি আর সুধা বাড়ায়েছ হাত,
আমরা মিলেছি অটুট বাঁধনে
ব'য়ে আসে দিন ব'য়ে যায় রাত।

ও-অধর চুমি' মদিরা রঙিন,
ও-রসে মজিয়া অধর সিন্ধু
দোলা দেয় দু'য়ে হিয়া ভরি' মোর
চির কাল সাথি চলার বন্ধু।

ইসারায় ডাকে কি লোভে ভুলায়
সে কি মায়া টানে অসীমের সাথ,
আমরা মিলেছি অটুট বাঁধনে
ব'য়ে আসে দিন ব'য়ে যায় রাত।

দ্বিতীয় গান

ধায় যে সময় ডানায় উড়ে
তাই কণ্ঠে ঢালি ঘুরে ঘুরে ;
জীবনটারে লুটেপুটে
খেয়ে নাও গো চেটেপুটে
কালানদীর কাল পেরুলে
সব যে যাব বেবাক ভুলে
যত আসব যত না প্রেম
এস এস পানের সুরে
এমন কাল কি আসে ফিরে!

বোকার দলে তর্ক তোলে
ওরে কী বাঁচে মানুষ ম'লে,
সার কথাটি জানি মোরা
আছে যে ওই পাত্রে পোরা
নয়ত রতন নয়ত সুনাম
নয়ত পঠন অঢেল ইনাম
দেয় না মুছে দুখের দহন
পান করিয়া পরাণ ভ'রে
জানো অপার দুঃখ হরে।

আরো আরো ঢালো সুরা বহাও সুরানদী
তোমার পিয়াস মিটাবে তিয়াস আশা রাখো যদি।

দোরিবেন

মনে তো হয় না এর চেয়ে ভালো গাওয়া যায়, এ একেবারে মারাত্মক সুন্দর।

মঁ জুরদাঁ

মাদাম, এখানে আমি আরো সুন্দর কিছু দেখছি।

দোরিবেন

ওহো! মঁ জুরদাঁ এত উৎসাহী আমি ভাবতেই পারি নি।

দোরাঁৎ

বটে! মাদাম, মঁ জুরদাঁকে আপনি কী ঠাউরেছেন?

মঁ জুরদাঁ

নিজেকে যা ভাবি তাই যদি তিনিও ভাবতে পারতেন।

দোরিবেন

আবার!

দোরাঁৎ

আপনি ওঁকে চেনেন না।

মঁ জুরদাঁ

উনি চিনবেন যখন ওঁর খুশি।

দোরিবেন

আঃ! যথেষ্ট হয়েছে।

দোরাঁৎ

উনি এমন লোক যার মুখে পাল্টাই লেগেই আছে। কিন্তু, মাদাম, আপনি নজর করেন নি যে যা-কিছু আপনি ছুঁয়েছেন সে-সবই উনি খাচ্ছেন।

দোরিবেন

মঁ জুরদাঁকে দেখে মুগ্ধ হলাম।

মঁ জুরদাঁ

আপনার হৃদয় জয় করতে পারলে আমি...

দ্বিতীয় দৃশ্য

বাদাম জুরদাঁ, দোরিমেন, দোরাঁৎ, গায়কবৃন্দ, গায়িকা, ভৃত্য

বাদাম

তোবা ! তোবা ! দেখতে পাচ্ছি নন্দীভৃঙ্গীর দলটি বেড়ে জমাটি, এও বেশ দেখছি যে আমার হাজির হওয়াটা হিসাবের বাইরে। কর্তামশাই, এখানে এমন মজাদার ব্যাপারের জন্যই কি তুমি আমাকে অত তাড়াহুড়োয় বোনের বাড়ি নৈশভোজে পাঠিয়েছিলে ? ওখানে নিচে দেখলাম নাটক চলছে, উপরে এখানে দেখি বিয়ের ঢালাও উৎসব। এমনি ভাবেই বেহিসেবী খরচ কর তুমি, আর এ-ভাবেই আমার অনুপস্থিতিতে উটকো মহিলাদের আপ্যায়ন কেরো, আমাকে বেড়াতে পাঠিয়ে দিয়ে তাদের জন্য গান এবং রাসমঞ্চের ব্যবস্থাও করো।

দোরাঁৎ

কী বলতে চান আপনি, বাদাম জুরদাঁ ? কোন উদ্ভট কল্পনা আপনার মাথায় ঢোকান যে আপনার কর্তাটি তাঁর অর্থ নয়ছয় করছেন আর শ্রীমতীর জন্য বসিয়েছেন রোশনচৌকি ? দয়া করে জেনে রাখুন, এর দায়িক আমিই ; উনি শুধু ওঁর এই বাড়িখানা ধার দিয়েছেন, আপনিও আপনার কথানুরূপ না দেখে জিনিস সব আর একটু সুনজরে দেখলে ভালো।

মঁ জুরদাঁ

হ্যাঁ গো রাগিনী, এই কাউন্ট মশাইটিই ওই তদ্রার জন্য এসব আয়োজন করেছেন— উনি গুণী মহিলা। এঁকে বাড়িটা ব্যবহারের জন্য ধার দেওয়ায় আমি গর্বিত এবং তাঁর সাহচর্যেও।

বাদাম

ওসব সেই ছেঁদো কথা, যা জানার তা আমি জানি।

দোরাঁৎ

বাদাম জুরদাঁ, নিন, নিন, ভালো চশমায় দেখুন।

বাদাম

মশায়, চশমায় আমার প্রয়োজন নেই, আমি দেখি বেশ স্পষ্ট, অনেক আগেই ব্যাপারটা এঁচে নিয়েছি, আমি কিছু লম্বকর্ণ নই। ডাকসাইটে লোক আপনি, আমার কর্তার বুদ্ধুনিতে

উস্কানি দেওয়া আপনার অন্যায় হয়েছে। আর মহাশয়া সম্ভ্রান্ত মহিলা হয়ে আমাদের পরিবারে বিচ্ছেদের বীজ পুঁততে যাওয়া এবং আমার স্বামীকে আপনার প্রেমে প্রলুব্ধ করা আপনার সততা এবং যোগ্যতার পরিচায়ক নয়।

দোরিমেন

এ সবের অর্থ কী? দোরাঁৎ, যান, এই পাগলিনীর বিকট কল্পনার সামনে আমাকে এনে অন্যায় করেছেন আপনি।

(প্রস্থান)

দোরাঁৎ

মাদাম, এই যে! কোথায় চললেন!

মঁ জুরদাঁ

মাদাম! কাউন্ট মশাই, ওঁকে ছলছুতো দেখান, ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করুন। (মাদাম জুরদাঁর প্রতি) উঃ! ডাকিনী তুমি! এই তো তোমার কীর্তি; সবার সামনে আমার ইজ্জত খোয়ালে, আমার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে গুণী লোকেদের।

মাদাম

সে-গুণের নিকুচি করি।

মঁ জুরদাঁ

রাক্ষুসী বুড়ি, জানি না তোমার ভেস্তে-দেওয়া এই ভোজনোৎসবের উচ্ছিষ্ট দিয়ে তোমার মুণ্ডু ফাটাতে পারছি না কেন।

(ভৃত্যরা টেবিল সরিয়ে ফেলল)

মাদাম (যেতে যেতে)

এসব আমি ঘেন্না করি। আমার অধিকার শুধু রক্ষা করলাম, আর এতে সব স্ত্রীরাই আমার দলে।

মঁ জুরদাঁ

আমার রাগের সামনে থেকে চলে গিয়ে ভালোই করলে। উনি এসে সব ভণ্ডুল করলেন। ভালো ভালো কথা বলতে যাচ্ছিলাম, এত অনুপ্রাণিত আগে কখনো বোধ করি নি! কী ওটা?

তৃতীয় দৃশ্য

ছদ্মবেশে কোভিয়েল, মঁ জুরদাঁ, ভৃত্য

কোভিয়েল

মশাই, জানিনা আপনার পরিচিত ব'লে গর্ব বোধ করতে দেবেন কিনা।

মঁ জুরদাঁ

না, মশাই।

কোভিয়েল

আপনি যখন এতটুকু ছিলেন তখনই আপনাকে দেখেছি।

মঁ জুরদাঁ

আমাকে ?

কোভিয়েল

বিশ্বের সেরা শিশুরত্ন ছিলেন আপনি, মেয়েরা সবাই আদরের জন্য কাড়াকাড়ি ক'রে আপনাকে কোলে নিত।

মঁ জুরদাঁ

আমাকে আদরের জন্য ?

কোভিয়েল

তাই। আপনার পিতার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম আমি!

মঁ জুরদাঁ

পিতার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ?

কোভিয়েল

হ্যাঁ, তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ ভদ্রলোক।

মঁ জুরদাঁ

বলছেন কী ?

কোভিয়েল

বলছি যে তিনি ছিলেন খাঁটি ভদ্রলোক।

মঁ জুরদাঁ

আমার বাবা ?

কোভিয়েল

হ্যাঁ।

মঁ জুরদাঁ

আপনি তাঁকে বেশ চিনতেন ?

কোভিয়েল

অবশ্য।

মঁ জুরদাঁ

আপনি তাঁকে ভদ্রলোক ব'লে জানতেন ?

কোভিয়েল

নিঃসন্দেহে।

মঁ জুরদাঁ

জানিনা জগৎটা কী দিয়ে গড়া।

কোভিয়েল

মানে ?

মঁ জুরদাঁ

কিছু মূর্খ লোক আছে যারা বলে তিনি ছিলেন বেনে।

কোভিয়েল

তিনি বেনে। নির্জলা রটনা। তিনি আদৌ তা ছিলেন না। তিনি যা করতেন —যেহেতু তিনি হৃদয়বান এবং দয়ালু—আর তিনি বুঝতেন জিনিসের কদর—তা সব জায়গা থেকে পণ্য সংগ্রহ করে আনা নিজের বাড়িতে এবং মুদ্রার বিনিময়ে সব বন্ধুদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া।

মঁ জুরদাঁ

আপনার সঙ্গে পরিচয়ে মুগ্ধ হলাম, আর যখন এমন সাক্ষী দিলেন যে আমার পিতা ভদ্রলোক।

কোভিয়েল

তামাম দুনিয়ার মুখের ওপর তা বলব।

মঁ জুরদাঁ

আপনার অনুগ্রহ। কিন্তু এখানে আসার উদ্দেশ্যটা জানতে পারি?

কোভিয়েল

আগেই তো বলেছি, আপনার পিতাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতাম সৎ ভদ্রলোক ব'লে, তারপর ঘুরলাম সারা পৃথিবী।

মঁ জুরদাঁ

সারা পৃথিবী?

কোভিয়েল

তাই।

মঁ জুরদাঁ

পৃথিবী দেশটা তো অনেক বড়ো!

কোভিয়েল

তা ঠিক। অবশেষে দীর্ঘ পর্যটন সেরে সবে চার দিন হ'ল এসেছি; আর যেমন আপনার সংক্রান্ত সব ব্যাপারে আমি উৎসুক তাই সবচেয়ে সুসংবাদ আপনাকে দিতে এসেছি।

মঁ জুরদাঁ

কী সেটা?

কোভিয়েল

আপনি জানেন মহান তুর্কীর পুত্র এখানে?

মঁ জুরদাঁ

আমি? না।

কোভিয়েল

সে কি! তাঁর দলবলের কি বাহার সবাই তা দেখতে যায়, এদেশে তিনি স্বাগত হয়েছেন পদস্থ প্রভু বলে।

মঁ জুরদাঁ

আহা, তা তো জানতাম না।

কোভিয়েল

আপনার স্বার্থের যা অনুকূল তা হল তিনি আপনার মেয়ের প্রেমে পড়েছেন।

মঁ জুরদাঁ

মহামহিম তুর্কীর পুত্র?

কোভিয়েল

হাঁ, তিনি আপনার সগোত্র হ'তে চান।

মঁ জুরদাঁ

আমার গোত্র, সেই মহাতুর্কীর পুত্র?

কোভিয়েল

মহিমান্বিত তুর্কীর পুত্র আপনার গোত্র। দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম—তিনি আমার সঙ্গে আলাপ করছিলেন—তাঁর কথা তো স্পষ্ট বুঝতে পারি কি না; নানা বিষয় আলোচনার পর তিনি বললেন; 'আছিয়াব ক্রোক্ সোলে উশ্ আল্লা মুস্তাক্ জিদেলুন্ আমানাহেম বারা-হিনি উস্যোরে কার্বুলাৎ।' অর্থাৎ 'প্যারিসের ভদ্রজন মঁ জুরদাঁর তরুণী সুন্দরী মেয়েকে আপনি দেখেন নি?'

মঁ জুরদাঁ

তুর্কীরাজ আমার সম্বন্ধে ওকথা বললেন?

কোভিয়েল

হাঁ। আর যেই বলেছি আপনাকে আমি বিলক্ষণ চিনি এবং আপনার মেয়েকেও দেখেছি, অমনি তিনি বললেন, —'মারাবাবা সাহেম' আঃ। যার অর্থ, 'আঃ, তার প্রেমে কি বিভোর আমি।'

মঁ জুরদাঁ

'মারাবাবা সাহেম' অর্থ 'তার প্রেমে কি বিভোর আমি?'

কোভিয়েল

তাই।

মঁ জুরদাঁ

দেখুন, ওকথা আমাকে বলে খুব উপকার করলেন আর দেখুন, না হলে তো জানতামই না 'মারাবাবা সাহেব' মানে কী? আঃ! কতো তার প্রেমে বিভোর আমি। ওই তুর্কীর মতোই এ-ভাষা কি অপূর্ব!

কোভিয়েল

আশাতিরিক্ত ভালো। জানেন, 'কাকারাকামুচেন' মানে কী?

মঁ জুরদাঁ

'কাকারাকামুচেন'? না।

কোভিয়েল

তার অর্থ: আমার প্রিয় আত্মা।

মঁ জুরদাঁ

'কাকারাকামুচেন' মানে আমার প্রিয় আত্মা?

কোভিয়েল

ঠিক।

মঁ জুরদাঁ

আজব জিনিস তো! 'কাকারাকামুচেন', আমার প্রিয় আত্মা কেউ কি আগে বলেছে ওকথা? তাতেই তো অবাক হয়ে যাচ্ছি।

কোভিয়েল

আমার দৌত্যগিরির ফলে তিনি আসছেন আপনার কন্যার পাণিপ্রার্থী হ'য়ে; শ্বশুরকে নিজের পদমর্যাদার সমানে তুলতে তিনি আপনাকে 'মামামুশি' বানাতে চান, ওদেশে তা একটা ভারি পদবী।

মঁ জুরদাঁ

'মামামুশি'?

কোভিয়েল

হ্যাঁ, 'মানানুশি' আমাদের ভাষায় তার অর্থ জমিদার। জমিদার, তারা হল সেকালের...জমিদার তো বটে! সারা দুনিয়ায় তার জুড়ি আর নেই বিশ্বের মহা মহা রথীদের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে চলবেন আপনি।

মঁ জুরদাঁ

মহিমান্বিত তুর্কীর ছেলে আমাকে প্রভূত সম্মান দেখালেন, দয়া করে আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলুন ধন্যবাদ জানাতে।

কোভিয়েল

সে কি! ওই যে, তিনিই তো আসছেন এখানে।

মঁ জুরদাঁ

তিনি এখানে আসছেন?

কোভিয়েল

হ্যাঁ, আপনার মাহাত্ম্য-ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য সব উপচার নিয়ে আসছেন।

মঁ জুরদাঁ

তিনি দেখছি বেজায় উদ্যোগী।

কোভিয়েল

তাঁর প্রেমকে কিছুই ঠেকিয়ে রাখতে পারে না।

মঁ জুরদাঁ

একমাত্র যাতে আমার আটকাচ্ছে—তা হ'ল আমার মেয়ে জেদী, তার মাথায় ঢুকেছে ক্লেয়ঁৎ বলে এক ছোকরা, তাকে ছাড়া আর কাউকে সে বিয়ে করবে না।

কোভিয়েল

মহাতুর্কীর কুমারকে দেখলে তার মত বদলাবে; আর তারও ভাগ্যে দেখছি বেশ একটা কৌতুককর ঘটনা—তা মহাতুর্কীর ছেলের সঙ্গে এই ক্লেয়ঁতের মিল, নানা ভাবে। তাই দেখতে এলাম, আমাকে তা দেখান হ'ল, তার যে প্রেম একের জন্যে তা অনায়াসে অপরের ভাগ্যে যেতে পারে, ওই তার পায়ের শব্দ, এই যে হাজির।

চতুর্থ দৃশ্য

তুর্কীর বেশে ক্লেঁৎ (চারজন ভৃত্য তার জোব্বা ধরে চলেছে), মঁ জুরদাঁ, ছদ্মবেশে কোভিয়েল

ক্লেঁৎ

অন্‌বুসাহিন্‌ ওকি বোরাফ্‌, জুর্‌দিনা, গালাবালেকি।

কোভিয়েল

তার মানে 'মঁসিয় জুরদাঁ, সারা বছর ধ'রে আপনার হৃদয় গোলাপের মতো ফুটে থাকুক,' ওদেশে সম্বাদরে বলার প্রথা ওই রকম।

মঁ জুরদাঁ

মহাবান্য তুর্কীর দীন সেবক আমি।

কোভিয়েল

কারিগার কান্‌বোতো উস্তিন্‌ মোরাফ্‌।

ক্লেঁৎ

উস্তিন্‌ ইয়ক্‌ কাতানালেকি বাসম্‌ বাহ্‌ আল্লা মোরান্‌।

কোভিয়েল

উনি বলছেন যে ঈশ্বর আপনাকে সিংহের বিক্রম ও সাপের চতুরতা যেন দেন।

মঁ জুরদাঁ

মহামহিম আমাকে শ্রেষ্ঠ সম্মান দিলেন, আমিও তাঁর অশেষ শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছি।

কোভিয়েল

ওস্‌সা বিনামেন্‌ সাদোক্‌ বাবাল্লি ওরাকাফ্‌ উরাম্‌।

ক্লেঁৎ

বেল্‌-মেন্‌।

কোভিয়েল

উনি বললেন যে ওঁর সঙ্গে আপনিও তাড়াতাড়ি করুন উৎসব-আয়োজন, যাতে তখনই দেখা এবং সাদি হয় আপনার মেয়ের সঙ্গে।

মঁ জুরদাঁ

দু'টি কথায় এতটা বিষয় ?

কোভিয়েল

আজ্ঞে ; তুর্কী ভাষাই ওরকম, কম কথায় অনেক কিছু ওতে বলা যায়। চলুন, যেখানে উনি যেতে বলছেন।

পঞ্চম দৃশ্য

দোরাঁৎ, কোভিয়েল

কোভিয়েল

হা: হা: হা: ! কি বিতিকিচ্ছি ব্যাপার ! রান ঠকানো। পাঠ মুখস্ত থাকলেও এত চমৎকার অভিনয় সে করতে পারত না। হা: হা: ! মশাই আপনাকে অনুরোধ করছি চলন্ত একটা ব্যাপারে একটু হাত লাগাতে।

দোরাঁৎ

সাবাস, সাবাস ! কোভিয়েল, কে তোমাকে চিনবে ? যা বানিয়েছে।

কোভিয়েল

দেখলেন তো। আহা: ! ওহো: !

দোরাঁৎ

হাসছ কেন ?

কোভিয়েল

একটা জিনিস যার ফলে ওটা ন্যায্য।

দোরাঁৎ

কী রকম ?

কোভিয়েল

কেমন, ভেবে বের করুন দেখি কোন কৌশলে মঁ জুরদাঁর মত হবে তাঁর কন্যাকে আমার প্রভুর হাতে দিতে।

দোরাঁৎ

ষড়যন্ত্র তো কিছুই বুঝছি না, তবে টের পাচ্ছি এতে যখন তোমার হাত আছে তখন তা সফল হবেই।

কোভিয়েল

আমি জানি আপনি আমার নাড়িনক্ষত্র চেনেন।

দোরাঁৎ

বল তো ব্যাপারটা কী?

কোভিয়েল

কষ্ট ক'রে একটু দূরে সরে দাঁড়ান—যাতে আমি কল্পিত ঘটনা ঘটাতে পারি। আপনি দেখতে পাবেন কাহিনীর এক টুকরো, বাকিটা আপনাকে পরে বলব।

(পাতি ভদ্রলোককে কৌলীন্যে তোলার নাচগানসহ প্রক্রিয়া দিয়ে চতুর্থ অন্তর্বিরতি)

মুফতি, চারজন দরবেশ, ছ'জন নৃত্যপর তুর্কী, ছ'জন গায়ক তুর্কী এবং আরো অন্যান্য নানান তুর্কী যন্ত্রের বাদকরা এই ব্রতের নায়ক।
মুফতি বারো জন তুর্কী এবং চার জন দরবেশকে নিয়ে মহম্মদকে ডাকল; পরে নিয়ে আসা হ'ল তুর্কী পোশাকে পাগড়িবিহীন ও তরোয়ালহীন বুর্জোয়াকে, সঙ্গে সঙ্গে গান শুরু—

মুফতি

সনখাও যদি
তবে বাত্ আওড়াও,
না সনখাও যদি
তবে চোপ রও চোপ রও।

আমি মুফতি,
তুমি কোন্ হে?
আমি জানি না রে,
চোপ রও চোপ রও।

সেই ভাষাতেই মুফতি সহকারী তুর্কীদের জিজ্ঞাসা করল বুর্জোয়ার কী ধর্ম, তারা আশ্বাস দিল সে মুসলমান। মুফতি এক গ্রাম্য ফরাসী ভাষায় মুহম্মদকে আহ্বান করল, তারপর ধরল এই গান

নুফতি

ছুরদিনার জন্য মহম্মদের কাছে
সকাল সাঁঝে আমার আরজি—
ছুরদিনাকে পলাদিন বনাও।
ওকে দাও পাগড়ি, হাতিয়ার দাও,
দাও নোকর বরকন্দাজ তমাম,
পলেস্তিন বচানে ও রাজি
আর মহম্মদ...

নুফতি তুর্কীদের জিজ্ঞাসা করল যে ভদ্দরলোকটি মহম্মদের ধর্মে অটল থাকবে কি না এবং ধরল গান—

নুফতি

ছুরদিনা দিলদার তুর্কী হো ?

তুর্কীরা

তাই তো, ঠিক তো।

(নুফতি নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে)
হা না বা, বা লা ত, বা লা বা, বা লা দা।

(তুর্কীরা উত্তরে একই ধুয়া ধরল।
নুফতি ভদ্দরকে পাগড়ি দিতে চাইল এবং এই গান ধরল)

নুফতি

তুমি শয়তান হবে না তো ?

তুর্কীরা

নুফতি

তুমি চোট্টা হবে না তো ?

তুর্কীরা

না, না, না, গো।

মুফতি

দাও ওকে পাগড়ি, পাগড়ি দাও উদকো।

(ভদ্দরলোকটিকে পাগড়ি দিতে দিতে যেমন বলেছিল মুফতি সেসব কথার পুনরুক্তি করল তুর্কীরা। মুফতি ও দরবেশরা সমারোহে পাগড়ি নিয়ে ঘিরে দাঁড়াল, মুফতির হাতে দেওয়া হল অস্ত্র কোরাণ, সে সমবেত সহকারী তুর্কীদের সঙ্গে আবার আহ্বান জানাল ; তার উদ্বোধনের পরে ভদ্দরটিকে উপহার দিল তরবারি এবং গলা ধরল)

মুফতি

বহৎ হবে তুমি
চোট্টা হবে না
নচ্ছার হবে না কভি ?

(তুর্কীরা এই কথা আবৃত্তি করল—হাতে তাদের তরোয়াল, তাদের ছ'জন বুর্জোয়াকে ঘিরে নাচল, তাদের ভঙ্গি যেন তরোয়াল দিয়ে বার বার মারতে উদ্যত।
মুফতি তুর্কীদের বুর্জোয়াকে দু'চার ঘা লাগাতে হুকুম দিল আর শুরু করল গান।)

মুফতি

বাহবা বাহবা বাহবা
বেশ কষে' দু'ঘা লাগা।

(তুর্কীরা গানের একই কলি গেয়ে গেয়ে তালে তালে কয়েক ঘা কষিয়ে দিল।
মুফতি সেই প্রহার দেবার পরে বলল গানের সুরে।)

মুফতি

কিছু মনে ক'রো না,
আর এক দফে এই শেষ চাঁটি খাও না !

(তুর্কীরা আবার গাইল এটি।
মুফতি ফেল দিল আজান, তারপর অনুষ্ঠান শেষে তুর্কী বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে নাচগানরত সকল তুর্কীদের নিয়ে মঞ্চ ত্যাগ করল।)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বাদাম জুরদ্যাঁ, মঁ জুরদ্যাঁ

বাদাম

দয়া কর আমাদের! বাঁচাও আমাদের! এ কী দেখছি এখানে? কি চেহারা! কী! জুয়ার আড্ডায় যাবার পোশাকে, আর এই কি মুখোশ পরবার সময়? মুখ খোলো। এর মানে কী? কে তোমাকে এই ভূতের বেশ পরিয়েছে?

মঁ জুরদ্যাঁ

দেখ দুলালী লক্ষ্মীছাড়িকে, কী ভাষায় একজন মামুশির সঙ্গে কথা হচ্ছে।

বাদাম

সেটা আবার কী?

মঁ জুরদ্যাঁ

হ্যাঁ, কুর্নিশ করে চলবে—এখন 'মামুশি' হয়েছি আমি।

বাদাম

তোমার মামুশি বস্তুটা কী?

মঁ জুরদ্যাঁ

মামুশি, বলছি তবে। আমি একজন মামুশি।

বাদাম

কি রকম জানোয়ার সেটা?

মঁ জুরদ্যাঁ

আমাদের ভাষায় মামুশি হল রাজাগজা।

বাদাম

নটরাজ? তোমার কি নাচের বয়েস এখনো বসে আছে।

মঁ জুরদ্যাঁ

কি গণ্ডমূর্খ। বলছি রাজাউজির। একটা দারুণ পদবী, এইমাত্র আনুষ্ঠানিক লাভ হল।

মাদাম

কী অনুষ্ঠান?

মঁ জুরদ্যাঁ

মহম্মদ পর জুরদিনা।

মাদাম

সেটা আবার কী?

মঁ জুরদ্যাঁ

জুরদ্যাঁ হল কি না জুরদিনা।

মাদাম

আহা, জুরদ্যাঁ কী?

মঁ জুরদ্যাঁ

জুরদিনাকে পলাদিনা বনা দিয়া।

মাদাম

কী?

মঁ জুরদ্যাঁ

মহা কিস্মতে পাগড়ি মিলা।

মাদাম

তার মানে?

মঁ জুরদ্যাঁ

পলেস্তিন বচানা হোনা।

মাদাম

এসব কী বলছ?

মঁ জুরদাঁ

দারা দারা, ডাণ্ডালণ্ডড়া।

মাদাম

এসব হযবরল কী?

মঁ জুরদাঁ

গোসা না হোনা, বড়া বতৎ না চিড়ানা।

মাদাম

এসবের মাথামুণ্ডু কী?

মঁ জুরদাঁ (নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে)

ছ লা বা, বা লা ঙ, বা লা বা, বা লা দা। (ভূমিতে পতন)

মাদাম

হায় হায়, কর্তার আমার মাথাটি গেছে।

মঁ জুরদাঁ (উঠে যেতে যেতে)

চুপ, মুখপুড়ি, মানুশিকে ইলাহ্ করে চলবে।

মাদাম

কি করে ওঁর মতিভ্রম হ'ল? ওঁর বাইরে বেরুনো বন্ধ করি গে। (দোরিমেন ও দোরাঁৎকে দেখে) এই যে দলের বাকি সাকরেদরা। চারদিকে বিরক্তিকর ছাড়া কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দোরাঁৎ, দোরিমেন

দোরাঁৎ

দেখবেন মহাশয়া, একেবারে চরম বন্ধুরার ব্যাপার; আমি তো ভাবতেই পারি না গোটা দুনিয়ায় এমন আর একটা আস্ত গাড়ল আছে। আর তা ছাড়া, মহাশয়া, আমাদেরও কর্তব্য ক্লেঁতের প্রেমকে আস্কারা দেওয়া, তার চালচলন লক্ষ করা।

দোরিমেন

বেচারাকে আমার বড় ভালো লাগে, ওর ওপর ভাগ্যদেবীর আর একটু প্রসন্ন হওয়া উচিত।

দোরাঁৎ

তা ছাড়া আমরা এখানে সুবিধাজনক আমোদ-প্রমোদের একটু আয়োজন করেছি, তা ভুললে চলবে না আমার মতলব সিদ্ধ হয় তা আমাকে দেখতেই হবে।

দোরিমেন

দেখলাম ওখানে মহা আড়ম্বর, কিন্তু দোরাঁৎ, ওসব জিনিসই আমার আর বরদাস্ত হয় না। এবার অবশেষে আপনাদের বাড়াবাড়ি আমাকে থামাতেই হবে, আমার গর্দান নিতে এমন অপচয়ও বন্ধ করতে হবে। আপনাকে বিয়ে দিয়ে বিদেয় করে দেব। এইটেই আসল রহস্য, আর জানেনই তো এসব ব্যাপারের সমাপ্তি সাদিতে।

দোরাঁৎ

মহাশয়া, এও কি সম্ভব—আমার অনুকূলে আপনার এমন সদয় সিদ্ধান্ত?

দোরিমেন

আপনাকে আত্মঘাতের হাত থেকে বাঁচাতেই তা করছি, পরিষ্কার দেখছি এ-ছাড়া অচিরে আপনার এক কানাকড়ির মূল্যও থাকবে না।

দোরাঁৎ

দেবীর কি দয়া, আমার ইজ্জৎ রক্ষার চিন্তায় কি উদ্বিগ্ন। সবই তো আপনার হাতে, মায় আমার কলিজা পর্যন্ত—তা নিয়ে আপনি যা খুশি করতে পারেন।

দোরিমেন

উভয়ের যথাযোগ্য ব্যবহার করব আমি। কিন্তু ওই যে আপনার নয়নমণিটি, দর্শনীয় লোকটি।

তৃতীয় দৃশ্য

মঁ জুরদাঁ। দোরিমেন, দোরাঁৎ

দোরাঁৎ

মশায়, আমি ও আমার স্ত্রী এসেছি সদ্য মহামান্য আপনাকে শ্রদ্ধা জানাতে আর মহাশয় তুর্কীর ছেলের সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ ব্যাপারে আনন্দ প্রকাশ করতে।

জুরদাঁ (তুর্কী কায়দায় আদাব জানিয়ে)

মশাই, আপনার যেন হয় সাপের মতো বিক্রম আর সিংহের মতো চতুরতা।

দোরিমেন

আপনি যে উঁচু পদবীর মহিমায় উঠেছেন তাতে প্রথম আগন্তুকদের মধ্যে থেকে আপনাকে অভিনন্দিত করতে পেরে একান্ত খুশি হয়েছি।

মঁ জুরদাঁ

মাদাম, আপনার গোলাপগাছ যেন চিরকাল ফুলে ভরে থাকে ; আমাকে দেওয়া হল যে সম্মান তাতে আপনারা মোহিত, সেজন্য আপনাদের কাছে আমি ঋণী ; আমি বেজায় খুশি আপনারা ফিরে এসেছেন ব'লে, আর আমার গৃহিণীর দুর্বিনয়ের জন্য ক্ষমা চাইবার অবকাশ মিলল তাতে।

দোরিমেন

ও কিছু নয়, মহাশয়ার তোলা ওরকম ঝড় আমি ক্ষমা করতে পারি ; ওঁর কাছে আপনার হৃদয় নিশ্চয় মূল্যবান, আপনার মতো মানুষ পেয়ে ওঁর কিছু শঙ্কা থাকাই উচিত।

মঁ জুরদাঁ

আমার হৃদয় জয় ব্যাপারে আপনি সম্পূর্ণ সফল।

দোরাঁৎ

দেখুন মাদাম, মঁসিয় জুরদাঁ সেরকম পাত্র নন যাকে সমৃদ্ধি অন্ধ করতে পারে এবং যিনি ধনী হয়েও জানেন বন্ধুদের ধরে রাখতে।

দোরিমেন

সত্যিকারের উদার অন্তঃকরণের চিহ্ন তা।

দোরাঁৎ

কোথায় সেই মহামহিম তুর্কী ? আপনার বন্ধু হিসাবে তাঁকে অভিবাদন জানাতে পারলে খুশি হব।

মঁ জুরদাঁ

ওই আসছেন তিনি, আমার মেয়েকেও ডেকেছি—দুই হাতের মিলনের জন্য।

চতুর্থ দৃশ্য

ক্লেয়ঁৎ, কোভিয়েল, মঁ জুরদাঁ প্রভৃতি

দোরাঁৎ

মেহরবান, মহামহিম আপনার কাছে এসেছি আপনার শ্বশুরের বন্ধু হিসাবে, আর জানাতে যে গরীবরা আপনার সেবার জন্য প্রস্তুত।

মঁ জুরদাঁ

দোভাষী কোথায় গেল যে আপনাদের পরিচয় দেবে, ওঁকে বুঝিয়ে দেবে আপনাদের কথা ? শুনবেন ওঁর উত্তর এবং চমৎকার তুর্কী বলা। আরে কোথায় গেল হতভাগা ? (ক্লেয়ঁতের প্রতি) স্ত্রুফ্ স্ত্রিফ্ স্ত্রোফ্ স্ত্রাফ্। এই মহাশয় মহৎ আশয়, চেহারাই ব্যক্তি, এই মহাশয়া মহা দেবী, মহা মহা দেবী ! (বোঝাতে অক্ষম হয়ে) আরে, দূর ছাই ! (ক্লেয়ঁতের প্রতি) মহাশয় হলেন ফরাসী মানুষি আর মহাশয়া ফরাসী মানুষানী। এর চেয়ে স্পষ্ট কথা খুঁজে পাই না। যাক, এই যে দোভাষী এসে পড়েছে। কোথায় যান আপনি ? আপনি ছাড়া আমাদের কথা ফোটে না। বলুন তো ওঁকে, এই ভদ্র ভদ্রা মহাগুণীরা আমার বন্ধু হিসাবে এসেছেন শ্রদ্ধা জানাতে, তাঁদের সেবার প্রতিশ্রুতি দিতে। দেখুন এবার কেমন উত্তরটি।

কোভিয়েল

আলাবালা ক্রোসিরাস্ আক্চি বোরান্ আলাবানে।

ক্লেয়ঁৎ

কাতালেকি তুবাল্ উরিন্ সোতে আমালুচান্।

মঁ জুরদাঁ

দেখলেন তো ?

কোত্তিয়েল

উনি বললেন, সকল প্রভুতে সমৃদ্ধির ধারা বর্ষিত হয় তোমার আত্মীয়-বাগিচার উপর।

মঁ জুরদাঁ

বলছিলাম না উনি তুর্কী বলেন?

দোরাঁৎ

অবাক কাণ্ড দেখছি!

পঞ্চম দৃশ্য

লুসিল, মঁ জুরদাঁ, দোরাঁৎ, দোরিমেন প্রভৃতি

মঁ জুরদাঁ

এস মা আমার; কাছে এস, হাতখানি দাও এঁর হাতে যিনি তোমার পাণিপ্রার্থী।

লুসিল

সে কি! বাবা, এ কী কাণ্ড করছেন! তামাশা করছেন?

মঁ জুরদাঁ

না, না, হাসিমস্করা নয়, রীতিমতো গুরুতর ব্যাপার; তোমার জন্য বাঞ্ছনীয় তৃপ্তিকর জিনিস। এই বর দিচ্ছি তোমাকে।

লুসিল

বাবা, আমাকে দিচ্ছেন?

মঁ জুরদাঁ

হ্যাঁ তোমাকে। এস, হাত ধরো ওর, তোমার সুখের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও।

লুসিল

আমি বিয়ে করতে চাই না।

মঁ জুরদাঁ

আমি চাই, আমি, তোমার বাবা।

লুসিল

ও আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

মঁ জুরদাঁ

আঃ। মিছে লম্ফঝম্ফ! এস যেমন বলছি। দাও তোমার হাত।

লুসিল

না, বাবা, তোমাকে তো বলেছি কেউ আমাকে ক্লেঁয়ৎ ছাড়া আর কাউকে গ্রহণ করাতে পারবে না। তার চেয়ে, আমার প্রতিজ্ঞা যে-কোনো চরম...(ক্লেঁয়ৎকে চিনতে পেরে) ঠিক কথা, তুমি আমার বাবা, তোমার একান্ত বাধ্য হওয়া আমার কর্তব্য : আমাকে যার হাতে খুশি দিতে পার।

মঁ জুরদাঁ

বেশ! নিজের কর্তব্যবোধে এত চট করে ফিরে এলে দেখে আমি পুলকিত ; বাধ্য মেয়ে পেয়ে আমার যে কি আনন্দ!

ষষ্ঠ দৃশ্য

মাদাম জুরদাঁ, ম জুরদাঁ, ক্লেঁয়ৎ প্রভৃতি

মাদাম

বল তো, ব্যাপারখানা কী ? লোকে বলছে তুমি নাকি এক ভাঁড়ের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দিতে চাও ?

মঁ জুরদাঁ

চুপ করবে তুমি, ফোঁড়নদেনেওয়ালী ? আকছার সব জিনিসে নিজের বাড়াবাড়ি নিয়ে নাক গলাও কেন : তোমাকে কিছুতে আর মানুষ করা গেল না।

মাদাম

তোমাকেই কোনো রকমে সুবুদ্ধি দেওয়া যায় না, ভুল থেকে ভুলে লাফিয়ে যাও তুমি। বলি, মতলবখানা কী, এসব দলবল নিয়ে কী হচ্ছে ?

মঁ জুরদাঁ

আমি চাই মহামহিম তুর্কীর সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিতে।

বাদান

মহান তুর্কীর বেটা ?

মঁ জুরদাঁ

আজ্ঞে। (কোভিয়েলকে দেখিয়ে) তাঁকে ওই দূত মারফত অভিনন্দন জানাও।

বাদান

চুলোয় যাক তোমার দূত। তার মুখের ওপর বলে দেব, আমার মেয়ে পাবার তার কোনো আশা নেই।

মঁ জুরদাঁ

খিটিমিটি খাবার ?

সোরাঁৎ

বাদান জুরদাঁ, এমন মান আপনি ফিরিয়ে দিচ্ছেন ? এমন তুর্কী মহাপ্রভুকে জানাই করতে আপত্তি জানাচ্ছেন ?

বাদান

মশাই, দয়া করে নিজের চরকায় তেল দিন গে।

সোরিবেন

এমন অত্যুচ্চ সম্মান কোনো রকমে প্রত্যাখ্যান করা চলে না।

বাদান

মহাশয়া, দয়া ক'রে পরের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।

সোরাঁৎ

আপনাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্যই আপনাদেরই স্বার্থে আপনাদের বিষয়ে আগ্রহী আমরা।

বাদান

আপনাদের বন্ধুত্ব ছাড়াই বেশ চলবে আমার।

সোরাঁৎ

আপনার মেয়ে তো বাপের ইচ্ছায় সায় দিয়েছে।

মাদাম

আমার মেয়ে তুকী বিয়ে করতে রাজী?

দোরাঁৎ

অবশ্য।

মাদাম

সে কি ক্লেয়ঁৎকে ভুলতে পারে?

দোরাঁৎ

সম্ভ্রান্ত মহিলা হ'তে কেই বা অরাজী?

মাদাম

ওরকম করলে আমি নিজেই ওর গলা টিপে মারব।

মঁ জুরদাঁ

থাক, থাক, বকর বকর অনেক হয়েছে। আমি বলছি, এ বিয়ে হবেই।

মাদাম

আমিও বলে রাখছি, এ বিয়ে হতে দেব না।

মঁ জুরদাঁ

ও কী?

লুসিল

মা।

মাদাম

যা, তুই একটা আস্ত গোরু।

মঁ জুরদাঁ (মাদামের প্রতি)

কী! আমার বাধ্য বলে ওকে ধমকানো।

মাদাম

হ্যাঁ, ও যেমন তোমার তেমনি আমারও।

কোভিয়েল (মাদামের প্রতি)

মাদাম !

মাদাম

আপনি, কী বলতে চান আপনি আমাকে ?

কোভিয়েল

একটি কথা।

মাদাম

গোল্লায় যাক আপনার কথা।

কোভিয়েল (মঁ জুরদ্যাঁর প্রতি)

উনি বোধহয় গোপনে আমার কথা শুনবেন। আমি কথা দিচ্ছি, আপনার ইচ্ছায় ওঁকে মত দিতে রাজী করাব আমি।

মাদাম

না, আমি মত দেব না।

কোভিয়েল

শুনুনই না আমার কথা।

মাদাম

না।

মঁ জুরদ্যাঁ (মাদামের প্রতি)

শোনো, উনি কী বলতে চান।

মাদাম

না, শুনব না।

মঁ জুরদ্যাঁ

উনি বলবেন...

মাদাম

আমাকে উনি কিছুই বলবেন না।

মঁ জুরদাঁ

দেখ দেখি গোঁয়ারগোবিন্দ মেয়েমানুষ। ওঁর কথা শুনলে কি কোনো ক্ষতি আছে?

কোভিয়েল

একবার মাত্র শুনুন: তারপর যা খুশি করবেন।

মাদাম

বেশ, কী?

কোভিয়েল (মাদামকে চুপিচুপি)

আপনাকে এইমাত্র কত ইঙ্গিত দিলাম। দেখতে পাচ্ছেন না এসব করা হয়েছে আপনার কর্তার মর্জির সঙ্গে তাল রাখতে: ছদ্মবেশের মারফত ওঁকে বাগ মানাতে হচ্ছে, মহান তুর্কীর বেটা একেবারে নির্ভেজাল ক্লেয়ঁৎ!

মাদাম (কোভিয়েলের প্রতি)

আরে, আরে!

কোভিয়েল (মাদামকে)

আর এই আমি হলাম জবরদস্ত দূত কোভিয়েল।

মাদাম (চুপিচুপি কোভিয়েলকে)

বেশ, সেক্ষেত্রে রাজী হলাম।

কোভিয়েল (চুপিচুপি মাদামকে)

ভান করুন যেন কিছুই জানেন না।

মাদাম (দরাজ গলায়)

আচ্ছা, এ বিয়েতে মত দিলাম।

মঁ জুরদাঁ

হ্যাঁ, গোটা জগৎটাই যুক্তির কাছে নত। (মাদামের প্রতি) তুমি তো শুনতে চাও নি ওঁর কথা। আমি জানতাম উনি বুঝিয়ে বলতে পারবেন মহাতুর্কীর পুত্র কী।

মাদাম

উনি মোক্ষম বুঝিয়েছেন, আমিও তাতে সন্তুষ্ট। একজন উকিল ডাকা হোক।

দোরাঁৎ

বেশ বলেছেন। আর নাপান জুরদাঁ, যাতে আপনার মন নিশ্চিন্ত হয়, যাতে আপনার স্বামীর সম্বন্ধে সন্দেহবশে সৃষ্ট সকল ঈর্ষার অবসান হয় সেজন্য আমি ও আমার বান্ধবী একই উকিলের সাহায্য নেব।

নাপান

তাতেও সম্মতি দিলাম।

মঁ জুরদাঁ (একান্তে দোরাঁৎকে)

ওঁকে বিশ্বাস করানই যথেষ্ট।

দোরাঁৎ (মঁসিয়কে চুপিচুপি)

এই ভাঁড়ামি দিয়ে ওঁকে বেশ আমোদ দেওয়া যাক।

মঁ জুরদাঁ

বেশ, বেশ। (সজোরে) কেউ গিয়ে উকিল ডেকে আনুক।

দোরাঁৎ

ইতিমধ্যে, যতক্ষণ না তিনি আসছেন এবং চুক্তি তৈরি করছেন, আমরা উৎসব উপভোগ করি আর মহামহিম তুর্কীকেও আনন্দ দেই।

নাপান

কিন্তু নিকোল ?

মঁ জুরদাঁ

তাকে দিলাম মহাদূতের হাতে, আর যে চায় তার হাতে আমার স্ত্রীকে।

কোভিয়েল

মশাই, ধন্যবাদ। (স্বগত) এর চেয়ে বড় বুদ্ধু থাকলে রোমে গিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঢেঁড়া পিটিয়ে গলা ফাটিয়ে বলতাম।

S. N. PAUL & CO.

High Class Brick Manufacturers & Contractors

Brick Field
Sreepore Bagharghole
P.O. Bonhooghly, 24 Parganas

Head Office
34: 1, Puddapukur Road
Calcutta-20

Phone : 47-2869

With the best compliments from :-

Ellora Enterprise

Paper & Board Merchants

57/2A, College Street
Calcutta-73

34-3720

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

সমগ্র রচনাবলী

পাঁচ খণ্ড প্রকাশিত—প্রতি খণ্ডের মূল্য ২৫·০০ টাকা

***

রমেন সেনগুপ্ত

প্রণতি

শতবার্ষিকী উপলক্ষে মায়ের চরণে নিবেদিত কাব্যগ্রন্থ

মূল্য ৩·০০ টাকা

অনিমা মজুমদার

মঞ্জিরা

(কাব্যগ্রন্থ)

***

সমীরকান্ত গুপ্ত

কাব্যলোকে

মূল্য :

শতাব্দীর পূজা

শ্রীমা ও আশ্রম প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ মূল্য : ৪·০০

***

অনিলবরণ রায় ও যোগানন্দ

মহাবির্ভাব

শ্রীশ্রীমদ্ ভারতব্রহ্মচারী ও শ্রীশ্রীজগন্মাতার মহাবির্ভাব

—প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম	শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির	শ্রীঅরবিন্দ ভবন	পুথিঘর
পণ্ডিচেরী	১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলিকাতা-৭৩	৮ শেক্সপীয়র সরণী কলিকাতা-৭১	৬৩ কলেজ স্ট্রীট কলিকাতা-১২

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বর্তিকা

২৪শে এপ্রিল ১৯৮২

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বর্ত্তিকা

২৪শে এপ্রিল ১৯৮২

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

ঋষি বিশ্বামিত্রের অগ্নিমন্ত্র	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
মায়ের আলাপ	
সাবিত্রী (রাজার যোগ-কথা)	অনির্বাণ
মায়ের লেখা—মায়ের কথা	শ্রীশুভময় বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ত্তিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগস্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫·০০ টাকা। বৎসরের যে-কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিসে কিংবা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

	প্রতি সংখ্যা	বার্ষিক
প্রতি পৃষ্ঠা	১০০·০০ টাকা	৩০০·০০ টাকা
প্রতি অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	৬০·০০	২০০·০০
ভিতরের মলাট	১৫০·০০	৫২০·০০
বাইরের মলাট	২০০·০০	৬০০·০০

শাখা
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

সম্পাদক :
শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য দেড় টাকা

Edited by : Nolini Kanta Gupta
Published by : Sri Aurobindo Pathamandir,
15 Bankim Chatterjee Street, Calcutta-73
Printed by : Amiyo Ranjan Ganguli
at Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry

It is the Divine Presence that gives value to life. This Presence is the source of all peace, all joy, all security. Find this Presence in yourself and all your difficulties will disappear.

With my blessings

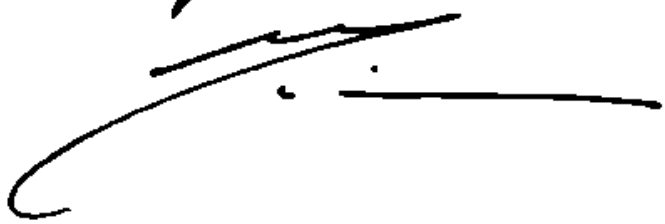

ঋষি বিশ্বামিত্রের অগ্নিমন্ত্র

(ঋগ্বেদ—তৃতীয় মণ্ডল, পঞ্চবিংশতি সূক্ত)

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

অগ্নে দিবঃ সূনুরসি প্রচেতাস্তনা পৃথিব্যা উত বিশ্ববেদাঃ।
পাহ্যস্মদ্দেবাঁ ইহ যজা চিকিত্বঃ ॥১॥

অগ্নে—হে অগ্নি
দিবঃ—দ্যুলোকের
সূনুঃ—পুত্র
অসি—হও তুমি
প্র-চেতাঃ—সচেতন, জ্ঞানী, জ্ঞানময়
তনা—তনু বা শরীর দিয়ে
পৃথিব্যাঃ—পৃথিবীর
উত—আরও
বিশ্ববেদা—সর্বজ্ঞানী, বিশ্বজ্ঞানী
পাহি—পৃথকভাবে
দেবান্—দেবতাদের
ইহ—এখানে
যজ—যাজন কর
চিকিত্বঃ—জ্ঞানময় তুমি, চৈতন্যময়, চিন্ময়

হে অগ্নি, পৃথিবীর শরীর দিয়ে তুমি হয়েছ স্বর্গের তনয়, জ্ঞানী তুমি, তুমিই সর্বজ্ঞানী, প্রত্যেক দেবতার উদ্দেশ্যে পৃথকভাবে যজ্ঞ কর, চিন্ময় তুমি ॥১॥

অগ্নিঃ সনোতি বীর্যাণি বিদ্বান্ৎসনোতি বাজমমৃতায় ভূষন্।
স নো দেবাঁ এহ বহা পুরুক্ষো ॥২॥

অগ্নিঃ—অগ্নি
সনোতি—জয় করে
বীর্যাণি—বীর্য বা বীরশক্তিসব
বিদ্বান্—জ্ঞানময়
সনোতি—জয় করে
বাজম্—পূর্ণতা

অমৃতায়—অমৃতত্বের জন্য
ভূষন্—প্রয়াস করে
সঃ—সেই তুমি
নঃ—আমাদের কাছে
দেবান্—দেবতাদের
আ+ইহ / বহ } —এখানে নিয়ে এস
পুরু-ক—বহুলদাতা

অগ্নি, সকল বীর্য জয় করেন, জ্ঞানী তিনি, তাই তিনি জয় করেন প্রাচুর্য সব, প্রয়াস তাঁর অমৃতত্বের অভিমুখে ; তাই তুমি দেবতাদের এখানে নিয়ে এস, তোমার দান বহুবিধ ।।২।।

অগ্নির্দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বজন্যে আ ভাতি দেবী অমৃতে অমূরঃ।
ক্ষয়ন্বাজৈঃ পুরুশ্চন্দ্রো নমোভিঃ ।।৩।।

অগ্নিঃ—অগ্নি
দ্যাবাপৃথিবী—দ্যুলোক-ভূলোক
বিশ্বজন্যে—বিশ্বজননী
আ ভাতি } —উদ্ভাসিত করে
দেবী—দেবী দুজনে
অমৃতে—অমর দুজন
অমূরঃ—অজ্ঞাননুক্ত
ক্ষয়ন্—অধিকার করে
বাজৈঃ—সকল পরিপূর্ণতা দিয়ে
পুরু-চন্দ্রঃ—বহুল আনন্দময়
নমোভিঃ—বিধানসকল দিয়ে

অজ্ঞাননুক্ত অগ্নি উদ্ভাসিত করে ধরেছেন দ্যুলোক-ভূলোককে এই অমর বিশ্বজননী দুই দেবীকে, তিনি সর্ব অধিকারী। তাঁর পরিপূর্ণতা ও বিধানসকল দিয়ে তিনি আনন্দকে বহুবিধ করেছেন ।।৩।।

অগ্ন ইন্দ্রশ্চ দাশুষো দুরোণে সুতাবতো যজ্ঞমিহোপ যাতম্।
অমর্ধন্তা সোমপেয়ায় দেবা ।।৪।।

অগ্নে—হে অগ্নি

ইন্দ্র চ —ইন্দ্র তুমিও
দাশুষে—প্রদাতার
দুরোণে—তোরণভূষিত গৃহে
সুত-বতঃ—সোমরসদাতার
যজ্ঞম—যজ্ঞে
ইহ—এখানে
উপ যাতন্—এসে উপস্থিত হও
অমর্ধন্তা—অবিস্মরণী,—বিস্মৃতিমুক্ত
সোম-পেয়ায়—সোমপানের জন্য
দেবা—দেবতারা

হে অগ্নি, হে ইন্দ্র, এই সোমরস-প্রদাতার তোরণভূষিত গৃহে এখানে এই যজ্ঞে এস সোমপানের জন্য, দেবতা তোমরা, তোমাদের বিস্মৃতি নাই ॥৪॥

অগ্নে অপাং সমিধ্যসে দুরোণে নিত্যঃ সূনো সহসো জাতবেদঃ।
সধস্থানি মহয়মান ঊতী ॥৫॥

অগ্নে—হে অগ্নি
অপাম্—জলধারার
সম্ ইধ্যসে—প্রজ্বলিত তুমি
দুরোণে—গৃহে
নিত্যঃ—নিত্য, চিরন্তন
সূনো—হে পুত্র
সহসঃ—বলের
জাতবেদঃ—জন্মজ্ঞানী, সর্বজন্মজ্ঞাতা
সধ-স্থানি—যজ্ঞস্থান সব
মহয়মানঃ—বর্ধিত করে
ঊতী—(রক্ষা করে তারা) রক্ষণে রক্ষণ দ্বারা

হে অগ্নি, চিরন্তন তুমি প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছ জলধারার আপন গৃহে, মহাবলের পুত্র তুমি, সর্বজন্মজ্ঞানী, তুমি রক্ষা কর, বর্ধিত করে ধর সকল যজ্ঞাগন ॥৫॥

মায়ের আলাপ

৪ঠা মে, ১৯৫৫

(আলোচ্য বিষয়: Les Bases du Yoga, chapitre V, ed. Ashram 1954)

প্রশ্ন: মা, কি ভাবে মানুষ বিশ্বপ্রাণ থেকে শক্তি আহরণ করতে পারে?

শ্রীমা নানা ভাবে তা করা যায়। প্রথম কথা হলো, তোমার জানা চাই যে এ বস্তুটি রয়েছে এবং মানুষ তার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারে। তারপর কাজ হল এই সংযোগ স্থাপন করতে চেষ্টা করা, অনুভব করা এ বস্তু সর্বত্র প্রবহমান, সব কিছুর মধ্যে সকল মানুষের মধ্যে এবং সর্ব অবস্থায় বিরাজমান। এটিকে উপলব্ধি করতে হলে যেমন ধর, তুমি যদি কখনও পল্লী অঞ্চলে যাও দেখতে চেষ্টা করবে যে এই বস্তুটি সর্বত্র প্রকৃতি ও গাছপালার মধ্যে স্পন্দিত হচ্ছে। তার সঙ্গে সংযুক্ত হবার চেষ্টা করবে, তার সঙ্গে যতদূর সম্ভব ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করবে, আর প্রতিবার যখনই তুমি তার সঙ্গে আদানপ্রদান করতে চাইবে, তখন সেই অনুভূতিটিকে স্মরণে আনবে এবং তার সঙ্গে এক হয়ে যেতে চেষ্টা করবে।

কোনো কোনো লোকের অভিজ্ঞতা হল বিশেষ গতিবৃত্তি, বিশেষ ভঙ্গি, বিশেষ ক্রিয়াকলাপের দ্বারা তারা এই শক্তির সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হয়ে যায়।

আমি এমন লোকেদের দেখেছি যারা চলতে চলতে এক রকমের বিশেষ ধরনের ভঙ্গী করতো—সত্যি সত্যি তাদের ধারণা ছিল তারা এই ভঙ্গীর দ্বারা প্রকৃতির সঙ্গে সংযুক্ত—কিন্তু শিশুরা এগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে করে থাকে; যখন তারা খেলাধুলোয় সম্পূর্ণ মেতে গিয়ে, নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেলে, দৌড়ঝাঁপ, লম্ফঝম্ফ চেঁচামেচি করে, তাদের সমস্ত শক্তিকে নিঃশেষ করে ফেলে, তখন তারা খেলাধুলোর আনন্দে এইভাবে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে প্রাণশক্তির হাতে ছেড়ে দেয়। তারা এটা জানেনা—কিন্তু শিশুরা বিশ্বপ্রাণশক্তির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে প্রাণশক্তিকে নিঃশেষ করে দেয়, এবং সেইজন্যে তারা ক্লান্তিবোধ না করে অনেকক্ষণ দৌড়তে পারে, তারপর মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে ক্লান্ত হয়ে যায়। তার মানেই হলো, তারা যদি বিশ্বপ্রাণশক্তির সঙ্গে সংযুক্ত না থাকতো, তাহলে তারা তৎক্ষণাৎ অবসন্ন হয়ে পড়তো, সেইজন্যই তারা বড় হয়ে ওঠে, এর আরও কারণ হল তারা যতটা শক্তি ব্যয় করে তার চেয়ে ঢের বেশী গ্রহণ করে; তারা জানে কি ভাবে খরচ করার চেয়ে বেশী গ্রহণ করা যায়। এর সঙ্গে জ্ঞানের কোন সংযোগ নেই। এ হলো স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত গতি। এ হলো গতির প্রবাহ... তারা যা কিছুই করে তা সানন্দে করে, এ হলো ব্যয় করার আনন্দ। এইভাবে মানুষ অনেক কিছুই করতে পারে।

আমি কয়েকজন তরুণকে জানতাম যারা ছিল সহরের বাসিন্দা—আর সেখানকার সে সব সহরে ছোটছোট ঘরে লোকেরা গাদাগাদি করে থাকতো। একবার তারা দক্ষিণ ফ্রান্সের পল্লী অঞ্চলে কিছুদিন ছুটি কাটাতে গেল। সেখানকার রোদ ছিল উত্তপ্ত, অবশ্যই

এখানকার মতন নয় তাহলেও যথেষ্ট গরম ছিল (যেমন ধর ভূমধ্যসাগরের গরমের সঙ্গে প্যারিসের গরমের তুলনা করলে তফাৎটা বোঝা যায়) ; তাই প্রথম কয়েকদিন যখন তারা পল্লী অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে লাগলো, তখন সত্যি তাদের দারুণ মাথাব্যথা সুরু হলো এবং এই রোদের জন্য তারা সাংঘাতিক অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। কিন্তু হঠাৎ তাদের মনে হল "আচ্ছা, আমরা যদি রোদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করি তাহলে আমাদের আর কোন ক্ষতি হবে না।" তখন তারা অন্তরে অন্তরে এই বন্ধুত্ব করবার এবং বিশ্বাস করবার চেষ্টা করতে লাগলো এবং তারপর যখন তারা রোদে বেরুল তখন তারা গরমের দরুণ অস্থির হয়ে, "উঃ কি গরম, কি জ্বালাই না করছে" এ কথা না বলে তারা বলতে লাগলো, "বাঃ সূর্য্যের উত্তাপ কি পরিমাণ তেজোময়, তৃপ্তিকর এবং প্রীতিকর" ইত্যাদি। তারা নিজেদের এইভাবে খুলে ধরে (ভঙ্গি করে দেখালেন) এইভাবে তারা যে কেবল এর ফলে আর কখনো কষ্টভোগ করতো না তাই নয়, পরে তারা এতখানি বলীয়ান হয়ে উঠলো যে, যখন তাদের কেউ বলতো "কি ভীষণ গরম" তাদের সবাইকে এরা বলতো, "আমরা যেমন করি তোমরাও সেইরকম কর, তাহলে দেখবে সূর্য্য কত ভাল।" আর তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা খোলা মাথায় কোন রকম অসুবিধা বোধ না করে প্রখর সূর্য্যের নীচে থাকতে পারতো, এ হল একই ব্যাপার!

ব্যাপারটা একই, সূর্য্যের মধ্যে যে বিশ্বপ্রাণশক্তি রয়েছে তারা তার সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত করে সেই শক্তিলাভ করেছে, যেটা অপ্রীতিকর ছিল সে সবকে সরিয়ে দিয়েছে।

কেউ যখন পল্লী অঞ্চলে থাকে, এবং গাছপালার মধ্যে বেড়িয়ে বেড়ায় তখন সে নিজে প্রকৃতির এত সন্নিকট বোধ করে যে, গাছপাতা, ডালপালা, গুল্মলতা, আকাশবাতাস প্রভৃতির সঙ্গে এত নিবিড় একাত্ম অনুভব করে এবং নিশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে এই অপূর্ব বাতাসকে গ্রহণ করে যা গাছপালার সুগন্ধে ভরপুর, তখন সে নিজেকে খুলে ধরে এবং এই খুলে ধরার দ্বারা বিশ্বশক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। সব কিছুর বেলায় এইভাবেই করতে হয়।

প্রশ্ন না, শীতকালেও কি এই পদ্ধতি অনুসরণ করা যায়?

শ্রীমা হ্যাঁ, আমার তো তাই মনে হয়। সবক্ষেত্রেই মানুষ এই পদ্ধতি ধরে চলতে পারে।

প্রকৃতির ক্ষেত্রে সূর্য্য হল একটা শক্তিমান প্রতীক, তাই এটা ঠিক একই জিনিষ নয়। এর নিজের মধ্যেই রয়েছে একটা অসামান্য পুঞ্জীভূত শক্তি। আমার মনে হয় ঠাণ্ডা হলো, যেন একটা অমূলক কিছু ; এর মধ্যে কিছুর একটা অভাব রয়ে গেছে, কিন্তু সে যাই হোক, যে জানে প্রকৃতির ছন্দের সঙ্গে কিভাবে নিজেকে মিলিয়ে দিতে হয়—সে অনেক কিছু অস্বাচ্ছন্দ্যের হাত এড়াতে পারে। মানুষকে যা কষ্ট দেয়, যা তার দেহের সাধ্য অবস্থাকে নষ্ট করে দেয় সেটা হল একটা সঙ্কীর্ণতা, সর্বদাই তাই এমনটা ঘটে তার কারণ মানুষ সর্বদা সীমার মধ্যে আবদ্ধ, তাই শ্রীঅরবিন্দ এখানে লিখেছেন, একটা শক্তি প্রবল জোরে এই সীমার উপর চাপ দেয়, তার দ্বারা সব কিছু ওলোটপালট হয়ে যায়।

প্রশ্ন আচ্ছা মা, "আভ্যন্তরীণ দেহ" কাকে বলে?

শ্রীমা গতবারে মগ্নচৈতন্য (Subliminal) সম্পর্কে আলোচনার সময় এই প্রশ্ন

সম্বন্ধে কথা হয়েছিল। ও একই জিনিষ। দেহের যে বাহ্য রূপটা আমরা দেখি, বলতে গেলে সেই আকৃতিটা এক রকমের আভ্যন্তরীণ অস্তিত্ব এবং সারবস্তুর দ্বারা বিধৃত—যা এই বাহ্য-বস্তুটির দ্বারাই প্রকাশ পাচ্ছে। এটা তুমি পরিষ্কার বুঝতে পার যখন কিছু একটা বাইরের থেকে তোমাকে আঘাত করে, সেটা খুব প্রীতিকর নয়, যখন তুমি নিজেকে সেটা থেকে সরিয়ে নাও, তুমি ঘটনাচক্রে বা কোন বস্তুর পরশ সেই সংযোগ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নাও, প্রথমটা মনে হয় তুমি নিজেকে তোমার দেহময় সত্তার মধ্যে গুটিয়ে নাও, যে দেহময় সত্তাটি রয়েছে সে একটি নতুন আকার সৃষ্টি করবার জন্যে বাহ্যসত্তার উপর চাপ দেয়। ঠিক এই বস্তুটিই শিশুদের বড় করে তোলে, এ হল এক রকমের ভিতরকার জিনিষ যা ঠেলা দেয়, কাজ করবার জন্যে, গতিবেগ লাভ করবার জন্যে এবং উন্নতির পথে এগিয়ে যাবার জন্যে। কিন্তু এ হ'ল দেহগত বস্তু এ প্রাণেরও নয়, মনেরও নয় সম্পূর্ণ দেহগত বস্তু, এ হল এমন এক বস্তু যা বাইরে আত্মপ্রকাশের জন্যে ভিতর থেকে ঠেলা দেয় এবং এ বস্তুটি সেই প্রকাশের কাজে একাগ্র এবং সক্রিয় হয়। ভিতরের দিকে এ হ'ল আরও পরিব্যাপ্ত এবং অস্পষ্ট। শ্রীঅরবিন্দ একেই বলেন "আভ্যন্তরীণ দেহ" এ চের বেশী অস্পষ্ট যা বোঝা যায় না। মানুষ সেখানে স্বপ্ন দেখতে পারে, যেমন ধর কেউ স্বপ্ন দেখলো একটা ঘর সেটা তার নিজেরই ঘর। তার নিজেরই ঘর বটে কিন্তু ছোটখাট তফাৎ আছে। সে যখন সম্পূর্ণ জেগে আছে তখন দু'চোখ দিয়ে যা দেখে এটা ঠিক তা নয়। এ হল একটা বাহ্য দর্শন কিন্তু একটা আবছা তফাৎ আছে। একেবারে বাহ্য বস্তুর তুলনায় সামান্য একটু তফাৎ।

এইখানেই শেষ?

প্রশ্ন: বা. বিশ্বপ্রাণশক্তিদের কি কোন সীমারেখা আছে?

শ্রীমা আবার তো মনে হয় না যে শক্তিরা সীমাবদ্ধ, কারণ আমাদের তুলনায় তারা অবশ্যই সীমাহীন। তবে আমাদের গ্রহণসামর্থ্য হল সীমাবদ্ধ। বিশেষ একটা পরি-মানের অতিরিক্ত আমরা তাদের গ্রহণ করতে পারি না। তার উপর আবার আমরা যতটা পরিমাণে ব্যয় করি আর যতটা গ্রহণ করি তার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য থাকা চাই। কেউ যদি হঠাৎ কোন ঝোঁকের মাথায় খরচ করে বসে, যেমন ধর, উত্তেজনার আবেগে কেউ যদি যতটা সঞ্চয় করেছে তার চেয়ে ঢের বেশী খরচ করে ফেলে, তাহলে আরম্ভ হয়ে শান্তভাবে বিশ্বশক্তিদের গ্রহণ করতে পারার বেশ খানিকটা সময় দরকার হয়। তাদের গ্রহণ করতে পারার জন্যে তোমাকে একটা বিশেষ অবস্থায় আসতে হবে। তখন সেই শক্তিগুলি কিছু-ক্ষণের জন্যে থাকে কারণ একবার তাদের খরচ করে ফেলে আবার তাদের গ্রহণ করবার জন্যে তৈরী হতে হবে। এই অর্থেই তাদের সীমা আছে। শক্তিগুলি সীমাবদ্ধ নয়, মানুষের গ্রহণ সামর্থ্যই হ'ল সীমাবদ্ধ।

এক একজনের গ্রহণ সামর্থ্য এক এক রকম। কোন দুটি মানুষের গ্রহণ সামর্থ্য পরিমাণে বা গুণে এক রকমের নয়। বিশেষ করে গুণের দিক থেকে। মানুষ খুব বিশুদ্ধ এবং অতি নিবিড় শক্তিদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়—যেগুলিকে বলা যেতে পারে রূপান্তরিত শক্তি অর্থাৎ বিশ্বপ্রাণ শক্তিগুলি যারা ভগবানের সঙ্গে সংযুক্ত এবং তারা শুধু ভগবানকে পায় তা

নয় পাবার জন্যে আশ্পৃহা করে। তাই এই শক্তিদের যদি আত্মসাৎ করতে পারো তাহলে এটাই তোমাকে উন্নতির পথে এগিয়ে যাবার জন্যে যথেষ্ট শক্তি দান করবে। ঠিক এই ক্ষেত্রেই গুণই হল চের বেশী মূল্যবান। তবে স্বভাবত বিশ্বপ্রাণ শক্তিদের গুণগুলি অনেক-খানি নির্ভর করে মানুষটি কি তার উপর, তাছাড়া সে কী করে তার উপরও।

কেউ যদি এই শক্তিগুলিকে নিজের অতি নীচ স্বার্থসিদ্ধির জন্যে ব্যবহার করে তাহলে, কিন্তু, তার পক্ষে নতুন ভাল শক্তিদের গ্রহণ করাটা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ যে সব শক্তিকে পায় সেগুলিকে কি ভাবে ব্যবহার করে তার উপর নির্ভর করে। কিন্তু যদি তুমি নিজের উন্নতির জন্যে, নিজেকে পূর্ণাঙ্গ করবার জন্য ব্যবহার কর, তাহলে...তোমার গ্রহণ করবার সামর্থ্যকে এই শক্তি প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়ে দেয় এবং পরের বার তুমি অনেক-খানি শক্তি পেতে পার, আসলে সব নির্ভর করে তুমি কি ভাবে তাদের ব্যবহার করছ তার উপর। যেমন ধর, কেউ কেউ আছে যারা স্বভাবতই রগচটা এবং তারা তাদের এই রাগকে সংযত করতে পারেনি, সে ক্ষেত্রে তারা যদি অভীপ্সাপরায়ণ হয়ে অথবা অন্য কোন উপায়ে উর্ধ্বের কোন প্রাণশক্তিদের গ্রহণ করতে পেরে থাকে তাহলে তাদের এই বিরক্তি বা রাগকে সংযত করার পরিবর্তে...যেহেতু তাদের আত্মসংযম বলে কিছু নেই, তাদের রাগটা আরও বেড়ে যায়, অর্থাৎ তাদের চটে ওঠা, তাদের বিদ্রোহী হয়ে ওঠার প্রবৃত্তির পিছনে রয়েছে আরও প্রবল বেগ ও প্রবল শক্তি। তাই সেটা আরও প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। এই কারণে বলা হয়ে থাকে যে "বিশ্বপ্রাণশক্তিদের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার দ্বারা মানুষ উন্নতি লাভ করেনা।" কিন্তু সত্যিকারের কারণটা হল তারা এগুলিকে অসৎভাবে ব্যবহার করে, স্বভাবতই শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে এরকম অসৎ ব্যবহারের দ্বারা মানুষের গ্রহণ সামর্থ্য কমে যায়, তবে এর জন্যে সময় লাগে—সঙ্গে সঙ্গেই ঘটেনা। তাই নিচের নয়, উর্ধ্বের শক্তিদের গ্রহণকরতে পারার জন্যে নিজেকে ভাল অবস্থায় রাখতে পারাটাই সব চেয়ে বেশী দরকার। তার পরের কাজ হলো, যখন তাদের গ্রহণ করতে পেরেছো, তখন তাদের সবচেয়ে ভাল উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে, এভাবেই তুমি উর্ধ্বের শক্তিদের গ্রহণ করার উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারবে। কিন্তু তুমি যদি নিজেকে খুলে ধরে সেই শক্তিদের গ্রহণ করো, আর তারপরে পরিতুষ্ট হয়ে নিজেকে সাধারণ গতিবৃত্তির মধ্যে শিথিল করে দাও তাহলেই তুমি দরজাটি বন্ধ করে দিলে,আর সে শক্তি ফিরে আসে না।

প্রশ্ন : মানুষ কি তার গ্রহণ সামর্থ্যকেও বাড়াতে পারে?

শ্রীমা : কি করে আমরা বাড়াতে পারি? উন্নতিলাভ করতে করতে, প্রথমেই জানতে হবে কি ভাবে নিজেকে খুলে ধরতে হয়, তারপর খুব শান্তভাবে জানতে হবে, যে-শক্তিগুলিকে পাওয়া হয়েছে সেগুলিকে বাইরে ফেলে না দিয়ে সম্পূর্ণ নিজের করে নিতে হয়। জানা চাই কি ভাবে সেগুলিকে সম্পূর্ণ নিজের করে নিতে হয়।

তার মানেই হ'ল উন্নতির উপায় হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে সাধ্য অবস্থাকে ক্রমশঃ বাড়িয়ে চলা, পরিপাক করবার সময় দেওয়া—গ্রহণ করা ও পরিপাক করা—তারপর ব্যয় করা এবং কি ভাবে এই দুটির মধ্যে সমতা রক্ষা করে চলা যায় তা জানা, এবং একটির পর আর একটিকে ছন্দ বজায় রেখে চলতে পারা, যা হল তোমার নিজস্ব ব্যাপার। কখনও নিজের

সামর্থ্যের বেশী করতে যাবে না বা তার চেয়ে কমও যেন না হয়, কারণ বিশ্বপ্রাণ শক্তিগুলি এমন বস্তু নয় যাকে কঠিন বেড়ার মধ্যে আটকে রাখতে পারা যায়। তাদের ঘুরে ফিরে চলতে দিতে হবে। তাই তোমায় জানতে হবে কি ভাবে গ্রহণ করতে এবং সেই সঙ্গে কিভাবে খরচ করতে হয়, কিন্তু জানতে হবে কিভাবে গ্রহণ সামর্থ্যকে বাড়ান যায় যাতে আরও বেশী করে সেগুলিকে পাওয়া যায় এবং ব্যবহার করে খরচ করা যায়। ঠিক এ রকমটাই ঘটে থাকে, বিশেষ করে শিশুদের বেলায় খুবই স্বাভাবিকভাবে এমনটা ঘটে থাকে, যেমন আমি বলেছি, তারা আরম্ভ করে, খানিকটা চেষ্টা করে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন একটি শক্তিকে তারা লাভ করে নিজের করে নেয়, এবং তার কয়েকদিন পরে হয়তো দু'চার দশ দিন পরে, তারা পরিমাণে আরও বেশী ব্যয় করতে পারে, বছর খানেক পরে তারা আরও ঢের বেশী করতে পারে কারণ স্বাভাবিকভাবেই তারা পাওয়ার এবং ব্যয় করবার কাজ ক্রমান্বয়ে করে চলে, এইভাবেই তারা উন্নতির পথে এগিয়ে চলে। অবশ্য তারা এটা অচেতনভাবেই করে থাকে কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজটা কঠিন হয়ে ওঠে, যেমন তাদের বেড়ে ওঠার দিকটা বন্ধ হয়ে যায়, তার মানেই হ'ল বেড়ে ওঠার কালটা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু একে বাড়ান যায় একটা আভ্যন্তরীণ নিয়মানুবর্তিতার দ্বারা—সে উপায়টি তাকে নিজে খুঁজে পেতে হবে। এটি হবে তার নিজস্ব উপায়।

সাবিত্রী

রাজার যোগকথা (৩)

অনির্বাণ

রাজা অশ্বপতি কৃত, পয়গম্বর, মহাশক্তি তাঁকেই মানবজাতির প্রতিভূ রূপে বেছে বরণ করে নিয়েছেন এবং যখন সময় হয় তিনিই উদ্দীপ্ত করে দেন। তখন ওই অপ্রাকৃত জগত হতে শক্তির অবতরণ ঘটে, শক্তিপাত হয়। ঈশ্বর-কোটিতে ঈশ্বরের আবেশে বিভূতি নামে, প্রকাশ হয়। জীবকোটিও তখন তা থেকে বঞ্চিত হয় না, অঘটনও ঘটে, আবেশে অনির্বচনীয়ের প্রকাশ তারাও অনুভব করতে পারে। Stone calm stillness যেন আধারে ভর করে, নেমে আসে। এইভাবে সেই জমাট নীরবতা বা শান্তির আভাস দেওয়া হয়েছে। দেহ পাষাণের মত স্থির অনড় হয়ে যায়, এই হল ভিত্তি। সেই অপৌরুষেয় সত্তায় প্রজ্ঞাশক্তি যেন পুচও বিপ্লব নিয়ে আসে।

চৈত্যসত্তার জাগরণে স্বরূপের আভাসে ধ্রুবাস্মৃতির উদয় হয়—সেই তো নিত্যসত্তার আবির্ভাব—বেদনা ও স্মৃতি জেগে ওঠে, হারানোর কান্নার ব্যাকুলতা হৃদয় মথিত করে দেয়। অন্তর্যামী পুরুষ সাক্ষীচৈতন্য—এই পুরুষের জ্ঞান লাভ হয়, এবং প্রকৃতিকে তটস্থ হয়ে দেখে পুরুষ তার কবলমুক্ত হতে পারে। প্রাকৃত চেতনায় প্রকৃতিকে প্রথমে বহির্দৃষ্টিতেই দেখা হয়। দৃষ্টি অন্তর্মুখী হলে তখন গভীরে অন্তরালের দৃষ্টি খুলে যায়। এই অধিচেতনার জ্ঞান না হলে প্রকৃতি-পুরুষের অন্তর্মুখী দৃষ্টি খোলে না। কেননা অধিচেতনার বোধ সব ভূমিতে অনুস্যূত থাকলেও মানুষের প্রাকৃত দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ বহির্মুখী অথচ জিজ্ঞাসা প্রবল হয়। তাই সেই অবিদ্যাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে এই অধিচেতনার (Subliminal Consciousness) পরিচয় পাওয়া কঠিন।

কিন্তু অন্তরে যখন অভীপ্সার আগুন জ্বলে ওঠে তখনই জীবনের চাওয়ার ও জিজ্ঞাসার অর্থ বোঝা যায়। ওপারের এক তীব্র আকর্ষণ, যেন সুদূরের ডাক, শোনা যায়। আর তখনই খোঁজা শুরু হয়ে যায়। বৃহতের জন্য ভূমার জন্য এই আস্পৃহা থেকেই চেতনার উদারতা দেখা দেয়, অল্প-দৃষ্টির মুক্তি ঘটে অখণ্ড ভূমায়। এই যে ব্যাকুলতা, এর একটা বিশ্বজনীন রূপ রয়েছে—যাকে বলি পৃথিবী মাতা। তিনি দেবী, বৈদিক ঋষিরা এই মৃন্ময়ী পৃথিবীকেই চিন্ময়ী রূপে দর্শন করেছেন। অপরূপা এই মাটির মা আমাদের। আদিতে ইনিই হিরণ্যবক্ষা অদিতি। এই ভূমি আমাদের মাতা! আমি এই পৃথিবীর পুত্র! এই রকম করে ভাবনায় ব্যক্তিচেতনার কুণ্ডলী যদি পার্থিব ব্যাপ্তি-চেতনায় ছড়িয়ে দেওয়া যায় চেতনার পার্থিব সত্তারই বিভূতিরূপে, তখন দেখব সবটাই জমাট বেঁধে রয়েছে সেই কুণ্ডলীতে মহাবিন্দুরূপে। মহাকুণ্ডলিনী শক্তি মহামায়াই অচেতনের মধ্যে প্রবেগ কুণ্ডলিত করে দিয়েছেন, তাই তার জাগরণে প্রকাশের ক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। এই দেবী পৃথিবী তাঁরই প্রকৃতি, যিনি পরমপুরুষ। দ্যাবা-পৃথিবী এক মিথুন। তাই এই পৃথিবীতে তাঁরই দিব্যসঙ্কল্প রূপায়িত হয়ে চলেছে আর তারই প্রকাশ হয় বাক্ রূপে Word, Logos

শব্দব্রহ্ম এই সব নাম তাঁর ঐ স্ফুরত্তা নির্দেশ করে। ব্যাহৃতি বা মহাশক্তির স্ফুরণে চৈতন্যের ভূমি পরিস্ফুট হয়, মূলে অতীন্দ্রিয় চিৎশক্তিরই প্রচোদনা। পরাবাক্ প্রকাশিত হয় পশ্যন্তী মধ্যমা ও বৈখরী রূপে—এই হল সৃষ্টি। বাক্ শক্তি মূল, পৃথিবীর সৃষ্টি-রহস্য সেখানেই। পৃথিবীর অন্তর্যামী পুরুষের নিত্যসঙ্গী বাক্, তাঁরই সঙ্কল্পশক্তি। পৃথিবী তপস্যা করে চলেছেন সেই সঙ্কল্পকে রূপায়িত করতে, চিরঅভিসারিণী যেন তিনি বধূর বেশে চলেছেন নিত্য-স্বয়ম্বরা। এই পৃথিবীর নিয়তি তার চিন্ময় রূপান্তর। একদিকে যেমন দেখি মৃত্যু (Fate) পৃথিবীতে নিয়তি, তেমনই আবার নিয়তির নির্দিষ্ট লক্ষ্য অমৃত হওয়ার। আর সেই পথেই মৃন্ময়ী পৃথিবীর অন্তর তপস্যা (inward urge)। সেই মূক পৃথিবী হয়তো বোঝে না কিন্তু প্রবেগ রয়েছে। আমাদের চাঞ্চল্য, বেদনার মধ্য দিয়েই সেই প্রবেগ ওই নগ্নতী লক্ষ্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তাই চাই শ্রদ্ধা (faith) 'অনির্বিণ্ণ চেতনা' শ্রদ্ধার অনির্বাণ দ্যুতি। অন্ধনিয়তি মৃত্যুর দিকে নিয়ে চলেছে, এর চেয়ে গভীর যে সত্যসঙ্কল্পের নিয়তি, আলোর দিকে অভ্যারোহণ, অমৃতের জয় হবেই—এই হল শ্রদ্ধার সঙ্কল্প শক্তি। এই বিশ্বাস নিয়ে চলে নরপৃথিবীতে অমৃতের তপস্যা। তাই তো প্রকৃতির প্রেম মৃত্যুহীন। সে চাইছে তার প্রেম মৃত্যুঞ্জয় হবেই—এই তার আকূতি।

আমাদের মধ্যেও তাই আসে সুদূরের হাতছানি। অন্ধকার আড়াল করে চারিদিক ঘিরে ধরে, তবু আমরা আশা ছাড়তে পারি না। এই আশা আমাদের সত্য ধর্ম। যে সত্যকে প্রাণ দিয়ে চাই, সেগুলি বিদ্যুৎ-চমকের মত উদ্ভাসে চেতনার দিগন্তে দেখা দিয়ে ভরসা দিয়ে মিলিয়ে যায়, rare intimation comes as guide। এই ভাবে ঝলক দিতে দিতে সেটা জমাট বাঁধবে, তখন বলা হয় দর্শন (vision), চেতনাকে ভরে দেয় অমৃতের স্বাদে। সাধনার এই পর্বে আমাদের প্রাণে যেন সিদ্ধি সম্বন্ধে নিঃসংশয় আগুন জ্বলে ওঠে এবং দেবতাকে বলতে পারি, যা চেয়েছি তা তুমি দেবেই। এই আশ্বাস পাওয়া যায়।

দিব্যজন, যার মধ্যে কোনও বিভ্রমের ছায়া নেই, তার মধ্যেই দিব্যসঙ্কল্প পরিস্ফুট হয়। অন্তরাত্মার দেবতা (soul) প্রকৃতি-পুরুষের মিলনে অন্তর্যামী দেবতা তিনি। তারই দুর্ধর্ষ প্রবেগ, তা বল চায়, আনন্দ চায় যার মধ্যে বিশ্রুণ নেই, তা হবে শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ। ব্যক্তির চেতনায় সিদ্ধিরূপে যে আবির্ভাব, তাকে যে পর্যন্ত পার্থিব চেতনায় সিদ্ধ করা না যায়, ততদিন তো পৃথিবীতে আমাদের জীবনে বেদনার শেষ নেই।

প্রাকৃত চেতনায় আভাস পাই কিন্তু বোধিদৃষ্টিতে বোঝা যায়, এই বেদনার একটা লক্ষ্য আছে। বহির্দৃষ্টিতে অব্যক্ত রহস্য খানিকটা ধরা পড়লেও তাকে বুঝতে পারা সম্ভবপর হয় না, তাই কবি বলছেন, deep necessity of the soul। পুরুষের সেই আত্ম-তর্পনের প্রয়োজন। যা কিছু ঘটছে তা চৈতন্যে প্রতিফলিত হয়ে চৈতন্য বৃহৎ হয়ে ওঠে, এই হল অন্বেষণের (quest) তাৎপর্য। জগতে আমরা যা খুঁজি, তার সঙ্গে এক হয়ে যাই। জগতের সঙ্গে এক হয়ে সর্বময় হয়ে যাওয়া, চেতনার এই বিস্ফোরণই necessity of the soul। অন্তরে ডুব দিতে হবে, তবেই এটি মেলানো যাবে। ব্যষ্টিচৈতন্য বিস্ফারিত হবে ব্রহ্মচৈতন্যে। এই রূপান্তর ঘটলে আর সেই mighty process of the Cosmic Will দেখে তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারলে পরে মহাজীবনের অর্থ আবিষ্কৃত হয়, সব প্রশ্নের উত্তর বা সব সমস্যার সমাধান সবই এই পথে পাওয়া যায়।

কিন্তু প্রাকৃত জীবনে বিজ্ঞানের দর্শনের (Philosophy) পথে চলা যেন হাতড়ে হাতড়ে চলা। অন্তরাবৃত্ত হলে তবেই খোঁজা ও বোঝা ঠিক পথে চলে।

Our eyes are fixed on an external sense;
We hear the crash of the wheels of Circumstance
And wonder at the hidden cause of things
Yet a foreseeing knowledge might be ours
If we could take our spirit's stand within
If we could hear the muffled daemon voice.

এইবার আসে এক দিব্যদৃষ্টির কথা। যাঁরা masters of the living; তাঁদের কাছে সব কিছু স্পষ্ট। পৃথিবীর সেই দিব্যনিয়তির রূপ তাঁরা দেখেন (Fate, Chance, Will) দেশ কালের সীমা ছাড়িয়ে তা দিব্য ভাবনাকে রূপায়িত করছে। তাঁরা ওই ভাবনার সঙ্গে বা দর্শনের (might) সঙ্গে যা কিনা ওই দৃষ্টিকে রূপায়িত করবে তাকেও দেখতে পান শক্তি বলে, তাঁদের কাছে সব বাস্তবের মতই প্রত্যক্ষ। তাই তাঁরাই হলেন স্রষ্টা, নতুন লোক সৃষ্টি করেন। অদৃশ্য অশ্বারোহীর অশ্বক্ষুরের শব্দের জন্য তাঁরা কান পেতে থাকেন। দিব্য নিয়তি (far Destiny) সম্বন্ধে তারা এতই সুনিশ্চিত যে, সেই আগমনীর প্রতীক্ষায় তাঁদের ধ্যানের গভীরে সমাধিতে প্রকাশ পায় ওই বাণী, যা ভবিষ্যৎকে রূপ দেয়, Prophet-speech, Thought, Word— পরমের সেই রূপ। আনন্দরূপে অভিব্যক্ত হবে, পরমের সেই প্রকাশ।

সে আসে ধীরে ধীরে চুপি চুপি, যেন গভীর নিশীথে চোরের মত নিঃশব্দে... আমাদের আত্মাদৃঢ় হলে সেই লোকোত্তর আবেশে সেই বাক্ শুনতে পাব, যা কানে শোনা যায়না। তখন এই মনের রূপান্তর ঘটবে, অপরূপ মাধুর্যের দ্বার খুলে এই পৃথিবীকে জোর করে তা অধিকার করবে। সেই সত্যের জ্যোতি সহসা প্রকৃতির মধ্যে ঊর্ধ্বাচিত হবে Earth grows unexpectedly divine। পরম পুরুষ যখন এইভাবে চুপিচুপি এসে হৃদয়কে অধিকার করে জড়িয়ে ধরেন, তখন এমনি করেই দেহচেতনা পর্যন্ত জ্বলে ওঠে। দেহের প্রতি অণু দেবতার আবির্ভাবে আবিষ্ট হয়ে যেন ভরে যায়—"অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায়..."। আবার সেই দিব্য মিলনের রাত্রি আসবে। কিন্তু সেই দিন হবে অপরূপ তীর্থের সরণি, রাত হবে তারাভরা নৈঃশব্দের বাহন। চিন্তা হবে সৌরকরোজ্জ্বল সৌরবিম্ব। অন্তরের এই সত্য প্রত্যক্ষ হবে যখন, তখন এই দেহেরও চিন্ময় রূপান্তর ঘটবে। আত্মা ও তনু এক হয়ে যাবে।

মানুষের মধ্যে রয়েছে একদিকে উত্তরণের ঐ আলোর সরণি, অপরদিকে গভীর অন্ধকার। তাই বিশ্বরহস্যের মীমাংসা নানা বিকল্প ধরে দেখা দেয়। এই মনের সমাধান সেজন্য সম্পূর্ণ হতে পারে না। লোকোত্তরের শান্তি ও জ্যোতির সঙ্গে সংসারের আবর্তনকে মিলিয়ে না দেখতে পারা পর্যন্ত শান্তি মিলবে না, তাই থামাও চলে না। ওই দুটি বিয়োগে রয়েছে, যোগে আনতে হবে। দুয়ের মধ্যে সেতু সেই পরাবাক্, দিব্য সঙ্কল্পশক্তির বাহন।

ভাবকে বাণীরূপ দিতে না পারলে তা সার্থক হয় না।—সাবিত্রী-কাব্যের এই ব্যঞ্জনা বারবার শোনা যায়। অবিদ্যাচ্ছন্ন মন ও সিদ্ধ শক্তির মধ্যে সেতু হয়েছে বাক্‌রূপে অগ্নির শক্তি, Love, Spirit, Power। কৈবল্যে প্রতিষ্ঠা থেকেই শক্তির বিচ্ছুরণ ঘটে। ওষধিত নিরোধ যোগে রাজা অশ্বপতির মধ্যে প্রথম জাগল Will যাতে অভীপ্সার তীব্র সংবেগ জেগে উঠল। এই অভীপ্সা সিদ্ধ; শ্রদ্ধার আবেগে নচিকেতার যে অভীপ্সার আগুন জ্বলেছিল, এ যেন তাকেও ছাপিয়ে যায়। কেননা রাজার যোগে পৃথিবীর তপস্যা করতে হবে, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তা যুক্ত। তাঁর দৃষ্টি খুলে গেছে। superhuman form এক অনির্বচনীয় তনিমা, এ যে পরমেরই পৌরুষের সত্তা, কল্যাণতনু রূপ তাঁর প্রত্যক্ষ গোচর, চেতনার উৎক্রান্তি, তাঁর যোগে। উত্তুঙ্গের সেই আহ্বানে তাঁর বোধ কৃতকৃতার্থ, আবার সেখান থেকেই মহাজীবনের আহ্বান। বৈরাগ্য ও করুণার সমন্বয়ে তার পৃথিবী-শরীর গঠিত, যা কিনা প্রতি রূপেই রূপ ধরেছে। বৈরাগ্যের রং যেমন চেতনাকে উৎক্ষিপ্ত করে অসীমের দিকে নিয়ে যায়। তেমন সেই শক্তিকে না জানলে আবার মুক্তি নেই। সেই শক্তিকে অনুভব করার অনেক স্তর—দুই প্রান্তের একদিকে এক পরম পুরুষ অক্ষয় অনন্ত জ্যোতি, চিৎপুরুষ আর অপর প্রান্তে জড় মূক এই মাটির পৃথিবী —এরই মধ্যে চলে শক্তির খেলা, ওঠা নামা, দীপনী। আমাদের চেতনার সঙ্কোচে কত বাধা।

রাজা তাঁর নিরোধ যোগে শক্তি-অনুভবগম্য নিজের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁর স্বধাম দেখলেন। নিরুদ্ধ ভূমির যোগের সার্থকতা এখানেই। প্রগাঢ় শক্তিকে নিজের মধ্যে অনুভব করা, যেন তা দেবতা ভরে দিয়েছে। সেই শক্তির বিকীরণ ঘটাতে হবে। শক্তির 'বশী' হলেই তো এই বিকীরণ সম্ভব। এ শক্তি ঈশ্বরের স্বীয়া শক্তি, ব্রহ্মের মায়া, পুরুষের প্রকৃতি! আত্মতত্ত্বকে সামান্যরূপে জানা (যদাত্মা সর্বভূতাত্মা) আর শক্তিকে নিজেরই স্বরূপে জানা পরমার্থ

A sleeping deity opened deathless eyes, সেই দ্যুলোকের আততচক্ষু অমৃতনয়ন খুলে গেল। In the Void he saw throned the Omniscient Supreme.

অশ্বপতির এই চৈতন্যকে বলা যায় মহানাত্মা। জ্ঞানাত্মায় তাঁর স্বধা বা আত্মস্থিতি আর মহান আত্মায় ত্রিভুবন ফুটে ওঠে। যেমন বলা হয় লোক আর তারপরেও আছে লোকোত্তর। অশ্বপতির মধ্যে প্রকৃতি উন্মীষন্তু হয়ে চলেছে ফুল ফোটানোর মত। ফুল ফোটানোর মতই চৈতন্য করে দিয়ে চলেছেন সবাকার মধ্যেও। তাঁর প্রকৃতি পরা প্রকৃতি, তিনি ঈশ্বরী।

(অনির্বাণের ভাষণ অবলম্বনে সুধা বসু)

মায়ের লেখা—মায়ের কথা

দেহের শিক্ষা

অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীমায়ের সাধিক শিক্ষার পাঁচটি দিক। মানুষের প্রধান ক্রিয়াকলাপ পাঁচটি: দেহ, প্রাণ, মন, চৈত্য এবং অধ্যাত্ম। সাধারণতঃ শিক্ষার এই পর্বগুলি একের পর এক গ্রহণ করা যায় ব্যক্তির বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। তবে তার মানে এই নয় যে একটি শিক্ষা-পর্ব অন্য একটির বদলে প্রযোজ্য, বরং একটি পর্ব অন্যটিকে পূর্ণ করে চলবে। সব কয়টি একসঙ্গে চলবে জীবনের শেষ পর্যন্ত।

মায়ের দেওয়া পঞ্চপর্ব শিক্ষার পদ্ধতি কি? একটির সঙ্গে অন্যটির সম্বন্ধই বা কি—তারই অবতারণা করব ক্রমে ক্রমে।

যে মানুষ ভূমিষ্ঠ হল, তার হাতেখড়ি কবে? কোথায় শুরু? কোথায় এবং কবে শিক্ষার শেষ? স্বতঃস্ফূর্ত উত্তর দিই: 'জন্ম থেকেই আরম্ভ, চলবে শেষ দিনটি পর্যন্ত।' শিক্ষার ফসল যদি গোলাভরে তোলার বাসনা থাকে তবে মায়ের মতে সে শিক্ষার আরম্ভ জন্মের আগে মাতৃগর্ভে। সে শিক্ষার হাতেখড়ি দেবেন কে না জননী নিজে। এ ভার তাঁরই। জননীর উপর ভার থাকবে দুটি। জননীর প্রথম শিক্ষা নিজেকে নিয়ে, নিজের উন্নতির জন্য। দ্বিতীয়টি, যে সন্তানের সৃষ্টির ভার তিনি নিয়েছেন তার জন্য। একটি কথা প্রায় সবাই জানেন যে, যে শিশু ভূমিষ্ঠ হবে তার প্রকৃতি অনেকখানি নির্ভর করে, কি রূপ সন্তানকে দিতে চেয়েছিলেন জননী। অনেক কিছু নির্ভর করে জননীর আশ্পৃহার উপর, সংকল্পের উপর এবং যে জাগতিক পরিবেশে থাকেন তিনি তার উপর। তাই জননী চান তাঁর চিন্তা থাকুক পবিত্র-সুন্দর, অনুভূতি হোক উদার, জাগতিক পরিবেশে থাকুক যথা-সম্ভব সুসামঞ্জস্য। থাকুক থই থই লক্ষ্মীশ্রী, ছিবছাম সারল্য। এই অংশটুকু তাঁর নিজস্ব দায়িত্ব। এবার মা বলছেন "if she has in addition a conscious and definite will to form the child according to the highest ideal she can conceive, then the very best conditions will be realised so that the child can come into the world with his utmost potentialities"[1]. অর্থাৎ এর উপর জননীর যদি একটি সচেতন এবং স্পষ্ট সংকল্প থাকে সন্তানকে তাঁর নিজ কল্পনার সর্বোত্তম আদর্শের অনুকরণে তৈরি করার, তবে সব থেকে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হবে যাতে শিশু ভূমিষ্ঠ হতে পারে তার সর্বোচ্চ সম্ভাবনা নিয়ে।

মা এবার সাধারণভাবে জন্মদাতাদের উদ্দেশ্যে বলছেন যে নানা কারণে পিতামাতা সন্তানের সত্যকার শিক্ষা কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে খুব কমই ভাবেন।

কথাটি শুনেই প্রশ্ন জাগে: "এ কি কথা তুমি বললে মা?" আজকের শিক্ষিত মায়েদের দেখনি, শিশুর প্রতি কত তাদের সজাগ দৃষ্টি, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, হাইজিনিক উপায় সবই

তাঁদের রপ্ত। শিশুর আহারের ব্যাপারে কত সচেতন আজকালকার পিতামাতা। তারপর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ভাল স্কুল যদিবা কপালে জুটল তাও কি শান্তি আছে। স্কুলে পাঠ সম্পূর্ণ হয়না যে! তাইত পিতামাতাকে বাড়িতে, দরকার পড়লে সব কিছু ফেলে রেখে, ছেলেমেয়ের পড়ায় সাহায্য করতে হয়। মাকে বলতে ইচ্ছে করে, "দেখনি কি সন্তানের পরীক্ষার 'টেনশন' তার মাকে কতখানি বইতে হয়? তারপর যদি পরীক্ষায় ভাল ফল না করল তবে কতখানি তাঁকে সইতে হয় ভাল-ছেলে-মেয়েওয়ালা পড়শী মায়ের অহঙ্কার? আজকের শিক্ষিত পিতামাতা জানেন যে সন্তানকে পৃথিবীতে এনে, কেবল অন্নদান করে, তার জাগতিক প্রয়োজন মিটিয়ে, তার স্বাস্থ্যের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেই দায়িত্ব শেষ হয় না। তাঁরা জানেন যে সন্তানকে ভাল করে শিক্ষিত করতে হবে এবং তার জন্য যথা সম্ভব চেষ্টা করেন।"

মা বলছেন, যারা সন্তানের শিক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত সিরিয়াস তাদের মধ্যে খুব কমই আছেন যারা জানেন যে, শিশুকে শিক্ষা দিতে বসে প্রথম কাজটি হল নিজেকে শিক্ষা দেওয়া। পিতামাতাদের শিক্ষিত করতে হবে, নিজেদের সচেতন করে তুলতে হবে নিজেদের সম্বন্ধে। নিজেদের উপর কর্তৃত্ব আনতে হবে যাতে শিশুর সামনে কখনও অপ্রিয় উদাহরণ উপস্থিত করতে না হয়।

এবার আমি পুরোপুরি জব্দ। নিজের দিকে ঘুরে যখন জিজ্ঞাসা করি, 'আমার সন্তান-দের গড়ে তোলার সময় মায়ের কথা কি পালন করেছিলাম?" সর্বসমক্ষে স্বীকারোক্তি এড়িয়ে যেতে পারলেও, নিজের কাছে জবাবদিহি বাকী রয়ে গেছে।

শিক্ষাকে কার্যকরী করতে হলে সব থেকে বড় কথা হল উদাহরণ। শিশুকে ভাল কথা বললে, ভাল উপদেশ দিলেই কাজ হবে না যদিনা সেই ভাল কথার, ভাল উপদেশগুলির প্রতিফলন শিশু না দেখতে পায় শিক্ষকের মধ্যে। সততা, অকপটতা, সাহস, কৌতূহল-শূন্যতা, নিঃস্বার্থতা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায়, শান্তি, নীরবতা, সংযম ইত্যাদি গুণগুলি, মা বলছেন, উপদেশের থেকে উদাহরণে বেশি শেখান যায়। "উচ্চ আদর্শ" থাকলে দেখতে দেখতে শিশুর মধ্যেও হবে তার প্রতিফলন, স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেগুলি ফুটে উঠবে শিশুর প্রকৃতিতে, স্বভাবে। শিশুর কাছে পিতামাতা যে দেবতুল্য; তারা যা দেখাবে তাই অনুকরণ করবে।

মা বলছেন খুব কম মানুষই আছেন যাঁরা বুঝতে পারেন যে তাঁদের খুঁতগুলি, আবেগ-ময়তা, দুর্বলতা, আত্মসংযমের অভাব কতখানি ক্ষতিকর প্রভাব আনতে পারে সন্তানের উপর। বলছেন, "যদি চাও শিশু তোমায় শ্রদ্ধা করুক, তবে নিজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও এবং প্রতি-মুহূর্তে সেই শ্রদ্ধার যোগ্য থেকো।"

মা বলছেন, শিশুদের ব্যাপারে কখনও "স্বৈরাচারী, অত্যাচারী, অধৈর্য এবং বদমেজাজী হয়োনা" যদি তোমার সন্তান তোমায় প্রশ্ন করে, তাকে বাজে, অবান্তর উত্তর দিও না এই অজুহাতে যে শিশু তোমার কথা বুঝবে না। শিশু সব সময়েই তোমার কথা বুঝতে পারবে যদি যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়। লোকে বলে শিশুকে সব সময় নির্জলা সত্য বলার প্রয়োজন নেই। মা কিন্তু বলছেন, 'I insist' সব সময়েই সত্যটি তাকে বলা উচিত। কেমন ভাবে সত্যটি শিশুর সামনে রাখা হচ্ছে, তার উপরেই নির্ভর করছে কৃতিত্ব।

শিশুকে এমনভাবে সত্যের সঙ্গে পরিচয় করাতে হবে যাতে সে সহজে বুঝতে পারে। মা বলছেন, বার বা চৌদ্দ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত শিশুর মন abstract idea বা বিমূর্ত ধারণা অথবা general ideaর দিকে ঘোরে না। তবু তাকে শেখাবার উপায় আছে। তাদের শেখান যায় উপমা দিয়ে, প্রতীকের সাহায্যে অথবা রূপক কাহিনী দিয়ে। বেশ কিছু বয়স পর্যন্ত এইভাবে শিক্ষা চলতে পারে।

আর একটি ফাঁদ এড়িয়ে চলার কথা বলছেন। বলছেন, নেহাৎ প্রয়োজন না হলে তোমার শিশু সন্তানকে ধমকধামক দিওনা। বেশী বকাবকিতে সে যায় বিগড়ে, তখন সে আর কড়া কথা, উঁচুগলা, কোন কিছুরই তোয়াক্কা করেনা। সর্বোপরি যে ভুল তুমি নিজে কর সেই ভুলের জন্য তাকে বকুনি দিওনা কখনও। শিশুরা অতি তীক্ষ্ণ, বিচক্ষণ পর্যবেক্ষক, তারা তোমার দুর্বলতাটি ধরে ফেলবে—মনে রাখবে নির্মমভাবে। শিশু যদি ভুল করে, দেখো যাতে সে তোমার কাছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং অকপটে স্বীকার করতে পারে। যখন সে স্বীকার করল তাকে সযত্নে ভালবেসে বুঝিয়ে দিতে হবে কোথায় সে ভুল করেছে, যাতে তার পুনরাবৃত্তি না করে সে। স্বীকার করার পর তাকে আর বকবে না। স্বীকার করা ভুল ভুলে যেতে হবে। দেখো যেন তুমি আর তোমার সন্তানের মাঝখানটিতে ভয়ের দেওয়াল না দাঁড়ায়। ওরে বড় ক্ষতিকর শিক্ষা পদ্ধতি। ভয় দেখালে অনিবার্য ভাবে আসবে ছলনা, মিথ্যা। একটি সজাগ-সদয় ভালবাসা চাই যা প্রয়োজনে শক্ত অথচ নরম, আর চাই যথেষ্ট ব্যবহারিক জ্ঞান যা অপরিহার্যভাবে গড়ে তুলবে আস্থার সেতু যা শিশুর শিক্ষাকে করবে ফলপ্রসূ। মা বলছেন, আর একটি কথা ভুললে চলবে না যে তোমাকে নিজের 'পরে নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে, ক্রমাগত তোমার দায়িত্বের সমতুল্য হতে। সে দায়িত্ব পালন করতে হবে, কারণ তুমি যে তা করতে বাধ্য কেবল একটি কারণে; সেটি হল, শিশুটিকে তুমি এনেছিলে এই পৃথিবীতে সেই দায়িত্বে।

এবার আসি দেহের শিক্ষায়।

মানব চেতনার রাজ্যগুলির মধ্যে, মা বলছেন, দেহই হল একটি চেতনা যা মানে নিয়ম শৃঙ্খলা, অনুশাসনও পরোয়ানা। জড়ের অনমনীয়তা এবং গ্রহণইচ্ছায় অনীহা বদলে দিতে হবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আয়োজিত সংগঠনে যা প্রয়োজনে হবে যথাযথ, হবে ব্যাপক। এই সংগঠনের কাজে হাত লাগিয়ে মনে রাখতে হবে যে দেহ স্বাধীন নয়। অন্য চেতনার দরবারে তাকে হাজরি দিতে হয়—যেমন মন এবং প্রাণ। অন্যদিকে মন ও প্রাণেরও অবারিত দ্বার দেহে। বিশেষভাবে স্মরণ রাখার প্রয়োজন কি না মনের বা প্রাণের এলাকা থেকে একটি ঢেউ যদি ওঠে, সেটিকে বলতে হবে, 'ঐ যে খাল কেটে দিয়েছি, যাও বয়ে যাও সেই খাল বয়ে।' তাকে পরোয়ানা দিতে হবে নির্ধারিত প্রণালীর কাছে মাথা নোয়াতে। তাই মা বলছেন, দেহের শিক্ষা যদি কার্যকরী করতে চাও তবে তাকে কঠোর বিধানে বাঁধতে হবে। সে বিধান হবে পুঙ্খানুপুঙ্খ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং নিয়মানুগ। দেখতে দেখতে অভ্যাস হয়ে যাবে। দেহ যে অভ্যাসের বশ। এবং সে অভ্যাস থাকা চাই নিজের বশে। সেই অভ্যাস থাকবে আমার নিয়ন্ত্রণে। আমার দেওয়া অনুশাসন যেন যথেষ্ট মাত্রায় সহজবশ্য থাকবে সেটি, যেন যে-কোন পরিবেশে সে-অভ্যাস নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। মা বলছেন, দেহের সহজ-নম্রতা চাই সত্তার গড়ে ওঠা উন্নতির প্রয়োজনে।

মা বলছেন, দেহকে শেখাতে হবে জন্মের থেকে এবং শিক্ষা চলবে সারা জীবন। এখনও শিক্ষা আরম্ভের বয়স হয়নি কিংবা বড় দেরী হয়ে গেছে, এ ধারণা অপ্রয়োজনীয়।

দেহের শিক্ষার তিনটি দিক।

প্রথম : দেহের ক্রিয়াকর্মগুলিকে নিয়ন্ত্রণ ও অনুশাসনের আওতায় আনতে হবে।

দ্বিতীয় : দেহের সবকটি অঙ্গের এবং গতিভঙ্গিগুলির একটি নিয়ন মানা, সঙ্গতিময় সাবিক উন্নতি।

তৃতীয় : দেহের কোন ত্রুটির অগঠন বা কুগঠনের সংস্কার।

মা বলেছেন শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষার প্রথম পাঠ আরম্ভ। প্রথম পাঠটি হল খাওয়া, ঘুম এবং প্রাতঃকৃত্যাদি। শিশুর খাওয়ার ব্যাপারটিই ধরা যাক। ইদানীং অনেক মায়ের কথা শুনি, শিশুসন্তানকে খাওয়ার নিয়ে তাঁদের কত কসরৎ করতে হয়। বাচ্ছা সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে, পুরো এক ঘন্টা ধরে ছোট্ট একবাটি ভাত খায়। খাওয়ানোর সময় মায়ের রূপকথার গল্পের ঝুলি উপুড় হয়ে যায়। তারপর হুলো বেড়াল, বাঘ-ভাল্লুক, রাক্কস-খোক্কস এসেও যখন তাল পায়না তখন নিরুপায় মা কৃত্রিম রাগে চোখ রাঙ্গিয়ে বাথরুমে বন্ধ করে দেবার ভয় দেখিয়ে শেষ গরাসটি ছেলের মুখে গুঁজে দেন।

মা বলছেন, শিশু যদি গোড়া থেকেই ভাল অভ্যাসগুলি শেখে, তাতে দুটি লাভ। প্রথম ভাল অভ্যাসগুলির জন্য ভবিষ্যৎ জীবনে অনেক বাধা অসুবিধা থেকে সে থাকবে মুক্ত। অন্যটি শিশুর লালনপালনের ভার যাঁদের উপর তাঁদের কাজে অনেক সুবিধে হবে।

মা বলছেন, যদি আমরা চাই শিশুর শিক্ষা rational কুসংস্কারমুক্ত, প্রবুদ্ধ এবং ফলপ্রসূ হোক তবে সে শিক্ষার বুনিয়াদে থাকা চাই মানব শরীর সম্বন্ধে ন্যূনতম জ্ঞান। দেহের কাঠান-গঠন কি? এই দেহযন্ত্রটির ভেতরকার সাজসরঞ্জাম, কলকব্জাগুলির কাজ-কর্ম সম্বন্ধে অন্তত ওয়াকিবহাল থাকতে বলছেন মা। কেননা শিশু যেমন যেমন বড় হতে থাকল তাকে যে ক্রমশ শিখিয়ে দিতে হবে তার নিজের শরীরের অভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির কাজকর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখতে। লক্ষ্য করা দরকার কেন না শিশুকে শেখাতে হবে যন্ত্রপাতির ক্রিয়াকলাপের উপর তার কনট্রোল আনতে এবং সেগুলিকে স্বাভাবিক ও সুসংহত রাখতে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে শারীরিক বদঅভ্যাস, যেমন বুদ্রাদোষ ইত্যাদি অল্প বয়স থেকেই বড় শীঘ্রই শিশুরা আয়ত্ত করে এবং পরের জীবনে বদ অভ্যাসগুলি কায়েমি হয়ে যায়। সেইজন্য, মা বলছেন শিশুর position, posture and movements গুলির প্রতিদৃষ্টি রাখলেই সহজে দোষত্রুটিগুলি নজরে পড়ার কথা এবং আজকাল নানা শিক্ষা-প্রণালীর সাহায্যে সেগুলিকে সংশোধন করা সম্ভব। এক ওষুধ সবার লাগেনা। প্রত্যেকটি সমস্যা ব্যক্তিগত এবং সমাধানও সেদিক চিন্তা করেই করা কর্তব্য।

শিশুর আহার সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হয়েছে। সাধারণতঃ জানা আছে কি ধরণের আহার বা diet শিশুর স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য উপকারী, তাই বেছে নিতে কোন মায়ের আজ-কাল অসুবিধা হয় না। তবে একটি কথা মা বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে বলছেন—তা হ'ল দেহের একটি সহজপ্রবৃত্তি আছে। যতক্ষণ সেই সহজপ্রবৃত্তিটি অক্ষত রইল ততক্ষণ সেই সহজপ্রবৃত্তির ইঙ্গিতই হবে যে কোন থিওরীর চেয়ে বেশি বিশ্বাসযোগ্য। তাই

"... those who want their child to develop normally should not force him to eat food which he finds distasteful, for most often the body possesses a sure instinct as to what is harmful to it, unless the child is particularly capricious."[2] যাঁরা চান তাঁদের শিশু স্বাভাবিকভাবে বড় হোক, তাঁরা যেন শিশুকে জোর করে সেই খাবারটি খাওয়াবেন না যা শিশুর অপছন্দ, কারণ দেহের এক অব্যর্থ সহজপ্রবৃত্তি আছে যার সাহায্যে সে চিনতে পারে কোনটি তার পক্ষে উপাদেয় নয়। মা বলছেন, কথাগুলি প্রযোজ্য যদি অবশ্য শিশুটি বিশেষভাবে খামখেয়ালি না হয়।

মা বলছেন, দেহের যখন স্বাভাবিক অবস্থা, অর্থাৎ যখন মনের ধারণাগুলি তাকে বাধা দেয়না, দেহের উপর যখন প্রাণিক আবেগের প্রচণ্ডতা থাকে না, তখন দেহ ইঙ্গিত করে কোনটি তার জন্য ভাল এবং প্রয়োজন। দেহের যে স্বাভাবিক অবস্থা বলে কিছু আছে তা অতি যত্ন সহকারে শিশুকে শেখাতে হবে। এটি শেখানোর একটিই উপায় আছে। মা বলছেন, শিশুকে বাছতে শেখাতে হবে কোনটি তার বাসনা এবং কিইবা তার প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে তার জিভ তৈরী করে দিতে হবে যাতে সে সাধাসিধা, স্বাস্থ্যকর, প্রয়োজনমত যথেষ্ট পরিমাণে, রুচিকর খাদ্যে তার আস্বাদ গড়ে উঠতে পারে। জিহ্বার জটিল চাহিদা থেকে সে যেন শিশু বয়স থেকে মুক্ত থাকে।

মা বলছেন, দেখো যেন শিশুর খাদ্যে, যা কেবল পেট ভরায় কিংবা পেটভারী করে, এমন কিছু না থাকে। তাকে শিখিও সে যেন খায় ঠিক ততখানি, যতখানি তার খিদে। বেশিও নয় কমও নয়। দেখ যেন ভোজন ব্যাপারটি শিশুর আকাঙ্খা তৃপ্তি এবং অতিভোজনের অনুষ্ঠান না হয়ে ওঠে। বলছেন, শিশুকাল থেকেই একজনের জানা দরকার খাওয়া দেহের শক্তি ও স্বাস্থ্যের জন্য, রসনা তৃপ্তির জন্য নয়।

শিশুর খাবার কেমন হবে? মা বলছেন, শিশুর খাদ্য যেন তার শরীর ও মনের গঠনগত প্রকৃতির অনুকূল হয়। খাবার তৈরী করার সময় নজর থাকে যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে। স্বাস্থ্যকরভাবে তৈরি হবে বটে, তবে খাবার হবে সুস্বাদু অথচ সাধাসিধা। শিশুর খাদ্য বাছাই করতে হবে এবং পরিমাণ ঠিক করতে হবে শিশুর বয়স এবং তার নিত্য-দিনের সক্রিয়তা, তৎপরতা, খেলাধুলার দিকে নজর রেখে। খাদ্যের মধ্যে থাকবে সব প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ। আর কি থাকবে? মা বলছেন, আর থাকবে "dynamic elements that are necessary for his development and balanced growth of every part of his body!" থাকবে সক্রিয় শক্তিসম্পন্ন পদার্থ—যা শিশুটির সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুষম রূপে গড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন।

মূল কথা দাঁড়াল যে, শিশুকে কেবল সেই খাবারই দিতে হবে যাতে আছে পুষ্টি, আছে যথেষ্ট শক্তি যা তার প্রয়োজন। এবার মা বলছেন, শিশুর খাদ্য তাকে শাসন করার বা শাস্তি দেবার উপায় হিসেবে কখনও ব্যবহার করা উচিত নয়। অনেকে শিশুকে সামলাতে না না পারলে বলে থাকেন, "আজ তুমি দুষ্টুমি করেছ, আজ তোমার খাওয়া বন্ধ।" মা বলছেন, এটি ভীষণ ক্ষতিকর। আমাদের ছেলেরা যখন ছোট ছিল কতদিন এই কাজ আমি নিজেই

করেছি। জানতাম না মায়ের কথা "In this way you create in his little consciousness the impression that food is given to him chiefly to satisfy his greed and not because it is indispensable for the proper functioning of his body"[3].

অর্থাৎ এইভাবে তুমি শিশুর ছোট্ট চেতনায় ধারণা করিয়ে দাও যে তাকে খেতে দেওয়া হয় প্রধানতঃ তার লোভ মেটাবার জন্য, তার দেহের জন্য অপরিহার্য বলে নয়।

আর এক অভ্যাস শিশুকে জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ধরিয়ে দেওয়া উচিত তা হল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকে ভালবাসা এবং স্বাস্থ্যকর অভ্যাসগুলি রপ্ত করা। তবে দেখতে হবে যে হাইজিনিক অভ্যাসগুলি শেখাতে গিয়ে তার মনে ভয় না ঢোকে যে এসব না করলে তার রোগ হবে। কারণ মা বলছেন, "Fear is the worst instrument of education and the surest way of attracting what is feared,"[4] ভয় হল শিক্ষার নিকৃষ্টতম উপায় এবং সেই অব্যর্থ পথে আকৃষ্ট হয় যাকে বা যেটিকে ভয় পাওয়া যায়। মা বলছেন, শিশুর মনে রোগের ভয় থাকা উচিত নয়, সেদিকে কোন ঝোঁকও যেন না থাকে। মা বলছেন "There is a prevalent belief that brilliant minds are found in weak bodies,"[5] একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে প্রতিভাদীপ্ত মানুষের দেহ দুর্বল হয়। এ ধারণা ভুল। এ ধারণা কোনদিন হয়তো ছিল কিন্তু এখন সুগঠিত, স্বাস্থ্যসম্পন্ন দেহের কদর হয়েছে। সে যাই হোক, শিশুকে শিক্ষা দেওয়া উচিত স্বাস্থ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে। অনেক সময় দেখা যায় যে শিশুরা রোগের বা অসুখের ভাণ করে তাদের অপছন্দ কিছু এড়াবার জন্য। যেমন ধরুন, আমি দেখেছি, অনেক শিশুর পড়ার নামে পেটব্যথা করে কিংবা তাদের খেলার মেটানোর জন্য পিতামাতার মন গলানোর উদ্দেশে রোগের ভাণ করে। যত শীঘ্র সম্ভব শিশুকে জানিয়ে দেওয়া উচিত যে এ সবে কাজ হবে না, এবং অসুস্থ থাকাটা কোন আকর্ষণীয় ব্যাপার নয় বরং উল্টোটাই ঠিক। দুর্বল শিশুর অনেক সময় ধারণা হয় যে দুর্বলতাটাই ভাল কারণ তার সাহায্যে সে আশেপাশের লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে, সহানুভূতি কুড়োতে পারে। মা বলছেন, কোনমতেই এই pernicious tendency অর্থাৎ অতীব ক্ষতিকর ঝোঁকটিকে আমল দেওয়া উচিত নয়। তাহলে শিশুকে কি শেখাব? মা বলছেন, শিশুকে শেখাতে হবে অসুস্থ হওয়া দুর্বলতার প্রমাণ। অসুস্থতা কোন গুণের বা ত্যাগের লক্ষণ নয়।

মা বলছেন, শিশু নিজের দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যবহার নিজে থেকে করতে শেখার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিদিন কিছু সময় রাখা উচিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উন্নতি চর্চার জন্য। ঘুম থেকে ওঠার পর প্রতিদিন ২০ থেকে ৩০ মিনিট সময় দেহের পেশী সজীব করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। গাঁটগুলি ও শিরদাঁড়া নমনীয় রাখার পক্ষে শৈশব থেকেই দেহ-চর্চার প্রয়োজন। শিশুশিক্ষা প্রোগ্রামের মধ্যে খেলাধূলার একটি বিশেষ স্থান থাকা উচিত, অনেক ওষুধের থেকে এইটুকু বেশি উপকারী। প্রতিদিন খানিকক্ষণ সময় খেলা করলে শিশুর দেহের সঙ্গে সঙ্গে মনেরও অনেক উন্নতি হয়। মা বলছেন, একঘন্টা খোলা হাওয়ায় আকাশের নীচে থাকলে অনেক দুর্বলতা এমন কি রক্তাল্পতা সারে, যা এক

কারখানা ভর্তি টনিকের থেকে ভাল ওষুধ। মা বলছেন, একেবারে অপারগ না হলে ওষুধ ব্যবহার না করতে।

কি রকম স্বাস্থ্যচর্চা করব সেটা কি ভাবে ঠিক করব? মা বলছেন, অনেক সুপরিচিত উপায় আছে যেগুলির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে, তবু শিশুটির জন্য কোনটি সব থেকে ভাল সেই সম্বন্ধে কোন বিশেষজ্ঞের মত নেওয়া যেতে পারে।

এবার শিশুর ঘুমের কথা বলছেন মা। আজকাল অনেক জায়গায় শুনতে পাই, ছেলের ঘুম বড় কম। দেখা যায় বেশ রাত পর্যন্ত ছেলেমেয়ে পিতামাতার পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে শুতে যাবে না যতক্ষণ না সবাই শোবে। মা বলছেন, শিশুর যথেষ্ট ঘুমের প্রয়োজন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সময়ের অদলবদল হয়। জন্মের পর কিছুদিন পর্যন্ত বাচ্চা যতক্ষণ জেগে থাকে তার থেকে বেশি ঘুমোয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই ঘুমের সময় কমবে। পূর্ণ বয়স্ক (maturity) না হওয়া পর্যন্ত আট ঘণ্টার কম কিছুতেই নয়। একটি শান্ত পরিবেশে আলোবাতাস আছে এমন ঘরই শিশুর পক্ষে ভাল। কোন কারণেই শিশুকে বেশি রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে দেওয়া উচিত নয়। কেন নয়? মা বলছেন, মধ্যরাত্রির আগের প্রহরগুলি স্নায়ুগুলির বিশ্রামের পক্ষে ভাল। এমন কি জাগ্রত সময়টির মধ্যেও তাঁরা অবশ্য জিরিয়ে নেবেন যাঁরা স্নায়ু বা নার্ভ সুস্থ রাখতে ইচ্ছুক, সেইজন্য শিশুকাল থেকেই কেমন করে পেশী ও নার্ভ শিথিল করতে হয় তাকে শেখানো উচিত। মা বলছেন, অনেক অভিভাবক বাচ্চাদের কিছু না কিছু কাজে সর্বদা ব্যস্ত রাখেন। ছেলে যদি চুপচাপ থাকে মনে করেন সে বুঝি অসুস্থ। এমন অভিভাবকও আছেন যাঁরা শিশুর যখন বিশ্রাম নেওয়ার কথা তখন তাকে দিয়ে কিছু না কিছু কাজ করান। যখন একটি শিশুর নার্ভাস সিস্টেম সবে গড়ে উঠছে সেই সময় কোন কিছুই বড় বেশি একঘেয়ে লাগাতার চাপ দেওয়া উচিত নয়, তা তার অপছন্দ। মা বলছেন, শিশুর কাছে সেবা আশা করা উচিত নয়। অভিভাবককে সেবা করা তার কর্তব্য নয় বরং মা বলছেন যে উল্টোটাই সত্য এবং স্বাভাবিক যে পিতামাতা শিশুর সেবা করবেন এবং যথেষ্ট যত্ন নেবেন। অবশ্য শিশু যদি কাজ করতে চায় নিজের থেকে এবং সেটি যদি সে খেলা হিসাবে গ্রহণ করে তবেই তা সঙ্গত, নয় তো নয়। সেখানেও দেখতে হবে যাতে শিশুর বিশ্রামের সময় কমে না যায়, যা তার দেহের জন্য একান্ত অপরিহার্য।

এতক্ষণ মা বললেন শিশুকে শেখাতে হবে তিনটি মূল সত্য

এক—ভাল স্বাস্থ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে;

দুই—দেহের শক্তিসঞ্চয়ের প্রয়োজনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে;

তিন—দেহের ভারসাম্য বা balance এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে।

এবার মা আর একটি যোগ করে দিচ্ছেন। সেটি হল সৌন্দর্যের প্রতি শ্রদ্ধা। শিশু সুন্দর হয়ে উঠতে চাইবে। সৌন্দর্যের আস্পৃহা জাগাতে হবে তার মধ্যে। সে সৌন্দর্য অন্যকে যাদু করার জন্য নয়, প্রশংসা কুড়াবার জন্য নয়, শুধু সৌন্দর্যকে ভালবাসার জন্য। তাকে শেখাতে হবে সৌন্দর্যের সাধনা। দীক্ষা দিতে হবে সৌন্দর্যের তপস্যায়। কারণ মা বলছেন, দেহসজ্জায় সিদ্ধি চাইবে কোন আদর্শে না—সৌন্দর্যের। মা বলছেন, প্রত্যেক মানুষের তার ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে সৌষম্য গড়ে তোলা সম্ভব। গড়ে তোলা সম্ভব

সৌষম্য তার দেহের গতিভঙ্গিতে, কাজে। যে দেহ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন পথে (rational method) শিক্ষিত হয়েছে জীবনের গোড়া থেকে তার নিজস্ব একটি সৌষম্য গড়ে উঠবে এবং সৌন্দর্য বিকাশের আধার হয়ে উঠবে। মায়ের সাত্ত্বিক শিক্ষার (integral education) অন্য দিকগুলি আলোচনা করলে দেখা যাবে অন্তরের কোন সর্তগুলি পরিপূর্ণ করলে একদিন, যে সৌন্দর্যের কথা মা বলেছেন, তা ফুটে উঠবে শরীরে।

মা বলছেন, এতক্ষণ কেবল শিশুর শিক্ষার কথাই বললাম। কিন্তু বড়দের বেলাতেও দেহের অনেক দোষ অনেক গঠনত্রুটি শুধরে নেওয়া যায়, যদি দেহকে প্রয়োজনমত শিক্ষা-ভ্যাস করান যায় ঠিক সময়মত। এবার মা বলছেন, যদি কোন কারণে শৈশবে বা এমন কি যৌবনে দেহচর্চা করা হয়ে ওঠেনি তবে তা যে কোন বয়সেই আরম্ভ করা যায় এবং সারা জীবন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব। তবে মা বলছেন, যত দেরীতে আরম্ভ করবে তত প্রস্তুত থাকতে হবে অনেক বদঅভ্যাস শোধরাতে, শক্ত দেহ নমনীয় করতে, যে সব গঠনত্রুটি কায়েমী হয়ে বসেছে তাদের সঙ্গে মানিয়া করতে। এই প্রস্তুতির কাজে চাই প্রচুর ধৈর্য এবং অধ্যবসায়, কারণ দেহকে যে কানে কানে রোজ কেউ ফুসলাবে 'আজ থাক' ও সব exercise কাল হবে, আজ সময় নেই, ইত্যাদি নানা অছুহাতে। এই প্রস্তুতিপর্ব কাটিয়ে ওঠার পর আরম্ভ হবে "a constructive programme for harmonisation of the form and its movements",[6] মা বলছেন যদি তুমি অন্তরে সৌন্দর্যের আদর্শটি প্রস্ফুটিত রাখতে পার, সেই আদর্শ ছোঁওয়ার আস্পৃহা থাকে তবে আজ নয়ত কাল তুমি পৌঁছে যাবে লক্ষ্যে।

নির্দেশিকা

[1] *Collected Works of the Mother, Cent. Ed. Vol. 12. p. 9.*
[2] *Ibid*, p. 13.
[3] *Ibid*, p. 14.
[4] *Ibid*, p. 14.
[5] *Ibid*, p. 14.
[6] *Ibid*, p. 17.

S. N. PAUL & CO.

High Class Brick Manufacturers & Contractors

Brick Field
Sreepore Bagharghole
P.O. Bonhooghly, 24 Parganas

Head Office
34: 1, Puddapukur Road
Calcutta-20

Phone : 47-2869

With the best compliments from :-

Ellora Enterprise

Paper & Board Merchants

57/2A, College Street
Calcutta-73

34-3720

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

সমগ্র রচনাবলী

প্রকাশিত—প্রতি খণ্ডের মূল্য ২৫·০০ টাকা

***

রমেন সেনগুপ্ত

প্রণতি

শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মায়ের চরণে নিবেদিত কাব্যগ্রন্থ

মূল্য : ৩·০০ টাকা

***

অণিমা মজুমদার

মঞ্জিরা

(কাব্যগ্রন্থ)

সমীরকান্ত গুপ্ত

কাব্যলোকে

মূল্য ৮·০০

শতাব্দীর পূজা

শ্রীমা ও আশ্রম প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ মূল্য ৪·০০

20 MAY 1992

***

অনিলবরণ রায় ও যোগানন্দ

মহাবির্ভাব

শ্রীশ্রীমদ্ ভারতব্রহ্মচারী ও শ্রীশ্রীজগন্মাতার মহাবির্ভাব

—প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

শ্রীঅরবিন্দ ভবন, ৮ শেক্সপীয়র সরণী, কলিকাতা-৭১

পূর্ণব্রহ্ম, ৬৩ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বর্তিকা

১৫ই আগস্ট ১৯৮২

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বর্ত্তিকা

১৫ই আগষ্ট ১৯৮২

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭৩

ঋষি বিশ্বামিত্রের অগ্নিমন্ত্র	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
মায়ের আলাপ	...
সাবিত্রী (রাজার যোগ-কথা)	অনির্বাণ
মায়ের লেখা—মায়ের কথা	অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায়
এই লভিনু সঙ্গ তব	দেবযানী
স্বদেশ-প্রেমের কাব্য	সবীরকান্ত গুপ্ত

বর্ত্তিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগস্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫·০০ টাকা। বৎসরের যে-কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীর আপিসে কিংবা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় পাঠাইবা। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

	প্রতি সংখ্যা	বার্ষিক
প্রতি পৃষ্ঠা	১০০·০০ টাকা	৩০০·০০ টাকা
প্রতি অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	৬০·০০	২০০·০০
ভিতরের মলাট	১৫০·০০	৫২০·০০
বাইরের মলাট	২০০·০০	৬০০·০০

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

সম্পাদক :
শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য দেড় টাকা

Edited by : Nolini Kanta Gupta
Published by : Sri Aurobindo Pathamandir,
15 Bankim Chatterjee Street, Calcutta-73
Printed by : Amiyo Ranjan Ganguli
at Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry

Indeed, all life is
love if we know how
to live it

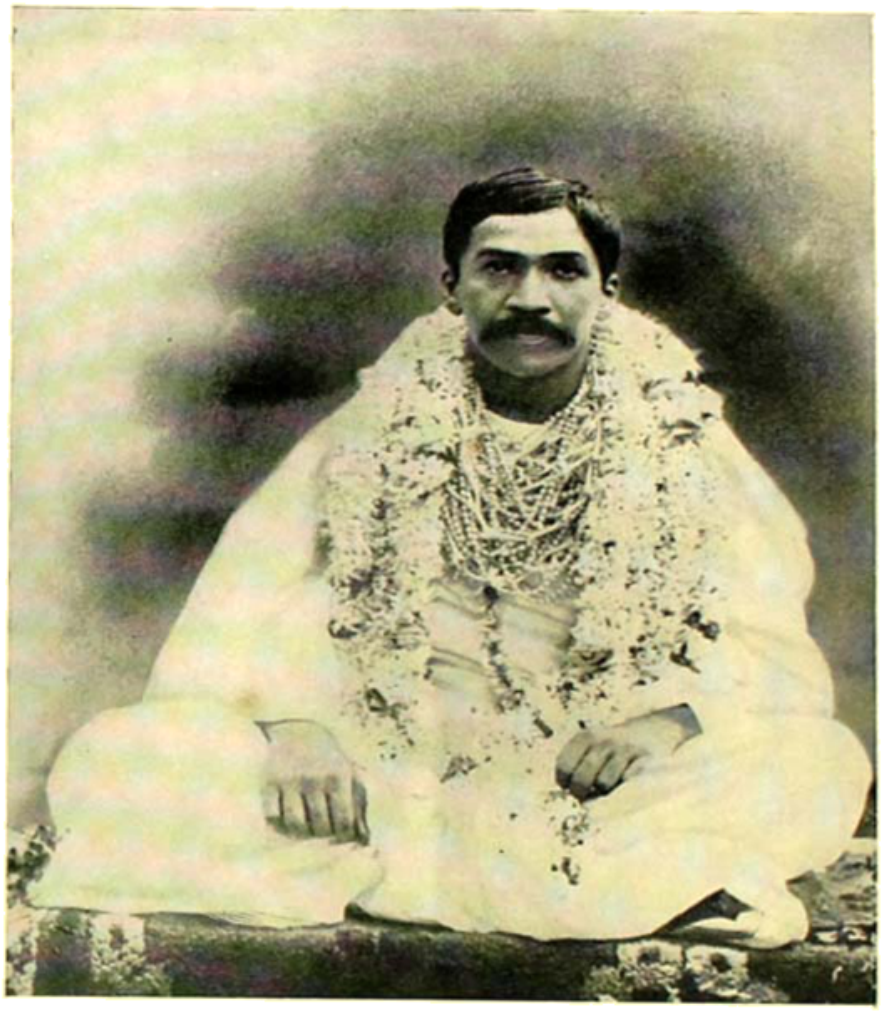

ঋষি বিশ্বামিত্রের অগ্নিমন্ত্র

(ঋগ্বেদ—তৃতীয় মণ্ডল, ষড়বিংশ সূক্ত)

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

বৈশ্বানরং মনসাগ্নিং নিচায্য হবিষ্মন্তো, অণুষত্যং স্বর্বিদম্।
সুদানুং দেবং রথিরং বসুয়বো গীর্ভী রণ্বং কুশিকাসো হবামহে ॥১॥

বৈশ্বানরম্ — বিশ্ব দেবশক্তিকে
মনসা — মনের সহায়ে
অগ্নিম্ — অগ্নিকে
নিচায্য — অবধারণ করে
হবিষ্মন্তঃ — আহুতি-প্রদাতা (আমরা)
অণু-সত্যম্ — সত্যের অনুসরণকারীকে
স্বঃ-বিদম্ — সূর্যলোকের অধিকারীকে
সু-দানুম্ — মহান দাতাকে
দেবম্ — দিব্য
রথিরম্ — সারথিকে
বসু-যবঃ — সম্পদকামী
গীঃ-ভিঃ — দিব্য বাক্যের সহায়ে
রণ্বম্ — আনন্দময়
কুশিকাসঃ — কুশিকেরা
হবামহে — আহ্বান করি

আমরা কুশিকেরা আহুতি নিয়ে এসেছি, আমাদের কাম্য দিব্য সম্পদ, আমরা আহ্বান করি বিশ্বদেবশক্তিকে দিব্য বাক্য দিয়ে, আমরা আবিষ্কার করেছি মনের সহায়ে সত্যের অনুসরণে, তিনি হ'লেন উদার প্রদাতা, দেবতা তিনি, আনন্দময় সারথি ॥১॥

তং শুভ্রমগ্নিমবসে হবামহে বৈশ্বানরং মাতরিশ্বানমুক্থ্যম্॥
বৃহস্পতিং মনুষো দেবতাতয়ে বিপ্রং শ্রোতারমতিথিং রঘুষ্যদম্ ॥২॥

তম্ — সেই
শুভ্রম্ — শুভ্র
অগ্নিম্ — অগ্নিকে
অবসে — রক্ষার জন্য
হবামহে — আহ্বান করি (আমরা)

বৈশ্বানরম্ — বিশ্ব দেবশক্তিকে
মাতরিশ্বানম্ — মাতৃজঠরে বর্ধমান
উকথ্যম্ — বাঙ্ময়, দিব্যবক্তা (তিনি)
বৃহস্পতিম্ — বাগ্ অধিপতি (তিনি)
মনুষঃ — মানুষের
দেব-ভাতয়ে — দেবত্ব গঠনের জন্য
বিপ্রম্ — জ্যোতির্ময় দ্রষ্টা (তিনি)
শ্রোতারম্ — দিব্যশ্রোতা (তিনি)
অতিথিম্ — অতিথি (তিনি)
রঘু-ষ্যদম্ — দ্রুতগামী তিনি

সেই শুভ্র অগ্নিকে রক্ষার জন্য আমরা আহ্বান করি, সেই বিশ্বদেবশক্তিকে যিনি মাতৃ-জঠরে বর্ধিত হয়েছেন, বাগ্-অধিপতি যিনি, যিনি দিব্যবক্তা ও দিব্যশ্রোতা ; মানুষের দেবত্ব তিনি গড়ে তুলেছেন, জ্যোতির্ময় দ্রষ্টা তিনি, অতিথি তিনি, দ্রুতগামী পথচারী তিনি ॥২॥

অশ্বো ন ক্রন্দজনিভিঃ সনিধ্যতে বৈশ্বানরঃ কুশিকেভির্যুগে যুগে।
স নো অগ্নিঃ সুবীর্যং অশ্ব্যং দধাতু রত্নমমৃতেষু জাগৃবিঃ ॥৩॥

অশ্বঃ — অশ্ব
ন — যেন
ক্রন্দন্ — হ্রেষাধ্বনি করে
জনি-ভিঃ — মাতৃকাদের সহায়ে
সন্-ইধ্যতে — প্রজ্বলিত হয়
বৈশ্বানরঃ — বিশ্ব-দেবশক্তি
কুশিকেভিঃ — কুশিকদের দিয়ে
যুগে যুগে — যুগে যুগে
সঃ — সেই
নঃ — আমাদের
অগ্নিঃ — অগ্নি
সু-বীর্যম্ — বীরশক্তি
সু-অশ্ব্যম্ — সম্যক অশ্বশক্তি
দধাতু — দেয় যেন, স্থাপন করে যেন
রত্নম্ — আনন্দ
অমৃতেষু — অমরদের মধ্যে
জাগৃবিঃ — জাগ্রত

মাতৃকাদের নিকটে অশ্ব যেমন হ্রেষারব করে তেমনি বিশ্বদেবশক্তি সমিদ্ধ হয়ে উঠেছে কুশিকদের নিকটে যুগ হতে যুগান্তরে ; সেই অগ্নি আমাদের মধ্যে স্থাপন করে যেন বীরশক্তি, দিব্য অন্নশক্তি আর পরম আনন্দভোগ ; তিনি চিরজাগ্রত অমর দেবতাদের মধ্যে ॥৩॥

প্রযন্ত বাজাস্তবিষীভিরগ্নয়: শুভে সংমিশ্লা: পৃষতীরযুক্ষত।
বৃহদুক্ষো মরুতো বিশ্ব-বেদস: প্র বেপয়ন্তি পর্বতাঁ অদাভ্যা: ॥৪॥

প্র যন্ত } — অগ্রসর হয়ে চলে যেন
বাজা: — পূর্ণতা সব
তবিষীভি: — তেজোরাশিসহ
শুভে — শুভার্থে, স্বস্তির জন্য
সম্মিশ্লা: — সংমিশ্রিত তারা
পৃষতী: — বহুবর্ণা অশ্বীসব
অযুক্ষত — যুক্ত করে, যুগকাষ্ঠে সংবদ্ধ করেছে, যুগবদ্ধ করেছে
বৃহৎ উক্ষ: — বৃহৎকে বর্ধণ করে যারা
মরুত: — মরুতেরা
বিশ্ববেদস: — সর্বজ্ঞানী যারা
প্র বেপয়ন্তি } — কম্পিত করে
পর্বতান — পর্বত সকলকে
অদাভ্যা: — অদম্য

সম্মুখে এগিয়ে চলে যেন পরিপূর্ণতা সব তাদের তেজোরাশি নিয়ে, তারা অগ্নি-শক্তি, তারা বহুবর্ণা অশ্বীদের একসঙ্গে মিশ্রিত করে যুগবদ্ধ করেছে, মরুতেরা বৃহৎকে ছড়িয়ে দিয়েছে, বিশ্বজ্ঞানী তারা, অদম্য তারা, পর্বতসব প্রকম্পিত করে তুলেছে ॥৪॥

অগ্নিশ্রিয়ো মরুতো বিশ্বকৃষ্টয় আ হ্বেষযুগ্রমব ঈমহে বয়ম্।
তে স্বানিনো রুদ্রিয়া বর্ষনির্নিজ: সিংহা ন হেষক্রতব: সুদানব: ॥৫॥

অগ্নি-শ্রিয়: অগ্নিশোভিত
মরুত: — মরুতেরা
বিশ্ব-কৃষ্টয়: — বিশ্বজন যারা, বিশ্বজনীন
আ (+ঈমহে)
হ্বেষম্ — উজ্জ্বল
উগ্রম্ — উগ্র, রুদ্র, শক্তিময়

অবঃ — রক্ষক, রক্ষণ
(আ) ঈমহে — কামনা করি
বয়ম্ — আমরা
তেন — তার
স্বানিনো — গর্জনকারী
রুদ্রিয়া — রুদ্ররূপী
বর্ষনির্ণিজ — বৃষ্টি অথবা বর্ষণ পরিহিত
সিংহাঃ — সিংহ
ন — মত
হেষ-ক্রতবঃ — সম্যক দাতা

অগ্নিশিখাশোভিত বিশ্বজনীন মরুতেরা, তাদের উজ্জ্বল শক্তিময় রক্ষকরূপে কামনা করি আমরা ; রুদ্ররূপী তারা, ঘোর রব তাদের, জলধারা-পরিহিত তারা, সিংহের মত গর্জন করে তারা, পরিপূর্ণ দাতা তারা ॥৫॥

ব্রাতং ব্রাতং গণং গণং সুশস্তিভিরগ্নের্ভামং মরুতামোজ ঈমহে।
পৃষদশ্বাসো অনবভ্ররাধসো গন্তারো যজ্ঞং বিদথেষু ধীরাঃ ॥৬॥

ব্রাতম্ ব্রাতম্ — দলের পর দল
গণম্ গণম্ — বাহিনীর পর বাহিনী
সুশস্তিভিঃ — সম্যক ঘোষণার সহায়ে
অগ্নেঃ — অগ্নিদেবের, অগ্নি
ভামম্ — জ্যোতির্ময়
মরুতাম্ — মরুতদের
ওজঃ — ওজঃশক্তিকে
ঈমহে — কামনা করি
পৃষৎ অশ্বাসঃ — বহুবর্ণময় অশ্বসহিত
অনবভ্র রাধসঃ — ধ্বংসরহিত লব্ধ ধন
গন্তারঃ — যাত্রী যারা
যজ্ঞম্ — যজ্ঞে
বিদথেষু — জ্ঞানার্জনে
ধীরাঃ — স্থির, জ্ঞানী, স্থিতপ্রজ্ঞ যারা

দলের পর দলে বাহিনীর পর বাহিনী তারা ঘোষণা করেছে অগ্নিকে, সেই মরুতদের উজ্জ্বল ওজঃশক্তিকে আমরা কামনা করি, তাদের লব্ধ সম্পদ কেহ অপহরণ করে না, বহু-বর্ণময় অশ্বরাজি নিয়ে তারা চলেছে যজ্ঞের অভিমুখে, জ্ঞানার্জনে স্থিতধী যারা ॥৬॥

অগ্নিরস্মি জন্মনা জাতবেদা ঘৃতং মে চক্ষুরমৃতং ম আসন্।
অর্কস্ত্রিধাতূ রজসো বিমানোঽজস্রো ঘর্মো হবিরস্মি নাম ॥৭॥

অগ্নিঃ — অগ্নি
অস্মি — আমি
জন্মনা — জন্ম হতে
জাতবেদাঃ — জাতবেদ, জন্মজ্ঞানী, সকল জন্মদাতা
ঘৃতম্ — জ্যোতি
মে — আমার
চক্ষুঃ — চক্ষু
অমৃতম্ — অমরত্ব
মে — আমার
আসন্ — আনন
অর্ক — রশ্মি
ত্রিধাতুঃ — ত্রিধা
রজসঃ — মধ্যলোকের, অন্তরীক্ষের
বি-মানঃ — পরিমাপকারী
অজস্রঃ — নিরন্তর, নিরবচ্ছিন্ন
ঘর্মঃ — জ্যোতিস্রাব (দীপ্তিপ্রবাহ)
হবিঃ — আহুতি
অস্মি — আমি
নাম — অবশ্য

অগ্নি আমি, জন্ম হতেই সকল জন্মের জ্ঞাতা আমি, জ্যোতি হ'ল আমার চক্ষু, অমরত্ব আমার আনন, আমি হ'লাম ত্রিধা রশ্মি, অন্তরীক্ষ পরিমাপ করে চলি আমি, আমি নিরবচ্ছিন্ন দীপ্তিপ্রবাহ, আমিই আহুতি ॥৭॥

ত্রিভিঃ পবিত্রৈরপুপোদ্ধ্যর্কং হৃদা মতিং জ্যোতিরনু প্রজানন্।
বসিষ্ঠং রুদ্রমকৃত স্বভাভিরাদিদ্দ্যাবাপৃথিবী পর্যপশ্যৎ ॥৮॥

ত্রিভিঃ — তিনটি (দিয়ে)
পবিত্রৈ — শোধনী (দিয়ে)
অপুপোৎ — পরিশুদ্ধ করেছে
হি
অর্কম্ — আলোরেখাকে
হৃদা — হৃদয় দিয়ে

মতিম্ — চিন্তাকে
জ্যোতি — জ্যোতির
অনু — অনুসরণে
প্রজানন্ — জ্ঞানলাভ করেছে
বধিষ্টম্ — সর্বশ্রেষ্ঠ
রত্নম্ — পরমানন্দকে
অকৃত — সৃষ্টি করেছে
স্বধাভিঃ — স্বধর্মের দ্বারা
আৎ, ইৎ — আদিৎ — অনন্তর
দ্যাবাপৃথিবী — দ্যুলোক-ভূলোক
পরি, অপশ্যৎ — চারিদিক ঘিরে দেখেছে

শোধনীত্রয় দিয়ে কিরণলেখা সে পরিশুদ্ধ করেছে, হৃদয় দিয়ে চিন্তাকে অনুসরণ করে জ্যোতির জ্ঞান সে লাভ করেছে। শ্রেষ্ঠতম আনন্দঘন সে সৃষ্টি করেছে আপন স্বধর্মের সহায়ে. দ্যুলোক-ভূলোক তার দৃষ্টি দিয়ে ঘিরে রেখেছে ॥৮॥

শতধারমুৎ সমক্ষীয়মানং বিপশ্চিতং পিতরং বক্বানাম্।
মেড়িং মদন্তং পিত্রোরুপস্থে তং রোদসী পিপৃতং সত্যবাচম্ ॥৯॥

শতধারম্ — শতধারাযুক্ত
উৎসম্ — উৎস
অক্ষীয়মানম্ — ক্ষয়হীন
বিপঃ-চিত্তম্ — উজ্জ্বল চেতনাময়
পিতরম্ — পিতাকে
বক্বানাম — বক্তব্য সকলের, উক্তির, বাচনের
মেড়িম্ — রত্নকে
মদন্তম্ — উপভোগ করে
পিত্রোঃ — মাতা-পিতার
উপ-স্থে — ক্রোড়ে
তম্ — তাকে
রোদসী — দ্যুলোক-ভূলোক
পিপৃতম্ — পূর্ণ করে ধরে
সত্য-বাচম্ — সত্য বক্তাকে

তিনি শতধারাযুক্ত অক্ষয় উৎস, জ্যোতির্ময় চেতনা তাঁর, সকল বাচনের জনক ও প্রেরক তিনি, মাতা-পিতার ক্রোড়ে তিনি পরম রভস উপভোগ করেন, তাঁকেই দ্যুলোক-ভূলোক পরিপূর্ণ করেছে, সত্য ধাতৃময় তিনি ॥৯॥

কখনোও ভুলে যেওনা যে তুমি একা নও। ভগবান তোমার সঙ্গে রয়েছেন তোমার সহায় ও দিশারী হয়ে। তিনিই একমাত্র সাথী যিনি কখনো হতাশ করেন না ; একমাত্র বন্ধু যাঁর প্রেম সান্ত্বনা দেয়, শক্তিমান করে তোলে। বিশ্বাস রাখ তাহলেই তিনি তোমার জন্য সব কিছু করে দেবেন।

মায়ের আলাপ

১১ই মে, ১৯৫৫

[এই আলোচনাটি 'যোগসাধনার ভিত্তি' বইটির
শেষ অধ্যায়ে চেতনা ইত্যাদি সম্পর্কে]

শ্রীমা : কে আজ প্রশ্ন করবে ?

প্রশ্ন : মা, দেহকে কি করে সকল রকম ব্যাধির আক্রমণ থেকে মুক্ত রাখতে পারা যায় ?

শ্রীমা : শ্রীঅরবিন্দও সেই কথাই পরে লিখেছেন, তাই নয় কি ? তিনি বলেছেন একমাত্র অতিমানস শক্তির অবতরণ ঘটলেই দেহ সকল রকম আক্রমণের হাত থেকে মুক্ত হতে পারবে। তা না হলে আর সব কিছুই হ'ল ক্ষণস্থায়ী এবং তাও সব সময় কার্যকরী হয়না। তিনি বলেছেন কার্যত দেহ রোগমুক্ত হতে পারে বটে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে তা কখনও হয়না। আর পুরোপুরি ভাবে হতে হলে প্রকৃতি এখন যে অবস্থায় রয়েছে, তাকে অতিমানস প্রকৃতিতে রূপান্তরিত করতে পারলে তবেই দেহকে সকল রকম আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে।

প্রশ্ন : মা, অবচেতন কি মন প্রাণ এবং দেহের চেয়েও বেশী শক্তিশালী ?

শ্রীমা : বেশী শক্তিশালী বলতে তুমি কি বলতে চাও ?

এখানে লেখা রয়েছে অবচেতন বলেই তা সব জায়গাতে রয়েছে, যেন সব কিছু এই অবচেতনাতে ডুবে রয়েছে। তাই অবচেতন বলতে বোঝায় অর্ধচেতন, পূর্ণ চেতনও নয় আবার পূর্ণ অচেতনও নয়। এ হল ঠিক ওই দুয়ের মাঝামাঝি ঠিক ওই রকম আধাআধি, তাই সবকিছুই এর মধ্যে পিছলে নেমে যায়, মানুষ জানতেও পারেনা যে সেগুলো ওখানে নেমে রয়েছে। আর সেখান থেকে তারা কাজ করছে। তারা যে এখানে রয়েছে মানুষ তা জানতে পারেনা বলেই সেখানে তারা থাকতে পারে। মানুষের মধ্যে এমন অনেক কিছুই আছে যেগুলোকে সে পুষে রাখতে চায় না, সেগুলোকে সে তার সক্রিয় চেতনার গণ্ডী থেকে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু সেগুলো ওই ওখানে নেমে গিয়ে লুকিয়ে থাকে, আর জায়গাটা অবচেতন বলেই কেউ তাদের লক্ষ করেনা। কিন্তু তাই বলে তারা একেবারে চলে যায় না, এবং ওপরে উঠে আসার একটা সুযোগ পেলেই ঠেলে উঠে আসে। যেমন ধর আমাদের শরীরের অনেক বদ অভ্যাস আছে, এই অর্থে যে, দেহ প্রায়ই তার ভারসাম্যের অবস্থা হারিয়ে ফেলে, আমরা সেটাকেই বলি অসুখে পড়া, তাইনা ? কিন্তু যে যাই হোক বদ অভ্যাসের দরুণ শারীরিক ক্রিয়াগুলো বিকৃত ভাবে ঘটে থাকে। সেগুলোকে অন্তর্হিত করার জন্য তুমি ভগবৎশক্তিকে একাগ্রভাবে আহ্বান করে আরোপ কর, কিন্তু সেটা পুরোপুরি বিলুপ্ত হয় না। অবচেতনার মধ্যে ঢুকে পড়ে। তারপর যখন তুমি সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখনা, তার পুনঃপ্রকাশ যাতে না ঘটে সে বিষয়ে অবহিত হও না, তখন সে ঠেলে উঠে বেরিয়ে আসে।

কয়েক মাস এমন কি হয়ত কয়েক বছর পরেও তুমি একেবারে নিশ্চিত ধরে নিয়েছ যে সেটার হাত থেকে এখন তুমি সম্পূর্ণ মুক্ত। ও সম্বন্ধে চিন্তা করনা তারপর হঠাৎ একদিন এসে হাজির হয়, যেন কোনদিনই একেবারে চলে যায়নি। অবচেতনা থেকে ওটা ঠেলে বেরিয়ে আসে। যতক্ষণ পর্যন্ত না অবচেতনার মধ্যে প্রবেশ করা হচ্ছে এবং সেখানে জিনিষগুলোকে বদলান হচ্ছে অর্থাৎ যতদিন না ওই অবচেতনাকে চেতনাতে পরিবর্তিত করা হচ্ছে ততদিন ওরকম ঐভাবে সর্বদাই এসে হাজির হবে। তাই একমাত্র উপায় অবচেতনাকে চেতনাতে পরিবর্তিত করা। যদি প্রত্যেকটি বস্তুই, যা ঠেলে ওপর দিকে ওঠে তা সচেতন হয়, তা হলে ঠিক সেই মুহূর্তেই তাকে বদলে ফেলতে হবে। আরও একটি সরাসরি উপায় আছে, তাহল অবচেতনার মধ্যে সম্পূর্ণ সচেতনভাবে প্রবেশ করা এবং সেখানেই কাজ করা, অবশ্যই সেটা খুব শক্ত ব্যাপার। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত একাজটি না করা হচ্ছে, ততদিন যতকিছু উন্নতিই লাভ হয়ে থাকনা কেন আমি বলতে চাইছি বাহ্যত মানুষের দেহে সেগুলি সর্বদাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। (শ্রীমা একটি শিশুর দিকে চেয়ে বললেন) তুমি ঘুনোচ্ছ বুঝি?

আর কোন প্রশ্ন তোমার? কিছু নেই?

প্রশ্ন আচ্ছা মা, কেউ যখন বুঝতে পারে যে কোন একটা অসুখ আসছে তখন কি ভাবে সেটাকে সে ঠেকাতে পারে?

শ্রীমা আ!

প্রথম কথা হল, অসুখ করুক এটা চাইবে না, তোমার দেহের মধ্যে কোন কিছুই যেন অসুখকে না চায়, তীব্র মনের জোর থাকা চাই, কিছুতেই অসুখ করবে না এই হল প্রথম শর্ত।

দ্বিতীয় কাজ হ'ল দিব্যজ্যোতিকে আহ্বান করা, সাম্য অবস্থার জ্যোতি, যে জ্যোতি শান্তি দান করে, নীরবতা দান করে, সমতার ভাবকে আনে এবং তাকে দেহের কোষগুলির মধ্যে সঞ্চারিত করে, এবং তাদের অভয় দিয়ে বলে যেন তারা ভয় না পায় সেটা হল আর একটি শর্ত।

প্রথম কথা হ'ল চাইবে না যে অসুখ করুক, তারপর হ'ল অসুখের ভয় করবে না। আকর্ষণও করবে না আবার ভয়ে কাঁপবেও না। কোনমতেই চাইবে না যে অসুখ করুক। কিন্তু অসুখ হবার ভয়ে অসুখকে চাইবে না, এমনটাও না হয়। ভয় একেবারেই পাবেনা। একটা শান্ত দৃঢ়নিশ্চয়তার ভাব থাকা চাই, আর চাই দিব্য করুণার শক্তির ওপর পরিপূর্ণ আস্থা, যে তিনি তোমাকে সকল কিছু থেকে রক্ষা করছেন, এবং তুমি তখন অন্য বিষয়ে মন দেবে, ও বিষয়ে আর মোটেই মাথা ঘামাবে না। এই দুটি যখন ঠিক ঠিক করতে পারবে সমগ্র ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে অসুখকে তাড়িয়ে দেবে, আর দেহের কোষগুলির মধ্যে এমন একটি বিশ্বাস সঞ্চারিত করবে যেটি সকল ভয়কে দূরে তাড়িয়ে দেয়, তখন অন্য বিষয়ে মন দেবে, অসুখের কথা একেবারেই ভাববে না অসুখের অস্তিত্বের কথাই ভুলে যাবে...ব্যাস! এটা যদি করতে জান তা হলে সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত লোকের সংসর্গে এলেও তোমার কিছুই হবে না। কিন্তু জানা চাই কি ভাবে এটি করতে হয়।

অনেক লোক আছে যারা বলে, "হাঁ, ভয় বলে কিছুই নেই, কিন্তু ও হল তাদের মনের

কথা, মনে তাদের ভয় নেই তা সত্যি, তাদের মন দিব্যি শক্ত, কিন্তু দেহ তাদের ভয়ে কাঁপে তারা সেটা জানে না, কারণ ও হ'ল তাদের দেহের কোষগুলির ভিতরকার কাঁপুনি।

আর ওই কাঁপুনিই সাংঘাতিক উদ্বেগের সৃষ্টি করে — সেটাই অসুখকে আকর্ষণ করে এইখানেই দিব্যশক্তিকে প্রয়োগ করতে হবে, আর প্রয়োগ করতে হবে শক্তিময় নিথর নিশ্চল দিব্যকরুণার প্রতি অখণ্ড বিশ্বাস। তাছাড়া আর কোন কোন সময় ঠিক এই রকমেরই একটি শক্তির সাহায্যে মনের সব জল্পনা কল্পনা তুমি তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হও। সেগুলো বলে, "সে যাই হোক, বাহ্যজগতটিও যত রকমের অসুখে ভরে রয়েছে, তাছাড়া এই অসুখটা আবার সংক্রামক, এবং যেহেতু ওই অসুস্থ লোকটির সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল, নির্ঘাৎ আমার অসুখটা করবেই, আর সত্যি বলতে কি অন্তরের নির্দেশগুলি বাহ্যদেহের উপর কাজ করতে পারার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। এই ধরণের যত রকমের মূঢ়তা আকাশ বাতাস ছেয়ে রয়েছে। এ সবই হ'ল সমষ্টিগত বদ্ধমূল ধারণা, যেগুলো প্রত্যেকেই একে অপরের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে, আবার তার উপর দৈবাৎ যদি দু'তিনজন ডাক্তার একসঙ্গে হ'ল, তাহলে ব্যাপারটা একেবারে সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়ায়।

(সকলে উচ্চহাস্য)

প্রশ্ন শ্রীঅরবিন্দ যখন বলছেন "অসুখটা বাইরে থেকে আসে" তখন সেটা আসলে কি?

শ্রীমা ও হল একরকমের স্পন্দন, সেটা মনের সংস্কার এবং প্রাণের কোন বিশৃঙ্খলার শক্তি থেকে গড়ে ওঠে আবার কোন কোন বাহ্য উপাদান থেকেও আসে, সেগুলো হ'ল মনের সংস্কার এবং প্রাণের স্পন্দনের বাহ্য আকার, আর এই সব জড় উপাদানগুলি হয়ত (éléments physiques) আমরা যাকে বলি জীবন্ত কীট বা এটা ওটা আরও অনেক কিছু, হতে পারে, এর সঙ্গে দেহের এক রকমের বোধ বা আস্বাদন বা কোন গন্ধ থাকে যেটা মানুষ বুঝতে পারে, যদি কারও খুব সূক্ষ্ম অনুভবশক্তি থাকে। অসুখ যা বাইরে আত্মপ্রকাশ করে সেগুলোর একটা বিশেষ আস্বাদন, একটা বিশেষ আঘ্রান অথবা একটা বিশেষ হালকা কিছু ভাব আবহাওয়াতে অনুভব করতে পারা যায়।

মানুষের মধ্যে অনেক অনুভবশক্তি আছে, যেগুলো সুপ্ত অবস্থায় থাকে। মানুষ সাংঘাতিক তামসিক। তার মধ্যে যতগুলি অনুভবশক্তি আছে সেগুলো যদি সব সজাগ হয়ে উঠত, তাহলে অনেক কিছু প্রত্যক্ষ করত, সেগুলো লক্ষ করবার আগেই অদৃশ্য হয়ে যায়। যেমন ধর, এখন অনেকেরই এখানে এক ধরণের ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে, এটা খুব ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, যখন এটা মানুষের খুব কাছে আসে, তখন এর একটা বিশেষ স্বাদ, একটা বিশেষ গন্ধ পাওয়া যায়, তখন তোমার সঙ্গে একটা বিশেষ সংযোগ ঘটে (অবশ্যই সেটা একটা জোরে ধাক্কা লাগার মত নয়), তার চেয়ে ঢের বেশী সূক্ষ্ম, একটা বিশেষ স্পর্শ ঠিক যেন কোন কিছুর উপর উল্টো দিকে হাত বোলানোর মত...তোমরা কি কখন এমনটা কর নি? জানো তো, জড়বস্তুর মধ্যে একটা নিয়েট কিছু আছে, তোমার হাতটা যখন ঠিকভাবে তার ওপর বোলাও অথবা এইভাবে নিয়ে যাও (মা হাত দিয়ে দেখালেন) তাহলে, তোমার বোধ হবে...তোমার চামড়ার উপর দিয়ে তা যেন উল্টো দিকে ঘষে গেল। তবে আমি

বলতে চাই যে, একটা ভীষণ আঘাতের মতো লাগে না, ব্যাপারটা খুবই সূক্ষ্ম কিন্তু খুবই স্পষ্ট, তাই যদি তেমনটা দেখতে পাও তাহলে অনায়াসে...।

তাছাড়া একটা রক্ষাশক্তির আবহাওয়ার মধ্যে নিজেকে সরিয়ে রাখার উপায় সর্বদাই রয়েছে, যদি জান কি ভাবে খুব শান্ত একটি স্পন্দনকে পেতে হয়, এতই নিখর সে স্পন্দন যে বোধ হবে যেন, একটি প্রাচীর তোমায় বেষ্টন করে রয়েছে। কিন্তু বাইরে থেকে যে সব স্পন্দন আসছে মানুষ সদাসর্বদাই সেগুলির প্রতি সাড়া দিচ্ছে, এটা যদি লক্ষ কর তাহলে দেখবে সর্বদাই কিছু একটা রয়েছে যা এইরকম বা ওই রকম বা সেইরকম করছে (ভঙ্গি করে দেখালেন), যেটা বাইরে থেকে যত কিছু স্পন্দন আসছে তাদের প্রতি সাড়া দিচ্ছে। তুমি কোন সময়েই সম্পূর্ণ একটা শান্ত অবস্থায় থাকনা সেটা তোমার অন্তর থেকে ফুটে বেরোচ্ছে, অর্থাৎ সেটা ভিতর থেকে বাইরে আসছে (সেটা বাইরে থেকে ভিতরে যাচ্ছে তা নয়), কিন্তু একটা যেন তোমার চতুর্দিকে আবরণ দিয়ে রেখেছে, সেটা খুব নীরব, ঠিক এরকমটা, আর তখন তুমি যেখানে খুশী যেতে পার, যে সব স্পন্দন বাইরে থেকে আসছে সেগুলো তোমার আবহাওয়ার চারিদিকে এরকমটা করতে আরম্ভ করেনা (মা ভঙ্গি করে দেখালেন)। সারাক্ষণ তোমার চারিপাশে যত সব স্পন্দনের নৃত্য ঘটে চলেছে, সেগুলোকে যদি তুমি দেখতে পেতে তাহলে আমি কি বলতে চাই বুঝতে পারতে। যেমন ধর, একটা কোন খেলায় তুমি যখন অংশ গ্রহণ কর, এমনি করে (মায়ের ভঙ্গি) তখন সেটা একটা স্পন্দন সৃষ্টি করে, সেটা একটা কেন্দ্র থেকে বাড়তে থাকে তারপর ক্রমশ: বাড়তে বাড়তে হঠাৎ দুম করে একটা দুর্ঘটনার সৃষ্টি করে। আর তা হ'ল ঐ রকমেরই একটা সমষ্টিগত আবহাওয়া, লোকেরা এসে জড়ো হয়ে দেখে। বাস্কেট বল বা ফুটবল বা অন্য কোনরকমের একটা খেলার মধ্যে তুমি রয়েছ সেটা বেশ টের পাওয়া যায়, স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় যেন তোমার চারিদিকে একটা ধোঁয়ার মতন কিছু রয়েছে (মাঝে মাঝে যেমন একটা উত্তাপের ছল্কা ভেসে আসে, অনেকটা সেই রকম) আর তখন ঐ রকম একটা স্পন্দন সৃষ্টি হয়। ক্রমশ: সেটা বাড়তে থাকে এবং আরো বাড়তে বাড়তে হঠাৎ একসময় তার ভারসাম্যটি ভেঙে পড়ে। তখন কারো বা হাত-পা ভাঙে, কেউ পড়ে যায়, কারুর মুখে বলটা এসে ঘাঁই করে লাগে, ইত্যাদি। আর ব্যাপারটা যখন ঐ রকম হয়ে ওঠে, তখন লোকে আগে থেকেই বলতে পারে যে, ঠিক এমনটি ঘটতে চলেছে। কিন্তু কেউ সেটা প্রত্যক্ষ করেনা।

অথচ এর চেয়ে ঢের কম গুরুতর অবস্থাতেও, ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের প্রত্যেকের চারিপাশে এমন একটা কিছু আছে যা অত্যন্ত ব্যক্তিগত এবং শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া, তোমরা যে সব জিনিষ পেতে চাওনা সে সবের হাত থেকে রক্ষা করে...অর্থাৎ তোমাদের গ্রহণসামর্থ্য হয়ে ওঠে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এবং সচেতন, তা না হলে তুমি তা পেতেই না আর যখন এই রকম সচেতন এবং অতিমাত্রায় শান্ত অবস্থা লাভ করবে, যে কথা এইমাত্র বললাম, যখন সেটা একেবারে ভিতর থেকে আসে (এ এমন বস্তু নয় যা বাইরে থেকে আসে)। অবস্থা যখন ঠিক এই রকমটা হবে, কেবল তখনই তুমি জীবনে নির্ভাবনায় এগিয়ে যেতে পারবে অর্থাৎ অন্য সব লোকেদের মধ্যে এবং প্রতি মুহূর্তে সকল অবস্থার মধ্যে দিয়ে, অনায়াসে এগিয়ে যেতে পারবে...তা না হলে যদি কোন অবাঞ্ছিত প্রভাবে পড়ো...যেমন ধর,

রাগ, ভয়, কোন অসুখ বা একটা অসোয়াস্তি বোধ হয়, তুমি নিশ্চিত জানবে সেগুলির দ্বারা তুমি আক্রান্ত হবে। যখনই এই রকমটা ঘটতে শুরু করবে তখনই বুঝতে হবে, যেন তুমি অনুরূপ স্পন্দনদের তোমাকে আক্রমণ করতে ডাকছো।

সবচেয়ে অবাক কাণ্ড হল, এই অচেতনা যাকে অবলম্বন করে মানুষ জীবনপথে এগিয়ে চলেছে, তারা জানেই না কি ভাবে জীবন যাপন করতে হয়। কোটিতে গুটিক মেলেনা যারা জানে কিভাবে জীবন যাপন করতে হয়। তারা ভালোয় মন্দয় মিশিয়ে কোনভাবে জীবন কাটায় — কোনক্রমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কখনও দিব্যি চলেছে, কখনও সব ভোঁ, ভাঁ। আর এই ধরণের যতকিছু ঘটে চলেছে তাদের জীবনে। একে কি বলবে? এই রকমই তো হয়।

তারা জানেনা কি ভাবে বাঁচতে হয়। সে যাই হোক, মানুষের শেখা দরকার কি ভাবে বাঁচতে হয়, জীবন যাপন করতে হয়। প্রথম থেকেই শিশুদের এইটি শেখান দরকার। আমি নিজে চেষ্টা করেছি কিন্তু কতটা সাফল্য লাভ করেছি তা জানিনা। এসব কথা আমি তোমাদের প্রায়ই বলেছি, তাইনা? কি? বলিনি?

প্রশ্ন হ্যাঁ।

শ্রীমা তাহলে এই শেষ। আরো প্রশ্ন আছে?

প্রশ্ন : না, আমি শেষের অংশটা বুঝতে পারিনি।

শ্রীমা শেষের অংশটিতে অতিমানসের কথা বলা হয়েছে, তাই নয় কি? হ্যাঁ তাই। তুমি বলতে চাইছ যৌগিক শক্তিগুলির এবং অতিমানসিক প্রকৃতির মধ্যে তফাৎটা তুমি বুঝতে পারনি। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ তা বুঝিয়ে দিয়েছেন।

বাহ্যচেতনাতে অর্থাৎ মনের এবং দেহের, শরীরগত চেতনাতে কোন একটা ফল লাভ করতে চাইলে, যে বিষয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করছিলাম, (ধর যেমন, একটি সংরক্ষণের ব্যক্তিগত আবহাওয়া থাকা চাই যা তোমাকে যে কোন অবাঞ্ছিত সংযোগ থেকে নিরাপদে রাখতে পারবে) তোমার যোগশক্তি থাকা চাই, অর্থাৎ যে শক্তি যোগ অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত করা যায় কিন্তু যদি তোমার দেহ অতিমানস হয়ে ওঠে, যদি তার সাধারণ দেহগত প্রকৃতির বদলে অতিমানসিক প্রকৃতি লাভ করে, তাহলে তোমাকে রক্ষা করার জন্যে কোন যৌগিক জ্ঞানের বা কোন যৌগিক শক্তির সাহায্য নেবার দরকার হবে না, কারণ তখন তুমি সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবেই এই অতিমানসিক প্রকৃতির দ্বারা সুরক্ষিত থাকবে।

শ্রীঅরবিন্দ সেই কথাই বলেছেন।

কিন্তু এই অতিমানস হ'ল এমন একটি বস্তু যা এখনও পর্যন্ত দেহে লাভ করা হয়নি। বাহ্যচেতনাতে ও বস্তু এখনও লাভ করতে হবে। বাহ্যচেতনাতে তা সম্ভব কিন্তু দেহে এখনও নয়।

তাছাড়া শ্রীঅরবিন্দ আমাদের বলেছেন এটা সম্ভব হতে এখনও তিনশ বছর লাগবে, তাই আমাদের অপেক্ষা করার সময় আছে। আমাদের শুধু অপেক্ষা করতে শিখতে হবে, শিখতে হবে কি করে টিকে থাকতে পারি।

এই শেষ তাহলে ?

প্রশ্ন না, কি করে যন্ত্রণা ভোগকে সুখের অনুভূতিতে পরিণত করা যায় ?

শ্রীমা আ ! শোন বাছারা, ও হ'ল এমন একটা কাজ যা করবার নয়। আমি তোমাদের ওটি করতে শেখাবো না। ও হল বিকৃতি।

সবার আগে এবং সবচেয়ে অপরিহার্য কাজটি হ'ল যন্ত্রণাকে অনুভব করবার সংযোগ-সূত্রটিকে বিচ্ছিন্ন করা। ব্যাপারটি কি জান, মানুষ যে যন্ত্রণা বোধ করে তার কারণ যন্ত্রণা বলে একটা কিছু আছে।

যেমন ধর, তুমি তোমার হাতের আঙুলটা কেটে ফেললে। এখন ঐ জায়গাটিতে একটি স্নায়ু আছে সে আঘাত পেলো। তখন দৌড়ে গিয়ে মস্তিষ্কে খবর দিল যে এইখানে একটা কিছু গণ্ডগোলের ব্যাপার ঘটেছে। আর ঠিক সেইটাই তোমাকে বেদনা অনুভব করায় যাতে তোমার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে এবং তোমাকে বলে, "জান, ওখানে একটা গণ্ডগোল ঘটেছে" তৎক্ষণাৎ তোমার চিন্তাটি উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে "কি হ'ল ? ব্যাপারটা কি, তাইতো ভীষণ ব্যথা করছে." ইত্যাদি ইত্যাদি —। তারপর সে আঙুলে ফিরে আসে আর যেটা এখনও নষ্ট হয়নি তাকে সামলাবার চেষ্টা করে। সাধারণতঃ সেখানে কেউ একটা ছোট ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেয়। কিন্তু যদি যন্ত্রণা পেতে না চাও, যদি খুব যন্ত্রণা হয়, তাহলে ব্রেক্ চিন্তার যোগসূত্রটিকে কেটে দেবে, স্নায়ুকে বলবে যে, "এখন চুপচাপ থাক, তোমার যা করবার তা করেছ, তুমি আমাকে সাবধান করে দিয়েছ। আর তোমার এখন কিছু বলার দরকার নেই। ব্যাস, আর কথাটি নয়।" এটি যদি ভাল করে করতে পার তাহলে তোমার আর কোন যন্ত্রণা বোধ হবে না। বেদনা বোধ একেবারে থেমে যাবে। এই হ'ল সবচেয়ে ভাল উপায়। খুব যন্ত্রণা দিচ্ছে বলার চেয়ে, এটা সহস্রগুণে ভাল।

আমি একজনকে জানতাম যার...জানিনা তোমাদের কারো পায়ের আঙুলের চামড়ার মধ্যে নখ গজাচ্ছে এমনটা হয়েছে কিনা — পায়ে ও রকমটা হলে খুবই ব্যথা করে, বিশেষ করে যদি কারো জুতো খুব আঁট থাকে তাহলে ভীষণ লাগে, আমি একটি ছেলেকে জানি সে তার নখটার উপর এইভাবে চাপ দিচ্ছিল (মা ভঙ্গি করে দেখালেন) তার বিশ্বাস ব্যথাটা হলো কতকগুলি স্পন্দনের তীব্রতাকে সহ্য করতে পারার অক্ষমতা। কাজেই চাপটা মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল, আর সত্যি সে জোরে চাপ দিচ্ছিল যার ফলে প্রথমে ব্যথাটা সাংঘাতিক ভাবে বেড়ে গেলো, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না তার ব্যথাটা এক রকমের আনন্দে পরিণত হ'ল ততক্ষণ সে চাপ দিতে থাকলো, আর এর ফলটা হ'ল চমৎকার।

তোমার যদি কোথাও ব্যথা থাকে আর যদি সেটাকে আরও বেশী বাড়িয়ে দিতে থাকো তাহলে এমন একটা মুহূর্ত আসে যখন তুমি হয় সংজ্ঞা হারাও (যারা একটু দুর্বল এবং সহ্য করতে পারে না তারাই মূর্চ্ছা যায়) নয়তো বেশ আরাম লাগে, কিন্তু এমনটা করতে বলা যায় না, আমি শুধু বলতে চাই যে এমনটা করা যায়। আমি একটি ছেলেকে জানতাম তার বয়স তখন বারো, সে এ রকমটা করতো এবং স্বেচ্ছায় ও সচেতনভাবেই করতো, যোগ সম্বন্ধে সে কোনদিন কিছুই শোনেনি, কিন্তু এটা সে নিজেই আবিষ্কার করেছিল, কিন্তু এমনটা করতে বলা চলে না, কারণ তার আঙুলটার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে দাঁড়ালো। এর দ্বারা তার

আঙুলটার কোন উপকারই হ'ল না।

কিন্তু আমার নিজের পদ্ধতিটি হ'ল দাদুকে বলা, "তোমার যা করবার তা করেছো এখন চুপটি করে থাকো, আমায় তোমাকে কিছু বলতে হবে না" এটা বের ভাল, এইভাবে সংযোগটা কেটে দেওয়া চাই, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

যখন কারোর খুব দাঁতের যন্ত্রণা হয় (জানিনা তোমাদের কখনও কারো দাঁতের ব্যথা হয়েছে কিনা, দাঁতের ব্যথায় দারুণ যন্ত্রণা হয়, কারণ নার্ভটা মস্তিষ্কের খুবই কাছে রয়েছে, তাই এর তীব্রতা কিছুমাত্র কমে না — এটা খুবই কাছাকাছি, তাই অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হয়), তখন ভাল উপায় হলো — অবশ্য উপায়, ও ছাড়া অন্য কিছু নেই — সব চেয়ে ভাল উপায় হলো নার্ভের সংযোগটি কেটে দেওয়া এবং তাকে বলা: "তোমার কাজ তুমি করেছো, খুব ভাল হয়েছে, তুমি আমাকে জানিয়ে দিয়েছো যে ওখানে একটা কিছু গোলমাল হয়েছে, তাই যথেষ্ট, আর জানাতন নয়। যখন নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে তখন এইভাবেই কেটে বাদ দেওয়া চাই, তখন ও আর খবর সরবরাহ করেনা। অবশ্যই তখন তোমার অন্য বিষয়ে মন দেওয়া চাই। এরপরে তুমি যদি আবার বলতে আরম্ভ করো — "ব্যথাটা কি আমার এখনও আছে?" (সকলের উচ্চ হাস্য)

প্রশ্ন মা, শ্রীঅরবিন্দ এখানটাতে বলেছেন বেদনা হলো আদি আনন্দের বিকৃত-রূপ (degradation)

শ্রীমা : হ্যাঁ তাই, তবে সব কিছুই হ'ল বিকৃতি। তিনি বলেছেন তৃপ্তিবোধও তাই। সুখ ও দুঃখবোধ দুই হ'ল আনন্দের বিকৃতরূপ। তাছাড়া, আবার মানুষের বাহ্য চেতনার পক্ষে সামা অবস্থাকে বজায় রাখার ক্ষমতা খুবই কম। যে কোনও বিষয়েই হোক যদি খুব খুশী হও এবং সেটার মাত্রা ছাড়িয়ে যাও তাহলে তৎক্ষণাৎ দুঃখ বোধ করবে। তখন এমন একটা অবস্থা হয় যখন মানুষ বুঝতে পারেনা আরাম হচ্ছে না কষ্ট লাগছে — তখন এটাও হতে পারে ওটাও হতে পারে। যেমন ধর যদি খুব মিষ্টি কিছু একটা খাও, তাহলে পরে ব্যাপারটা বুঝতে পারবে, প্রথমে বলবে এটা ভারী চমৎকার, তারপরেই হঠাৎ ওটা এমন কিছু হয়ে ওঠে যখন তুমি বলো...ওঃ এটা প্রায় অসহ্য, সব কিছুর বেলাতেই ব্যাপারটা এই রকম। ওদের পরস্পরের সম্পর্ক খুবই নিবিড়, এই শেষ? না আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?

প্রশ্ন মা,—এক একটা সময় আসে যখন আশ্রমে অনেকেরই একসঙ্গে অসুখ করে...

শ্রীমা : হ্যাঁ, তা কেবল আশ্রমেই নয়, দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রথমে সহরে আসে, তারপর কেউ একজন খুব দয়াপরবশ হয়ে...আশ্রমের যাঁরা প্রায়ই সহরে গিয়ে সময় কাটান — তাঁরা এটি সঙ্গে করে আশ্রমে আনেন আর এখানে লোকেরা তো ভেড়ার পালের মত, যখন একজনের এটি হয় তখন তা বাহাদুরী ব্যাপার বলে মনে করে আর তখনই সকলের মধ্যে এটি সংক্রামিত হয়

(মা নীরব)

তুমি কি জানতে চাইছিলে?

প্রশ্ন আমি জানতে চাইছিলাম কেন এটা হয়...

শ্রীমা কেন হয়? সেই কথাই তো বললাম।

অনুকরণের স্পৃহা! ভেড়ার পালের মত। ভেড়ার পালের গল্পটা জান কি? জাননা? ওঃ! আমার মনে হয় এ হ'ল প্রথম গল্প...জানিনা...এটা প্রাচীন কাহিনী থেকে নেওয়া কিনা, সম্ভবত তাই...তোমরা রাবেলের (Rabelais) নাম শুনেছো? শুনেছো কি? রাবেলের লেখা একটি ফরাসী গল্পের বইয়ে এটি আছে...এ হল...(মা পবিত্রর দিকে তাকালেন কিন্তু সে জানে না, তখন নলিনীর দিকে তাকিয়ে বললেন) হয়ত নলিনী জানে।

(নলিনী) "পাঁতাগ্রুয়েল" (Pantagruel)।

পাঁতাগ্রুয়েল বুঝি। আমি এ সম্বন্ধে কিছু জানিনা, এ হ'ল রাবেলের একটা বিখ্যাত বই, যদিও আমি তা পড়িনি,...গল্পটা হ'ল একপাল ভেড়াকে নৌকোয় করে পার করা হচ্ছিল, তারপর ইচ্ছা করে বা দৈবক্রমে ব্যাপারটা ঘটল কিনা জানিনা, কারণ গল্পটি আমি বিভিন্ন লোকের লেখায় পড়েছি। আমার মনে হয় এ ধরণের গল্প পারস্য, আরব, হিন্দু কিংবদন্তীতেও আছে, তাই আমি জানিনা রাবেলে ঠিক কি বলেছিলেন, সে যা হোক গল্পটি এ রকম

যে কোন কারণেই হোক একটি ভেড়া নৌকো থেকে সমুদ্রে পড়ে গেল তখন পরের পর আর সবগুলিই সেই ভাবে পড়তে লাগলো, (সকলের হাস্য) কারণ একজন পড়ে গেল তাই দেখে বাকী অন্যগুলিও চোখকান বুজে ঝাঁপ দিতে লাগলো। তাই গল্পটা সর্বজন-বিদিত হয়েছে, তাই ওদের বলা হয় "পানুর্জের" ভেড়া।

কিন্তু উপায় মাত্র একটি আছে, যে কথা আমি বললাম, আর তা হ'ল ব্যক্তিগত-শান্ত, উজ্জ্বল, নিস্তব্ধ আবহাওয়ার সৃষ্টি করা...তাহলে আর মানুষ ঐ রকম ভেড়ার পালের মত হয় না।

শেষ তাহলে বুঝলে...আর কিছু নেই তো?

সাবিত্রী

রাজার যোগকথা (৪)

অনির্বাণ

[টেপ রেকর্ডে ধৃত মূল ভাষণ হইতে পত্রা বসু কর্তৃক সম্পাদিত]

রাজার যোগে, প্রথম পর্বের তৃতীয় অনুবন্ধে অশ্বপতি তাঁর আত্মযোগের শেষ পর্বে এসেছেন, বলা যায়। তাঁর স্থিতি মহান্ আত্মার। সেখানে দেখি রাজা তাঁর আত্মার স্বাতন্ত্র্য ও মহিমার সাক্ষাৎ পেয়েছেন। আমরা আগেই লক্ষ করেছি, soul আর spirit-এর উপস্থাপনার সূক্ষ্ম পার্থক্য করা হয়েছে। soul বলতে কবি চৈত্যসত্তা বা নিত্য শুদ্ধ জীবকে বুঝিয়েছেন, যার বৃদ্ধি বা পরিণাম আছে। আর কূটস্থ ধ্রুব অচল আত্মচৈতন্য যেখানে, তাঁকে বোঝাতে spirit বলেছেন। এই আত্মচৈতন্যকে বেদে বলা হয়েছে অসঙ্গ নিশ্চল অক্ষর ইত্যাদি। সেখানে শক্তি নিষেধিত, তাই তাঁর সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়নি।

এই যোগ-পর্বে আত্মমুক্তির পরে রহস্যজ্ঞান লাভ হয়েছে। সেখানে রাজার উপলব্ধিতে ও দর্শনে প্রকৃতিকে তিন ভাবেই তিনি পেয়েছেন। পরা-প্রকৃতিতে ও অপরা-প্রকৃতিতে উভয় ক্ষেত্রে মহাপ্রকৃতিরই শক্তি ও কর্ম দেখা গেছে ; সেই মূল শক্তিকে আমরা পরমা-প্রকৃতি নামে বুঝে থাকি। আর পুরুষ রয়েছেন, চৈত্যপুরুষ ও অন্তর্যামী পুরুষ রূপে। রাজাকে আমরা তাই আধিকারিক পুরুষ নামে অভিহিত করেছি।

রহস্যজ্ঞান হল সাংখ্যবিজ্ঞান। যখন রাজা তাঁর যোগে সেই বিজ্ঞান আয়ত্ত করলেন, তখনও তিনি সেই পুরুষ-প্রকৃতির যুগ্ম-লীলা নানাভাবে সর্বত্রই ওতপ্রোত দেখে জ্ঞান লাভ করেছেন। সাংখ্যবিজ্ঞান বলতে শুদ্ধবুদ্ধি বা বিবেক-জ্ঞান বোঝানো হয়। চৈতন্য ও জড় একাকার হয়ে আছে, সেই অজ্ঞানের গ্রন্থি ছিন্ন হলে সাংখ্য-জ্ঞান লাভ হয় আর তাই হল যোগের ভূমিকা। প্রজ্ঞানকে প্রকৃতির সর্বক্ষেত্রেই যোগে সঞ্চারিত করতে হয়।

পূর্বে রাজা তটস্থ থেকে বিবেকজ্ঞান দিয়ে যে রহস্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, তাতে তাঁর বোধে বোধ হল যে, পুরুষ-প্রকৃতিতে এক লুকোচুরি চলেছে সৃষ্টিকর্মে। কিন্তু পুরুষের মধ্যে প্রকৃতির দিব্য প্রকাশ সম্ভাবিত হবে। তা কেমন করে হবে, এই পর্বে তাই বলা হয়েছে। এ হল বলের, শক্তির সাধনা, আগেরটিকে যদি বলা যায় জ্ঞানের সাধনা। সাংখ্য-জ্ঞানের সমতুল্য জ্ঞান নেই, আর যোগবলের সমতুল্য বলও নেই।

প্রাকৃত কাল যেমন আমাদের বোধে আছে, তেমনি যোগে আছে কাল ও মহাকালের ধারণা। সে কালের ক্ষেত্রে পুরুষ-প্রকৃতির লীলা দর্শন করা যায়, শিব ও কালীর যুগনদ্ধ সেই লীলা দর্শনে বোধগম্য হয়, কাল সেখানে যেন গুটিয়ে আসে। পরিণামে মূল কালশক্তি — যে প্রবাহের মধ্যে গেলে বেগ অনুভব করা যায়, তাই হল কালশক্তি। শক্তির প্রসারেই হয় বৃদ্ধি — ব্যাপ্তি বা বেড়ে ওঠা আবার গুটিয়ে আসা, এ ঘটবেই। সঙ্কোচন ও প্রসারণ এই ঘটন, পুরুষের এই লীলা হল উন্মেষ, আবার নিরোধ যোগে হয় নিমেষ, যাকে বলছি

গুটিয়ে আসা। সাংখ্য যোগে, তটস্থ থেকে যোগে সঙ্ঘর্ষণ বা চেতনার সঙ্কোচ যেখানে, সেখানে কালেরও সংহরণ। চৈতন্য গুটিয়ে গেলে বীর্য বেড়ে ওঠে। পারমার্থিক দৃষ্টিতে একই সঙ্গে একই সময়ে চেতনা সঙ্কুচিত ও বিস্ফারিত হয়। কিন্তু প্রাকৃত বা সাধারণ দৃষ্টিতে বা কালে সেটা ধরা পড়ে না। বলা হয়ে থাকে, বীজরূপে যেমন সঙ্কুচিত হয় বা গুটিয়ে আসে, বনস্পতিতে তেমন বিস্ফারিত হয়। আর তাই হল আত্মমুক্তি আর আত্মার স্বাতন্ত্র্য। তাতে চিত্ত সজাগ থাকে, আর সম্যক্‌দর্শন হয়। এ যেন দৃক্‌শক্তির নিজেকেই নিজে দেখা — ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কিন্তু এই পরম দর্শনের আবরণ স্বচ্ছ হলেও একটু আড়াল আছে। এই অবস্থাকে প্রভাস মানস বলা যায়। ...পরম পুরুষের দৃক্‌শক্তিতে (Absolute Sight) এবার 'ভিতর দুয়ার খোলা', গুহামুখ অপাবৃত।

রাজা অশ্বপতির চেতনায় যে প্রতিক্রিয়া হল, তাতে দেখা দিল তীব্র সংবেগ যে, গুহা-অভ্যন্তরে তলিয়ে গিয়ে দেখতে হবে, কি আছে। তাঁর বিশ্বাস দৃঢ়মূল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অজানার জন্য জিজ্ঞাসা ও সন্দেহ রয়েছে। যা গুহাহিত, তার জন্য তীব্র আকর্ষণ, এক তীব্র ব্যাকুলতা। কঠোপনিষদের গোড়ায় যেমন শুনেছি, প্রাণ আপনাকে যেন গুছে নিয়েছে, আবৃতচক্ষু হয়ে তিনি এখন দৃষ্টিদীপের অপেক্ষায় — ।

এই অবস্থায় তিনি এবার মহানাত্মা। অশ্বপতির আত্মস্থ অবস্থার যে স্বাতন্ত্র্য, তাকেই বেদে বলা হয়েছে 'স্বধা' — আপনাতে আপনি থাকা। জ্ঞানাত্মার আহুতি বা পরিণতি এই মহানাত্মায়। চৈতন্যের এই অবস্থায় রাজার চৈতনা ব্যাপ্ত, কিন্তু আরও একটি কেন্দ্র রয়েছে। প্রদীপের শিখার মত, আলো জ্বলার মত তা ছড়িয়ে পড়ে সব কিছুকে প্রকাশ করে। যেমন কিনা x'ray-র আলো, সেই রকম সেই আলো অনুবিদ্ধ ক'রে। প্রত্যেক কেন্দ্র থেকে সেই জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয় আবার বিচ্ছুরিত হয়ে ব্যাপ্ত হয়ে যায়। এই পরম প্রকাশে ত্রিভুবন ফুটে ওঠে। লোকসমূহ ও তার পরের ভূমি লোকোত্তর সবই ভেসে উঠবে। সেই লোকোত্তরে আরোহণ (Ascent) বা রাজার যোগের তৃতীয় পদক্ষেপ সিদ্ধির পর্বে কবি বর্ণনা করবেন। দ্বিতীয় পর্বে চেতনাকে চরিষ্ণু দেখিয়েছেন, স্থাণু নয়। বিষ্ণুকে বলা হয়েছে 'উরুগায়', কিনা তাঁর গতি সব দিকে ছড়ানো, সূর্যের মত ব্যাপ্ত হয়েও সব কিছু ধরে আছেন। তবুও তার গতি আছে, বলা হয় পরিক্রমা। ঈশোপনিষদে অনুরূপ শব্দ "সঃ পর্যগাৎ ..." আত্মবিস্ফারণ। এতে তিনি আত্মাতেই ত্রিভুবন প্রত্যক্ষ করেন। রাজা অশ্বপতির সেই রকম বিশ্বরূপ দর্শন হচ্ছে, অথচ নিজেকেই সর্বত্র দেখতে পাচ্ছেন। পুরুষ-সূক্তে যেমন সহস্রশীর্ষা পুরুষের কথা আছে, অগ্নিকে যেমন বলা হয়েছে বৈশ্বানর, যখন তিনি বিশ্বের সব নরের মধ্যেই জ্বলে উঠেছেন; সেইসব বোধ বা অনুভূতি ব্যষ্টি পুরুষের উপলব্ধিতে এলে যেমন হয়, কবি সেই চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তাই দেখেছি, রাজার যোগের প্রথম পর্বে তাঁর আত্মদর্শন প্রত্যক্ (subjective), এবং দ্বিতীয় পর্বে পরাক্ (objective)। আর তৃতীয় পর্বে লোকোত্তর আরোহণ, সেখানে ইষ্ট সাক্ষাৎকার এবং বরলাভ।

প্রথমে দেখলাম, রাজার যোগে, নিজের মধ্যে কেন্দ্র খুঁজে পেয়ে আলোকবিন্দুর মত আত্মস্থিতি। তা বর্তুলাকারে ছড়িয়ে পড়বে সমস্ত আকাশ ব্যাপ্ত করে, ঊর্ধ্ব অধ চতুর্দিকে ভরে সেই যোগ — "ব্যাপ্তি রূপেন সংস্থিতা"। তাতে হয় প্রকৃতির গুণের পরিণাম —

ব্রহ্মাণ্ড শরীর। যা গুহাহিত, তাই প্রকাশ পেতে প্রস্ফুটিত হতে থাকে। ব্যাপারটা বীজ থেকে বনস্পতির মত ঘটে যায়। সেই আত্মদর্শন পর্বে পর্বে দেখার অর্থকাল এবং কালের গতির প্রবাহে সেই ধারা রূপ ও তার পরিণতি দর্শন করার কথাও আসে। রাজা অনুপতি যেমন বিশ্বজগৎ দেখেছেন অনুভব করছেন বিশ্ববোধ দিয়ে, তেমন চিত্তের প্রবাহে সবটের সঙ্গে এক কাল-পরিণামও ঐ সঙ্গে দেখতে পাচ্ছেন। যেমন কিনা যেটা লক্ষ্য বা পরিণতি, সেটাই বিন্দু হয়ে আবার গুহাহিত হয়ে আছে। এই প্রকাশ ও বিকাশ একই সঙ্গে চলে। "আকাশং শরীরং ব্রহ্ম" — এই হল ব্রহ্মাণ্ড-শরীর। আকাশবৎ শরীর, ব্রহ্ম বা আত্মা ও তনু এক — "সত্যস্য"। তাঁর সেই ব্রহ্মাণ্ড শরীর আত্মধর্মে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠছে। এই নিয়ে কালপরিণামে তাঁর যোগে দ্বিতীয় পদক্ষেপ।

রাজার যোগ-যাত্রা যেমন এক আলোর পরিমণ্ডলে, তেমনই আবার মহাশূন্যে অন্ধকার ভেঙে চলা। সবই রাজা দেখলেন — অসীম অনন্ত অজানা। এর মূল কোথায়? সেই অজ্ঞেয়কে তো তিনি ধরতে পারেন নি। অসীমে প্রজ্ঞার উন্মেষ, দর্শনে অনুভবে অজানাকে জানা, এ সবই তাঁর বোধে যেমন প্রস্ফুটিত হতে থাকলো, তেমনই এক অজানা অজ্ঞেয় বোধ — এই দুই অর্থেই দুই ভাবে তাঁর কাছে মূল মহস্য প্রতিভাত হল। তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত দৃষ্টিতে দর্শন ও মনন একই সঙ্গে স্ফুরিত, তা থেকে তাঁর সঙ্কল্প বা কৃতি তিনি বুঝতে পারলেন।

অদ্ভুত রস বা এক আশ্চর্যের বোধ (Marvel, Wonder) হচ্ছে এই আদিরস; জানা ও অজানার সন্ধি ঘর এই দর্শনে। বলা যায় বোধে বোধ হয়। এ দৃষ্টি জ্যোতির্ভাসিত, সব ছাপিয়ে যেন অনন্তে ছড়ানো, অপরূপ। প্রাকৃত বোধের দৃষ্টিতে এ শক্তি নেই, তাই এ বিস্ময় অভূতপূর্ব। রাজার সর্ব ইন্দ্রিয় এই বোধে সঞ্চারিত ও সমৃদ্ধ। এ যেন দরজা জানালা সব খুলে গেছে, ভিতর বাহির একাকার। তাঁর সত্তার অতলান্তেও তিনি দেখছেন সেই অজানাকে, আবার ওপরেও সেই অজ্ঞেয়, "বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয়ম্"। ভাবে ও বস্তুতে যে বিরোধ আমরা দেখি, এখানে তা নেই। এ এক ভিন্ন দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধের সমন্বয়। একটা নিয়ম অনন্ত কলায় বিচ্ছুরিত হতে পারে। তাই আত্মচৈতন্যের উল্লাসে নিজের নিয়ম স্বধর্মেও স্বভাবে নিয়ন্ত্রিত করা, এই হল স্বাতন্ত্র্য। তখন দেখা যাবে, এক নিত্য স্থিতি ও এক নিত্য স্পন্দন, যেন এক মত্ততা। অনন্তের সেই প্রমত্ত ভাবই ব্রহ্ম-ক্ষোভ। এ থেকে আসে ভাব, কল্পনা আর তার বাণীরূপ। সেই বাক্‌কে ধরতে না পারলে জ্ঞানের স্ফুরণ হয় না। প্রজ্ঞা সক্রিয় হয় বাকে। মন্ত্রময়ী সঙ্কল্পশক্তি দিব্য ইচ্ছা বহন করে জেগে ওঠেন, রূপ ধরেন। অনুভবিতার অনুভব মন্ত্ররূপে ধরে বৈখরীতে প্রকাশ পেলে, এক অসম্ভব সংঘটন ঘটে যায় সেই শক্তিপাতে (dynamic charge)।

বিশ্বসৃষ্টির মূলে যে ব্যাহৃতি 'ভূর্ভুবস্বঃ...', তাতে রূপরেখা দেখা দিল, তখনও দৃষ্টি অনুবিদ্ধ — dramas of delight and plots of pain...। পরমশিব যিনি, তিনি তাঁর স্খলিত আনন্দ নিয়ে এই বেদনাকে দেখেন। সমস্ত দৃষ্টিই বোধিজাত, অন্তরে বাহিরে দর্শন। বিশ্বভূত এই আকাশ-শরীর স্পন্দিত হয়। সবও কিছুকেই যোগী তখন আত্মবিভূতি রূপে অনুভব করেন।

রাজা অনুপতি ভাবের জগতে বিচরণ করছেন, যাকে বলা হয় কল্পনা। বোধির

সহজ প্রকাশ ঘটে যেখানে, সেই কল্পনাকে (image) অবলম্বন করে অন্তরেন্দ্রিয়ের জ্ঞান হয়। সেই কল্পনা বা শুদ্ধ ভাবনা যা দিয়ে জীবন্ত হয়, তা-ই প্রাণ। "অকায়ম্ অব্রণম্ শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্" যা ছিল, তা রূপ নিল। তারপর অণুর জগতে, countless pointing signs যখন জীবন্ত হল, তখন তো সেটি ক্রিয়ার অপেক্ষা রাখে। অশ্বপতি তা দেখতে পেলেন, এবং তাঁর জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে এক তাগিদ অনুভব করলেন, বুঝলেন সুখের সঙ্গে দুঃখেরও উপযোগিতা আছে। দুঃখভোগ থেকে বীর্য জাগে।

এইভাবে রাজা অশ্বপতির অন্তরদর্শনেও এক উদাসীন দ্রষ্টা ও ভোক্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি দেখলেন বাণী বা বাকের তুরীয় পাদ "শাশ্বম্ প্রপক্ষোপশমম্"। সেই বিশ্বাতীতই বিশ্বকে অনুবিদ্ধ করছে। প্রণবের চতুর্থ পাদই শক্তি সঞ্চারে (charge) বিশ্বে মূর্ত হয়ে উঠছে এবং তা সবই ওই অমৃতের শক্তিতে শক্তিশালী হয়ে রয়েছে। সেই দর্শন এবার সুরু হবে রাজার যোগের ভুবন-পরিক্রমায়।

এতক্ষণ রাজার প্রত্যক্ দর্শন হয়েছে — অর্থানুভব। এবার খুলে গেল বিশুদ্ধ লীলার জগৎ, এক মাধুর্যের ঐশ্বর্য। সেই পরম প্রকাশকে ধরে আছে সর্বাতিশায়ী (Absolute) ওই তুরীয় পাদ। এবার রাজার যোগে পরাক্ দর্শন। কিন্তু এখানে তার যে তাৎপর্য রয়েছে, সেটা লক্ষণীয়। ভাব ও বস্তুর সমন্বয়, দৃশ্য ও দর্শনের সমাহার বজায় রয়েছে, এখনও বহির্মুখীনতা আসেনি, অথচ মূল প্রকাশ দেখছেন। সেই চাবি কাঠিটি ধরে নিতে হবে। মূল রহস্য, পরমাপ্রকৃতির সঙ্গে মৌন নিবিড় আলিঙ্গনে পুরুষ মূক, ধরা দিয়েও অব্যক্ত অবস্থা। সেই অন্তরচেতনার জগতে পিণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের দর্শন। দেহ যেন দীপশিখার মত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের দেহে ছড়িয়ে পড়েছে। বিরাট ব্রহ্মাণ্ড দেহ। এই বিশ্বরূপ দর্শনকে পিণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের দর্শন বলা যায়।

মায়ের লেখা—মায়ের কথা

প্রাণের শিক্ষা

অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায়

এবার আলোচনার বিষয় শ্রীমায়ের লেখা Vital Education. ইংরাজী ডিক্‌সনারীতে vital কথাটির অর্থ হল necessity to the continuance of life, of having or affecting life; essential, very important. Samsad English/Bengali Dictionary বলে being a manifestation of organic life, জৈব জীবনের বিকাশমূলক বা বিকাশস্বরূপ, ইত্যাদি।

শ্রীঅরবিন্দ-ব্যবহৃত vital কথাটির বাংলা অর্থ হল প্রাণ। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বললে হয়ত অবান্তর হবেনা, অনেক পাঠক শ্রীঅরবিন্দ পড়তে গিয়ে যে গোড়ার দিকে অসুবিধা ভোগ করেন তার অন্যতম কারণ হল বহু কথা শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দর্শনে যে অর্থে ব্যবহার করেছেন সেগুলির সঙ্গে নতুন পাঠকদের পরিচয় থাকেনা। শ্রীঅরবিন্দর লেখায় সংস্কৃত ছেড়ে দিলেও, গ্রীক লাতিন কথা আছে। এমন অনেক ইংরাজী কথার ব্যবহার আছে যার অর্থ অপরিষ্কার লাগে। প্রথমতঃ ধরুন, 'Supermind', 'overmind', 'circumconscient', ইত্যাদি technical terms শ্রীঅরবিন্দ ব্যবহার করেছেন তাঁর দর্শনে। এছাড়া অনেক সাধারণ ইংরাজী কথা — যেমন, 'consciousness,' 'transformation' এমন কি নিত্য ব্যবহারের আটপৌরে কথা যেমন 'mind', 'life' ইত্যাদি শ্রীঅরবিন্দ ব্যবহার করেছেন বিশেষ ভাবে। সেগুলির বিশেষ অর্থ দিয়েছেন। সেইভাবেই 'psychic', 'vital' কথা দুটিকেও শ্রীঅরবিন্দ নতুন তাৎপর্য দিয়েছেন।

শ্রীঅরবিন্দ বলছেন — 'Vitality means Life-Force — wherever there is LIFE, in plant or animal or man, there is life-force — without the vital there can be no life in matter and no living action.

The vital proper is the life-force acting in its own nature, impulses, emotions, feelings, desires, ambitions, etc., having as their highest centre what we may call the outer HEART of emotion, while there is an inner heart where are the higher or psychic feelings and sensibilities, the emotions or intuitive yearnings and impulses of the soul. The vital part of us is of course, necessary to our completeness, but it is a true instrument only when its feelings and tendencies have been purified by PSYCHIC touch and taken up and governed by the SPIRITUAL light and power.

vitalityর অর্থ হল প্রাণশক্তি। যেখানে প্রাণ আছে — উদ্ভিদে, পশুতে কিংবা মানুষের মধ্যে, সেখানেই আছে প্রাণশক্তি। এই vital ছাড়া জড় জীবনহীন, প্রাণিক ক্রিয়াহীন।

এই vital বা প্রাণ হল সেই প্রাণশক্তি যা নিজ প্রকৃতির নিয়মে কাজ করে চলেছে, আবেগ, অনুভূতি, বাসনা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে। শ্রীঅরবিন্দ বলছেন এসবের সর্বোচ্চ কেন্দ্র হল 'outer heart of emotion', হৃদয়ের বাহির মহল যেখানে আবেগ অনুভূতির বাস। হৃদয়ের অন্তরমহল আছে একটি, যেখানে থাকে ঊর্ধ্বের বা চৈত্যের স্পর্শানুভূতি, আবেগ কিংবা প্রজ্ঞালব্ধ আকুল আকাঙ্ক্ষা (intuitive yarnings) এবং আত্মার উজান-বাওয়া আবেগ। আমাদের মধ্যে প্রাণের (vital part) অবশ্য প্রয়োজন পূর্ণতার জন্য। কিন্তু প্রাণ তখনই একটি আদর্শ যন্ত্র হয়ে উঠতে পারে যখন তার ভাবনাগুলিকে, ঝোঁকগুলিকে (tendencies) চৈত্যের স্পর্শে (Psychic touch) বিশুদ্ধ করা সম্ভব হয় এবং যখন প্রাণ নিয়ন্ত্রিত হয় আধ্যাত্মিক আলো এবং শক্তির দ্বারা।

প্রাণ আছে কোথায়? অনির্বাণজী বলছেন, "জীবের দেহ আর মন, দুয়ের মাঝামাঝি রয়েছে প্রাণ — চিৎশক্তির অন্যতম বিভূতিরূপে। এই চিৎশক্তির একটা সুদূর লক্ষ্য আছে — রূপের মধ্যে অনিঃশেষে আপনাকে কুটিয়ে তোলা। প্রাণ সেই লক্ষ্যসিদ্ধির সাধন। কিন্তু প্রাকৃত জগতে আমরা তার যে-প্রকাশ দেখি, তাতে মনে হয় এই লক্ষ্যের চেতনা প্রাণের মধ্যে আচ্ছন্ন। এখানে প্রাণ পঙ্গু হয়ে আছে মনের মায়ায়। আমাদের মনশ্চেতনা সঙ্কুচিত; সে-সঙ্কোচ সংক্রামিত হয়েছে প্রাণের মধ্যেও। চেতনা নির্মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ হত যদি, তাহলে প্রাণও হত অজর অমর ও মহাবীর্যের আধার। কিন্তু বস্তুত প্রাণকে আমরা দেখতে পাই কামনায় আবিল, শক্তিহীনতায় পঙ্গু, মৃত্যুর দ্বারা কবলিত। মৃত্যু, কামনা আর অশক্তি — প্রাকৃত জগতে এই তিনের অভিশাপ প্রাণের 'পরে। তবুও বলব, এও নিরর্থক নয়, এও প্রকৃতি-পরিণামের একটা অঙ্গ।"

এবার আসি আজকের বিষয়টিতে। আমরা প্রাণকে কেমন করে শিক্ষা দেব। মা বলছেন যে সব কয়টি শিক্ষার মধ্যে প্রাণের শিক্ষাই বোধহয় সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য। কিন্তু এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উপলব্ধি, এবং সেই শিক্ষা গ্রহণ করা, এবং সেই শিক্ষার সুশৃঙ্খল অনুসরণ আমাদের জীবনে বড় বিরল ঘটনা। বেশ কিছু কারণ রয়েছে অবশ্য। সর্ব প্রথম কারণটি হল যে এই বিষয়টি সম্বন্ধে বেশীর ভাগ মানুষের ধারণা বড় ঘোলাটে, অর্থাৎ ব্যাপারটি সম্বন্ধে স্পষ্ট চিন্তাধারার অভাব। দ্বিতীয়, এবং মূল কারণ হল এই শিক্ষা গ্রহণ করা অতি কঠিন। মা বলছেন এ পরীক্ষা পাস করতে হলে চাই অফুরন্ত সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য এবং সমমাত্রায় চাই অধ্যবসায়। সর্বোপরি প্রয়োজন এমন একটি ইচ্ছা-শক্তি যাকে কোন পরাজয়ই দুর্বল করতে পারেনা। তাই আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয় এই বুঝি 'অসম্ভবের' এলাকা আরম্ভ হল।

মা বলছেন, যদি অফুরন্ত সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, অধ্যবসায় এবং হার-না-মানা ইচ্ছাশক্তি দিয়ে আটঘাট বাঁধতে পারি তবেই চাইতে পারি সাফল্যের আশা, কেননা, "vital in man's nature is a despotic and exacting tyrant." মানব প্রকৃতিতে প্রাণ হল স্বেচ্ছাচারী, শোষণকারী, অত্যাচারী শাসক। তাছাড়া যেহেতু প্রাণ মহাশক্তি-

ধর তাই তার হাতেই আছে ক্ষমতা, তেজ, কর্মশক্তি, উদ্যম ও ঘটন-পটু প্রগতিশীলতা (effective dynamism), তাই বহু মানুষ তাকে ভয়ে ভজে।

কিন্তু প্রাণ যে ভয়-ভক্তি কিছুরই তোয়াক্কা রাখে না। মা বলছেন, "But it is a master that nothing can satisfy and its demands are without limit." এ এক এমন প্রভু যার কিছুতেই তুষ্টি নেই। কোন খাজনাই তাকে খুশি করে না। কেবল 'আরও চাই, আরও দাও' রব।

প্রাণের এই জোর-জবুর মালিকানার একটি ইতিহাসের দিক আছে। ১৯৪৭-পূর্ব আমাদের দেশে যে যুগ শেষ হল সে যুগে plain living and high thinking-এর একটা আদর্শ ছিল। সে যুগের মানুষ ছিল অল্পে তুষ্ট। কামনা-বাসনা-চাহিদার সজাগ পরিশীলনা ছিলনা তখন। পাশ্চাত্যের সঙ্গে লেন-দেনে এটি এল আমাদের দেশে। মা বলছেন, দুইটি চিন্তাধারা পাশ্চাত্য দেশে মানুষের উপর প্রাণের মালিকানা ষোল-আনা কায়েম করে দিয়েছে। এসেছে প্রাণের সার্বভৌমত্ব।

প্রথম চিন্তাধারা বলে, "the chief aim of life is to be happy." জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য কিনা সুখী হওয়া।

দ্বিতীয় চিন্তাধারা বলে, "One is born with a certain character and that it is impossible to change it." আমরা জন্মেছি একটি বিশেষ চরিত্র নিয়ে এবং সেটি পরিবর্তন করা অসম্ভব।

প্রথম ধারণা অর্থাৎ জীবনের মূল উদ্দেশ্য সুখ আহরণ তা, মা বলছেন, একটি অতি গভীর সত্যের বিকৃত রূপ। সত্য কি, না, সকল অস্তিত্ব সত্তার আনন্দে বিধৃত এবং সত্তায় আনন্দ বিহনে কোন জীবনই নেই। কিন্তু সত্তার এই যে আনন্দ তা হল দিব্যের একটি গুণ এবং সেইজন্য শর্তহীন; অর্থাৎ কোন শর্তে সেই আনন্দ আহরণ করা যায়না। সেই শর্তহীন দিব্য আনন্দ এবং আমোদ-খোঁজা জীবন এক নয়। 'সুখ চাই' দলের মানুষের বক্তব্য হল, 'নিজের জীবন তুমি নিজে বাঁচাবে' এবং সেই বাঁচা যা মূল্য দিয়ে কিনতে হবে, তা দেবে। তাতে কার কি বলার আছে?

মা বলছেন, "This attitude, by its obscure and aggressive egoism leads to every kind of conflict and misery, disappointment and dicouragement and very often ends in catastrophy." এই জীবন-ভঙ্গির লুকিয়ে থাকা দামাল অহং যে মানুষকে ঠেলে দেয় নানা প্রকার দ্বন্দ্ব, দুর্দশা, না-পাওয়ার গ্লানির মধ্যে। লাগে নিষ্ক্রমণের ভাঁটার টান এবং শেষমেষ বহু ক্ষেত্রে দেখা দেয় দুঃখময় রিক্ত পরিণতি।

তবে জীবন থেকে কি চাইব? মা বলছেন, "In the world as it is now the goal of life is not to secure personal happiness, but to awaken the individual progressively to the Truth-consciousness." পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতিতে, ব্যক্তিগত সুখসঞ্চয়ই জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত নয় বরং লক্ষ্য হবে ব্যক্তির সৎ-চিৎ-এর পথে প্রগতিশীল উর্দ্ধায়ন। Truth-consciousness কি? শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, "By a Truth-consciousness is

meant — a Knowledge consciousness which is immediately, inherently and directly aware of Truth in manifestation and has not to seek for it like Mind." Truth-consciousness সেই জ্ঞান চৈতন্য যা তৎক্ষণাৎ, সহজাত ভাবে এবং সরাসরি জানতে পারে সত্যকে তার বিকাশের মধ্যে। সত্যকে জানার জন্য জ্ঞান চৈতন্যটিকে খুঁজে বেড়াতে হবেনা, মন যেমন করে খোঁজে সেই ভাবে।

এবার দেখা যাক দ্বিতীয় ধারণাটি : কিনা চরিত্র পরিবর্ত্তন করা অসম্ভব। মা বলছেন যে এই ধারণাটির কারণ হল চরিত্রের ভিত্তিগত পরিবর্ত্তন করার সাধনা বড় কঠোর। কেন কঠোর? কারণ এ সাধনায় চাই অবচেতনের (subconscient) উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব। সংক্ষেপে দেখে নেওয়া যাক (subconscient) বা অবচেতন কি? শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, "In our yoga we mean by the subconscient that quite submerged part of our being in which there is no wakingly conscious and coherent thought, will or feeling or organized reaction, but which yet receives obscurely the impressions of all things and stores them up in itself and from it too all sorts of stimuli, of persistent habitual movements, crudely repeated or disguised in strange forms can surge up into dream or into the waking nature." শ্রীঅরবিন্দ-মায়ের যোগে subconscient বা অবচেতন বলা হয় সত্তার সেই বেশ ডুবে থাকা অংশটিকে যেখানে জাগ্রত সচেতন এবং সুসঙ্গত চিন্তা, ইচ্ছা অথবা অনুভূতি কিংবা সংগঠিত প্রতিক্রিয়া নেই। কিন্তু সেই অংশটিতে গোপনে সব কিছুর ছাপ পড়ে, জমা থাকে। আবার সেখান থেকেই সর্বপ্রকার প্ররোচনা পায় নাছোড়বান্দা যতসব অভ্যাসগত গতি, তাদের অনাজিত পুনরাবৃত্তি অথবা অদ্ভুত ছদ্মবেশধারী আকৃতি সব ঠেলে উঠতে পারে স্বপ্নে কিংবা জাগ্রত প্রকৃতিতে। চরিত্র পরিবর্তনের তপস্যায় এই অংশটির উপর, মা বলছেন, অধিকার চাই।

সঙ্গে সঙ্গে কঠোর অনুশাসনের প্রহরায় রাখতে হবে যা কিছু উঠে আসে inconsient বা নিশ্চেতন থেকে। Inconscient বা নিশ্চেতন কি? 'The Inconscient itself is only an involved state of consciousness which like the Tao or *Sūnya*, though in a different way, contains all things suppressed within it so that under a pressure from above or within all can evolve out of it...? Inconscient বা নিশ্চেতন হল সত্তার গুটিয়ে থাকা অবস্থা, 'তাও' বা শূন্যের মত, যদিও ভিন্নভাবে। এই নিশ্চেতন আধারে সব কিছু গুপ্ত অবস্থায় গচ্ছিত আছে যাতে উর্দ্ধ থেকে কিংবা ভিতর থেকে pressure বা চাপ এলে সব কিছু পাক খুলে প্রকাশ হতে পারে

মা বলছেন নিশ্চেতন থেকে যা উঠে আসে, সাধারণ মানুষের প্রকৃতিতে সেগুলি হল চরিত্রে পূর্বপুরুষদের দোষগুণের পূর্বানুকৃতি (atavism) এবং যে পরিবেশে জন্ম তার প্রভাব। বলছেন, "Only an almost abnormal growth of con-

sciousness and the constant help of Grace can achieve this Herculean task" কেবল চেতনার প্রায় অস্বাভাবিক উন্নতি এবং দিব্য করুণার নিরবচ্ছিন্ন সাহায্যই এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। অসাধ্য সাধন করতে পারে। তাই বহু নারী-নারী সাধক-জ্ঞানী এ পথ পরিক্রমা করেছেন ক্বচিৎ কদাচ। এই উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ আরোহণের চেষ্টা ত্যাগ করেছেন তাঁরা। এ পথকে আখ্যা দিয়েছেন, 'অসাধ্য, অদ্ভুত, অসার কল্পনা।'

মা বলছেন, "yet it is not unrealisable, the transformation of character has in fact been realised by means of a clear-sighted discipline and a perseverance so obstinate that nothing, not even the most persistent failures, can discourage it." মা বলছেন এ কাজ তবু অসাধ্য নয়। চরিত্র পরিবর্তনের কাজ সফল হয়েছে। উপায় দুইটি : প্রথমটি হল স্বচ্ছদৃষ্টি অনুশাসন এবং দ্বিতীয়টি হল অধ্যবসায়। এই অধ্যবসায়ের এক গুঁয়েমি কেমন হবে, না, ব্যর্থতা যদি ফিরে ফিরেও আসে তবুও নিরুৎসাহ করতে পারবে না সেই অধ্যবসায়ের নিষ্ঠাকে।

তবে কোথায় করি শুরু? অপরিহার্যভাবে একটিই starting-point আছে। বাউল মাঝির ভাষায় নিজেকে নিজে বলতে হবে, 'পশরা নামাও দেখি'। রূপান্তরকামী চরিত্রটির পশরা নামিয়ে সবকিছু খুঁটিয়ে খতিয়ে, ছান-বিন করে নিক্তি-তৌল করে অন্তর-মাঝিকে দেখাতে হবে, তবেই মাঝি পারাণির কড়ি গুণে নেবে।

কিন্তু এযে বড় শক্ত কাজ। বড় দুরূহ অনেক ক্ষেত্রে। অন্তরের পথ কেমন যেন গোলকধাঁধা। ভুলভুলাইয়ার এক সুড়ঙ্গ দিয়ে গাইড বিনা নেমে গেলে, অনেক পাক খাইয়ে সে সুড়ঙ্গ পথ যে আবার starting-point-এ ফেলে দিয়ে যায়। সমস্যা হ'ল আমি — যে আমার মধ্যে লক্ষ্ণৌর চলন্ত ভুলভুলাইয়া নিয়ে বসে আছি। অতীত ঐতিহ্যে একটি সূত্র জানা ছিল যা আমাদের অন্তর প্রাসাদের চাবিকাঠি হতে পারে। সেই সূত্রটি কি? না, মা বলছেন প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আছে, "two opposite tendencies of character, in almost equal proportions, which are like the light and the shadow of the same thing", দুইটি বিপরীত প্রবণতা আছে আমাদের চরিত্রে, প্রায় সমমাত্রায়, যাকে বলা যায় একই বস্তুর আলো এবং ছায়ার দুইটি দিক। এখন এই বিপরীত ধারার গতি চিনব কি ভাবে? মা উদাহরণ দিচ্ছেন। এক ব্যক্তি যে স্বভাবতই অতি বদান্য, উদার দানশীল, তার মধ্যে নেহাৎ সহসাই যদি দেখা যায় গোপায় অবাধ্য ধনলিপ্সা লুকিয়ে আছে তবে তাই হল সেই আলো-ছায়ার খেলা। অসমসাহসী মানুষের সত্তায় চোরাকুঠরিতে লুকিয়ে থাকে কাপুরুষ; কিংবা ভালমানুষ যখন বিগড়ে যায় নষ্ট আবেগের আচমকা ধাক্কায় তখন জানা যায় এই দুইটি বিপরীতের অস্তিত্ব।

দাঁড়াল কি, না, জীবন আমাদের সামনে ধরে দিয়েছে আলোর দিক, যেখানে আছে আদর্শের স্ফুরণের সম্ভাবনা; অপর দিকে ছায়ার রাজত্ব আছে অন্ধকারের হানাদারদের এক্তিয়ারে, যাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে নামতে বলছেন মা, অন্তরের সম্ভাবনা সফল করে তোলার

জন্য। "Consequently all life is an education pursued more or less willingly." মা বলছেন, সারাটা জীবনই একটি শিক্ষা যা চালিয়ে যেতে হবে মোটামুটি সচেতনভাবে, স্ব-ইচ্ছায়।

মা বলছেন, "In certain cases this education will encourage the movements that express the light, in others, on the contrary, those that express the shadow." কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই শিক্ষা পদ্ধতিতে আলোর গতি সচল হয়ে উঠবে, অপর দিকে অন্যদের বাড়বে ছায়ানুগতা। পরিবেশ যদি অনুকূল থাকে তবে ছায়া সরিয়ে, জেগে উঠবে আলোর দীপশিখা। প্রতিকূল অবস্থায় উল্টো ফল হতে পারে। মা বলছেন খেয়ালি প্রকৃতির হাতে চরিত্র তৈরীর ভার না দিয়ে তার খেয়ালখুশির স্থানে আনতে হবে সচেতন সংকল্প, যুক্তি, বিচক্ষণ-অনুশাসন। "This conscious will is what we mean by rational method of education", মায়ের rational method of education factor-এ সব থেকে বড় ফ্যাক্টর হল সচেতন সংকল্প।

সেইজন্য মা প্রাণের শিক্ষার উপর প্রাথমিক গুরুত্ব দিয়ে বলছেন যেন সেই শিক্ষা আরম্ভ করা হয় শৈশব থেকে, ঠিক যখন থেকে শিশু তার জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি (senses) ব্যবহার করতে আরম্ভ করবে। "In this way many bad habits will be avoided and many harmful influences eliminated." এইভাবে শিশু বহু বদ অভ্যাস এড়িয়ে যেতে পারবে, বহু ক্ষতিকর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারবে।

মা বলছেন, প্রাণের শিক্ষার দুইটি মূল দিক আছে। দুইটির উদ্দেশ্য এবং অভ্যাস-নিয়ম ভিন্ন, কিন্তু দুইটির গুরুত্ব একই।

প্রথমটি হল জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির (sense organs) যথাযথ ব্যবহার এবং উন্নতি সাধন। দ্বিতীয়টি নিজের চরিত্রটিকে চেনা, জানা এবং তার উপর প্রগতিশীল কর্তৃত্ব, যে প্রগতির সর্বোচ্চ সিঁড়ি হল রূপান্তর। ইন্দ্রিয়গুলিকে শিক্ষা দেবার আবার অনেকগুলি দিক আছে। সত্তা যেমন যেমন গড়ে উঠতে থাকে, সেই সঙ্গে একটির সঙ্গে অন্য পথ যুক্ত করে দেওয়া যায়। ইন্দ্রিয়গুলিকে বশ করে শেখালে, মা বলছেন, তাদের কর্মক্ষমতা ও নির্ভুলতা সাধারণ স্তর থেকে অনেক উর্ধ্বে তোলা যেতে পারে। বলছেন, মানুষ শুধু পাঁচটি নয়, সাতটি ইন্দ্রিয়ের বিকাশ ঘটাতে পারে। অতীতে সাধকরা বারটি ইন্দ্রিয় বিকশিত করতে সক্ষম হয়েছেন। অতীতে যে সব ক্ষমতার ব্যাখ্যা দেওয়া আছে তার একটি উদাহরণ হল দেহ-চৈতন্যের সম্প্রসারণ ক্ষমতা। নিজেকে নিজের ভিতর থেকে বাইরে প্রসারিত করে একটি চিহ্নিত কেন্দ্রে একাগ্র হওয়া (concentrate) যাতে দূর থেকে সেই বস্তু বা স্থান দৃষ্টিগোচর হয়। শুধু তাই নয় শ্রবণ, গন্ধ, আস্বাদ এবং এমন কি স্পর্শ পাওয়া যায়।

মা বলছেন, ইন্দ্রিয়ের সাধারণ শিক্ষাক্রমের সঙ্গে, যত শীঘ্র সম্ভব দুইটি বিষয় যোগ করে দিতে হবে। প্রথমটি হল ভালমন্দের খুঁটিনাটি পার্থক্য বিচার করা বা বেছে নেবার ক্ষমতার স্ফুরণ (discrimination) এবং অন্যটি হল aesthetic sense অর্থাৎ সেই সৌন্দর্যবোধাবিষ্ট হতে শেখা। বলছেন, "the capacity to choose and

adopt what is beautiful and harmonious, simple, healthy and pure," এমন একটি ক্ষমতা গড়ে তোলার কথা মা বলছেন যা বাছতে পারবে, পছন্দ করবে এবং গ্রহণ করবে যা কিছু সুন্দর, সমন্বয়পূর্ণ, সরল-সহজ, স্বাস্থ্যকর এবং শুদ্ধ। কিসের প্রয়োজনে, না, ব্যক্তির psychological স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে। "For there is a psychological health just as there is a physical health, a beauty and harmony of sensations as of the body and its movements." দেহের স্বাস্থ্য ছাড়াও আর একটি স্বাস্থ্য আছে, সেটি হল মনস্তাত্ত্বিক স্বাস্থ্য। মনস্তাত্ত্বিক সংবেদনের অভিব্যক্তিতে, মা বলছেন, চাই সৌন্দর্য-সুষমা যেমন দেহ এবং তার গতিভঙ্গিতে কোটা চাই লাবণ্য, সৌষ্ঠব। বলছেন, যেমন যেমন শিশুর বোঝার ক্ষমতা বাড়বে, তার মধ্যে দিতে হবে artistic taste — শিল্পীসুলভ রুচি, এবং শেখাতে হবে refinement সূক্ষ্মতা, পরিমার্জনা, ভদ্রতাসুন্দর বস্তুর দিকে, গুণের দিকে শিশুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে যাতে প্রকৃতিতে কিংবা মানুষের সৃষ্টিতে শিশু খুঁজে পায় সৌন্দর্য, তার সৌন্দর্যের মূল্যবোধ জাগে। শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, "the highest activity of the artistic sense...is the direct purifying of emotions সুচারু-রুচির সব থেকে বড় দান হল আবেগ-অনুভূতির বিশুদ্ধিকরণ। বলছেন "The mind is profoundly influenced by what it sees and, if the eye is trained from the days of childhood to the contemplation and understanding of beauty, harmony and just arrangement in line and colour and taste, habits and character will be insensibly trained to follow a similar law of beauty, harmony and just arrangement in the life of the adult man." মন যা দেখে তার প্রভাব গভীর। তাই শ্রীঅরবিন্দ বলছেন যদি শিশু বয়স থেকেই চোখ তৈরী করে দেওয়া যায় সৌন্দর্য এবং সৌষম্যবোধে, রেখা, রং, রুচি, অভ্যাস এবং চরিত্রের সার্থক বিন্যাসে তবে দেখা যাবে যে শিশু যখন প্রাপ্তবয়স্ক হবে তখন আপনা থেকেই তার জীবনে সৌন্দর্যে সৌষম্যের এবং সুবিন্যাসের নিয়মগুলি প্রতিফলিত হবে। তারপরই শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, "Art galleries cannot be brought into every home, but, if all the appointments of our life and furniture of our homes are things of taste and beauty, it is inevitable that the habits, thoughts and feelings of the people should be raised, ennobled, harmonised, made more sweet and dignified." আর্ট গ্যালারিগুলি বাড়িতে আনা সম্ভব নয় নিশ্চয়ই কিন্তু আমাদের জীবনের সাজসরঞ্জাম, বাড়ির আসবাবপত্র যদি রুচিকর ও সুন্দর হয় তবে অপরিহার্যভাবে মানুষের স্বভাব, চিন্তা, অনুভূতি উন্নত হবে, আসবে আভিজাত্য, হবে সুসংগত, হয়ে উঠবে আরও সৌজন্যপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ।

আবেগ-অনুভূতিকে কি ভাবে শোধন? শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, "...Poetry raiess the emotions and gives each its separate delight. Art stills the

emotions and teaches them the delight of a restrained and limited satisfaction... Music deepens the emotions and harmonises them with each other. Between them, music, art and poetry are a perfect education for the soul; they make and keep its moments purified, self-controlled, deep and harmonious. সুন্দর ও মহৎ নিক্ষেপের প্রভাব আমাদের emotions অর্থাৎ আবেগ-অনুভূতির উপর পড়ে। কেমনভাবে, না, কবিতা আবেগের এলাকায় জোয়ার আনে, আনন্দময় আস্বাদের ঢেউ তোলে। আর্ট নীরব করে আবেগ, এবং শেষার সংযম এবং সীমার মধ্যে কেমন করে রসগ্রহণ করতে হয়। সঙ্গীতের কাজ হল অনুভূতিকে গভীরে নিয়ে যাওয়া। নানা আবেগের মধ্যে পরস্পর সমন্বয় সাধন করা। শ্রীঅরবিন্দ বলছেন যে, সঙ্গীত, আর্ট এবং কবিতা আত্মার উৎকৃষ্ট শিক্ষার পথ, আত্মার গতিগুলিকে এই ত্রয়ী শুদ্ধ করে, শুদ্ধ রাগে, আনে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ, নিয়ে যায় গভীরে এবং রাখে সৌষমাপূর্ণ করে।

একটি সভ্যকার aesthetic culture গড়ে তোলার প্রয়োজনের কথা বলছেন যা শিশুকে হানিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করবে। মা বলছেন, অশ্লিল প্রভাবগুলি এসেছে গত মহাযুদ্ধের পায়ে পায়ে, স্নায়ুর উপর তার প্রবল চাপ ইঙ্গিত দিল যে সভ্যতার শরীরে ঘুণ ধরছে, এসেছে সামাজিক অবক্ষয়, স্থূল অমার্জিত রুচি (vulgarity) জোর কদমে এগিয়ে এসেছে মানুষের জীবনে — তা সে ব্যক্তিরই হোক কিংবা সমষ্টির হোক — বিশেষ করে রুচির জগতকে, ইন্দ্রিয়ানুভূতির জগতকে তোলপাড় করছে। মা বলছেন এর বিরুদ্ধে বর্ম হল, "A methodical and enlightened cultivation of the senses", এবং উন্নত রুচি চর্চাই ক্রমে ক্রমে শিশুকে মুক্ত করবে স্থূল, তুচ্ছ, অমার্জিত স্নায়ুখল আবহাওয়ার দূষিত সংক্রমণ থেকে। মা বলছেন, "This will have a very happy effect even on his character," চরিত্রের উপরও এর সুফল আছে, কারণ সত্যিই যার রুচি উন্নত, তার সংস্কৃতিই যে বাধা দেবে স্থূল অমার্জিত ব্যবহার করতে এবং "This refinement, if it is sincere, brings to the being a nobility and generosity which will spontaneously find expression in his behaviour and will protect him from many base and perverse movements"; বলছেন, যদি সাংস্কৃতিক সূক্ষ্মতা আন্তরিক হয় তবে সত্তায় আসবে যে মহত্ত্ব এবং উদারতা, তারই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ হবে শিশুর ব্যবহারে এবং তাইতো রক্ষা করবে তাকে অনেক হীন, অসৎ, উচ্ছৃঙ্খল গতি থেকে।

এরপর আসে প্রাণের শিক্ষার দ্বিতীয় দিকটি : চরিত্র এবং তার পরিবর্তন। সাধারণত যে সব সাধনপথ vital being বা প্রাণসত্তা নিয়ে কাজ করেছেন বা করেন, দেখা যায় তাঁরা প্রাণ-সত্তাটিকে বাগিয়ে ধরতে চান, রাখতে চান নিজের তাঁবে, তাই তাঁদের ধরতে হয় পীড়নের পথ। vital অবাধ্য হলে প্রয়োগ করতে হয় দমননীতি। সত্তার চারি দিকে অবরোধের দেওয়াল তুলে দেওয়া হয় — যার অন্য নাম সংযম, কঠোর তপশ্চর্যা। প্রাণ খর্ব হয়ে যায়। হয়ে যায় ঠুঁটো, বিকলাঙ্গ। প্রাণের প্রাণ যায় শুকিয়ে।

তবে এই সাধন-পদ্ধতি মেনে চলা কেন? কারণ এই দমনপথ যে সোজা পথ।

মা বলছেন, সত্বর এই পথে ফল পাওয়া যায় তাই। যদিও সেই ফল (result) গভীর ভাবে স্থিতিশীল ও সক্রিয় হয়না। তাই মায়ের পথ হল . প্রাণকে দিতে হবে অব্যাহতি-হীন, নিরন্তর-মানা পুঙ্খানুপুঙ্খ শিক্ষা। মনন-নীতি-শাসন প্রতিবন্ধী প্রাণ যে প্রয়োজনে হস্ত-ক্ষেপ করতে পারে না, পারেনা সাহায্য বা সহযোগিতা করতে। মা বলছেন, প্রাণের সাহায্য ও সহযোগিতা চাই। ব্যক্তির গড়ে ওঠার জন্য এবং কর্মের পরিপূর্ণতার ক্ষেত্রে প্রাণের সাহায্যের চরম গুরুত্ব আছে।

মা বলছেন, নিজের মধ্যে বিবিধ গতিগুলির সম্বন্ধে সচেতনতা, নিজের কর্ম এবং তার কারণ সম্বন্ধে জানার কাজই হল এই শিক্ষার অপরিহার্য সূচনা — "indispensable starting point", মা বলছেন শিশুকে শেখাতে হবে কেমন করে নিজেকে দেখতে হয়, চিনতে শেখাতে হবে তার প্রতিক্রিয়াগুলিকে (reactions), আবেগগুলিকে (impulses) এবং সেই আবেগসৃষ্টির মূল কারণ কি : যাতে শিশু বিচার করতে পারে তার মধ্যে বাসনা-কামনা, হিংসাত্মক বা প্রচণ্ড আবেগের গতি, তার স্বার্থপরতার ভাব, তার ভোগ-দখলের সহজাত প্রবৃত্তি সব আসে কোথা থেকে। সে যখন পরিবারের মধ্যে নিজের প্রাধান্য জাহির করে তারই বা কারণ কি হতে পারে। তাকে দেখতে শেখাতে হবে তার দম্ভটিকে এবং সেই সঙ্গে দম্ভের চালচিত্র। এছাড়া দম্ভের বাহনদেরও চিনিয়ে দিতে হবে যাদের নাম দুর্বলতা, নিরুৎসাহ, বিষণ্ণতা এবং হতাশা।

মা বলছেন, এই শিক্ষাপদ্ধতিকে কার্যকর করতে হবে, নিজেকে দেখার শক্তিটি বেড়ে ওঠার সাথে সাথে গড়ে তোলা প্রয়োজন প্রগতির এবং পূর্ণতাপ্রাপ্তির সংকল্প। এই সঙ্কল্পটি শিশুর মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে হবে ঠিক সেই সময় যখন থেকে শিশু সংকল্প করতে পারবে। মা বলছেন, শিশু বেশ অল্প বয়স থেকেই সঙ্কল্প করতে পারে।

এই সংকল্প তাকে শেখাব কেমন করে? শেখাব কেমন করে উর্দ্ধায়ণের ইচ্ছা, জয়ের ইচ্ছা? এক নিয়ম কি সব শিশুর ক্ষেত্রে খাটবে?

মা বলছেন, ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা। কেউ বুঝবে যুক্তি, তাকে যুক্তি দিয়ে শেখাতে হবে। কারু জন্য তার চরিত্রের কোমলতা, তার মঙ্গলকামনা (good-will, কাজে লাগাতে হবে, আবার অন্য কারু ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে হবে তার মর্যাদাবোধ আত্মসম্মানবোধ। সর্বোপরি মা বলছেন, "For all, the most powerful method is example constantly and sincerely shown, প্রত্যেকের জন্য সব থেকে শক্তিশালী পদ্ধতি হল উদাহরণ। এই উদাহরণ অতি আন্তরিকভাবে সর্বক্ষণ শিশুর সামনে রাখতে হবে।

একবার সংকল্পটি ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে, মা বলছেন তখন এগিয়ে যেতে হবে উদ্যমের সঙ্গে (vigorously) এবং সংকল্পে অটল থেকে, কোন পরাজয়কেই চূড়ান্ত না মেনে। দুর্বলতা বা পিছনে পিছলে যাবার হাত থেকে বাঁচবার কবচমন্ত্র মা দিচ্ছেন; এরপর বলছেন, "the will can be cultivated and developed just as the muscles can by methodical and progressive exercise. You must not shrink from demanding the maximum effort of your will even for a thing that seems of no importance, for it is through effort

that its capacity grows, gradually acquiring the power to apply itself even to the most difficult things. When you have decided to do, you must do, whatever the cost, even if you have to renew your effort over and over again any number of times in order to do it. Your will will be strengthened by the effort and you will have only to choose with discernment the goal to which you will apply it." ইচ্ছাশক্তি গড়ে তোলা যায়, সম্প্রসারিত করা যায় ঠিক যেমনভাবে দেহের পেশী শক্তিশালী করা যায় নিয়মিত, সুশৃঙ্খল, প্রগতিশীল ব্যায়ামে। মা বলছেন, নিজের ইচ্ছাশক্তির কাছে সর্বাধিক (maximum) প্রয়াস দাবী করতে কখনও পিছিয়ে যাবে না, এমন কি আপাত দৃষ্টিতে যে সব জিনিসের গুরুত্ব নেই, সেই সব সাদামাটা জিনিসের ক্ষেত্রেও না। কারণ প্রয়াসের সাহায্যেই ইচ্ছাশক্তির ক্ষমতা বাড়ে এবং ক্রমে ক্রমে সেই অনুশীলিত ইচ্ছাশক্তি এমন ক্ষমতা অর্জন করে যা অতি দুরূহ কাজে লাগান যায়। মা বলছেন, যখন একটি কাজ করার সংকল্প গ্রহণ করেছ, তখন সেটিকে সম্পন্ন করতে হবে, তা যে মূল্যই দিয়ে হোক, এমন কি যদি সেই কাজটির জন্য বারবার অসংখ্যবার নতুন করে প্রয়াস করতে হয় তবুও। এতে ইচ্ছাশক্তি শক্তিশালী হবে। ইচ্ছাশক্তি কাজে লাগানর ব্যাপারে, মা বলছেন, স্থির করে নিতে হবে উদ্দেশ্যটিকে। চুলচেরা হিসেবে ভাল-মন্দ যাচাই করে সঠিক লক্ষ্যে প্রয়োগ করতে হবে ইচ্ছাশক্তি।

তাহলে শেষমেষ দাঁড়াল কি ? আমার নিজের চরিত্রের চতুর্দিক আমায় জানতে হবে। তারপর আমার নিজের গতিগুলির উপর অধিকার অর্জন করতে হবে। তারপর আসবে পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং পরিবর্তন (transformation)। কিসের পরিবর্তন না নিজের মধ্যে যে গতিগুলি চরিত্রের যে অংশগুলি, যে অস্তিত্বগুলির উপর কারেন করেছেন আপনার কর্তৃত্ব সেইগুলির পরিবর্তন।

মা বলছেন সব কিছুই নির্ভর করছে আদর্শটির উপর। সে আদর্শ ছুঁতে চাই বলেই পূর্ণ কর্তৃত্বের প্রয়াস। এবং পরিবর্তনের প্রয়াস। কারণ এই প্রয়াসের মূল্য এবং ফলাফল নির্ভর করছে আদর্শের মূল্য কি তার উপর। সেই মূল্যের কথা মা লিখেছেন তাঁর Mental education প্রবন্ধে। মায়ের লেখা Mental education আমরা আলোচনা করব পরের বার।

এই লভিনু সঙ্গ তব

দেবযানী
[প্রথম আশ্রম দর্শনের সময়]

অন্তরের গভীরতম কক্ষ হতে প্রতিটি দিন শেষে একটা প্রশ্ন বেরিয়ে আসে — কী পেলে? নীরব থাকি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন কিছু পাওনি?

বাইরের উর্বিমুখর বিশাল সমুদ্র তখন অন্তরে এসে উদ্বেল হয়। তাই এবারও আচ্ছন্নতা আমায় নীরব করে রাখে।

তৃতীয় প্রশ্ন তাহলে কি শূন্যতা নিয়ে ফিরছ?

সমুদ্রের লবণাক্ত জল এবার হৃদয়ের কূল অতিক্রম করে দু'চোখের মুক্তপথ বেয়ে অঝোরে নেমে আসে।

পণ্ডিচেরীর পুণ্যভূমিতে এসে রোজ আমি মালা গেঁথেছি রাধার চেতনা দিয়ে, আশ্লেষা দিয়ে, ধৈর্য দিয়ে, নূতন সৃষ্টি দিয়ে, শক্তি দিয়ে। চয়ন করেছি তুলসীপত্র। ধূপের ধোঁয়ার সাথে একাত্ম হয়ে নিজেকে নিজের সাধ্যমত অর্ঘ্য করে তুলেছি। কত ছিদ্রযুক্ত সে অর্ঘ্য, কিছু মলিন, কিছু অপূর্ণ। তবু তা নামিয়ে দিয়েছি যাঁদের রাতুল চরণে তাঁরা আমার পরম আশ্রয়, আমার উপাস্য। যা কিছু পূর্ণ করে দিতে পারিনি, তা তাঁরাই নেবেন পূর্ণ করে, এই বিশ্বাস নিয়ে ফিরে চলেছি।

আমি আমার হৃদয়দেবতার আলেখ্য, কাহিনী, বাণী তুলে দিয়েছি সমাগতদের হাতে। তারা প্রশ্ন করেছে তুমি কে?

উত্তরে কি বলেছি স্পষ্ট মনে পড়ে না।

নিজের হৃদয়ের দিকে চেয়ে অতি নির্জনে যখন প্রতীক্ষা করি, তখন সেই গভীরতম কক্ষ হতে আবার প্রশ্ন বেরিয়ে আসে : বল, তুমি কে?

বলতে সাহস হয়না — "সোঽহম্।" সে মৃদু হেসে বলে, 'পাগল, জানো না, তৎ ত্বমসি?' হৃদয়স্থিত সমুদ্র আবার উদ্বেল হয়। আমি, আমি কি তাই? সেই হবার যোগ্যতা আমার কৈ?

আমি তুলসীমঞ্জরীর একটি কনিষ্ঠ মঞ্জরী, শক্তির মহান্ আধার রক্তজবার একটি বিন্দুপরিমাণ হলুদ রেণু। অগণিত ভক্তের চরণের ধূলিরাশির একটি কণাপরিমাণ ধূলি।

কী পেয়েছি? তা পরিমাপ করবার শক্তি আমার নেই। রাখবার আধার আমার নেই। শুধু উপলব্ধি করছি, "পুণ্য হোল অঙ্গ মম, ধন্য হোল অন্তর, সুন্দর হে সুন্দর।" দিকে দিকে জনে জনে সুন্দরের উপাসনা দেখছি। মন্দির ঘিরে সুন্দর, মন্দিরের অলিন্দে সুন্দর, মন্দিরের বাইরে সুন্দর। আর, সবকিছু ব্যেপে সম্মিলিত সুন্দরের চেতনা। এই চেতনার সুতোয় গাঁথা হয়ে চলেছে ভক্তি, ধৈর্য, বিজয়, প্রেম, সাহস, উন্নতি ও নবজীবনের মালা।

আমি এই মালার স্পর্শ পেয়েছি গো। আমি তখনই মালা হয়ে গেছি। "কে নিবি গো কিনে আমায়।" আমি তীরে বসে আছি সেই ক্রেতার জন্য, যার সঙ্গ দেয় আনন্দ, দেয় প্রেম, দেয় শুদ্ধচেতনা, যে আমায় এমন একখানা মালা করে ভাবের সমুদ্রে হিল্লোলিত করছে।

তাই যাবার বেলায় এই শ্লোক আমার মন্ত্রধ্বনি, "এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর। পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর, সুন্দর হে সুন্দর।"

আমি ভক্ত নই, আমি জ্ঞানী নই, আমি ভগবানের কর্মীও নই। কি আমি তবে? — আমার প্রভুর হাতে ধরা আমি, দেব-রাখাল বালকের মুখে বাঁশী, ভগবানের ফুৎকারে চালিত পাতা একখানি।

স্বদেশ-প্রেমের কাব্য

সমীরকান্ত গুপ্ত

সকল দেশের জাতীয় সংগীত দেশাত্মবোধক, স্বদেশ-গরিমাসূচক, — তা দেশবাসীকে মহৎ ত্যাগে সেবার বীরত্বে প্রেরণা জুগিয়ে থাকে। শুনুন ফরাসীর কণ্ঠ —

চলো চলো দেশের ছেলেমেয়েরা !
দুয়ারে আগত গৌরবের দিন,
আমাদের বিরুদ্ধে নুগিয়ে উঠেছে
স্বৈরাচারের রক্তাক্ত নিশান...
দেশের জন্য নিকষিত প্রেম !
আমাদের বিনাশী বাহুতে দাও বল, দাও দিশা...
দেশবাসীরা, হাতিয়ার নাও হাতে ![1]

এই গান গেয়ে দেশপ্রেমে বিভোর ফরাসী আবালবৃদ্ধবণিতা জাতীয় সংকটে হাসিমুখে জীবনপাত করতে চলে যায়। বীররস এবং রুদ্রভাবের স্বাক্ষরটা এখানে বেশ পরিস্ফুট। ভারতীয় শহীদ কিন্তু এতে তৃপ্ত নয়, সে গেয়েছে —

সুজলাং সুফলাং
মলয়জ শীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরং

শুধু নয়নজুড়ানো প্রতিমা নয়, হৃদয়জুড়ানো জীবন্ত মাতৃমূর্তি। দেশের এই অপূর্ব রূপ দেশের সাধক সেবক সন্তানদের প্রতিনিধি কবির ঋষিদৃষ্টিতে প্রতিভাত। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দুর্গাস্তোত্রে দেশজননীর এই ধ্যানমূর্তিকেই আবাহন করেছেন।

জাতীয় সংগীতের সূত্রপাত হিসেবে এই যে একটু ভূমিকা টানা হল তা দেশপ্রেমের কাব্যে প্রবেশের অবলম্বনরূপে গ্রহণের জন্য। আমাদের বাংলা কাব্যের একটা উল্লেখ-যোগ্য অংশে বিষয়বস্তু দেশপ্রেম — চিরন্তন বিচিত্র নৈসর্গিক সৌন্দর্যের এবং অব্যাহত

---

[1] Allons, enfants de la patrie!
Le jour de gloire est arrivé:
Contre nous de la tyrannie,
L'étandard sanglant est levé...
Amour sacré de la patrie!
Conduis, soutiens nos bras vengeurs!...
Aux armes, citoyens!

আন্তরিক প্রেম ক্রোধাদি ভাবের মতো তা মহা মহা কবিদের চিত্ত আকর্ষণ করেছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও বিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত অন্যান্য প্রখিতযশা কবিদের সঙ্গে আরো কত অখ্যাত বাউল চারণ এবং কথকতা ও পালাগানের কর্তা বিচিত্র ঢঙে মূল ভাবটি ফুটিয়ে তুলেছেন।

তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গোরু,
শিখিনি সিং বাঁকানো,

ঈশ্বরচন্দ্রের এই হাস্যরস আর একটু —

বুঝি ছট বলে বুট পায়ে দিয়ে
চুরুট ফুঁকে স্বর্গে যাবে।

শ্লেষের ভঙ্গিতেই দেখা দিয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল এই ব্যঙ্গ-কৌতুক হাস্যরসকে দিয়েছেন তরবারির খুরধার, যার একটি মসৃণ প্রক্ষেপ নকল দেবতাটির ধড় থেকে মুণ্ডু কখন তার নিজেরই অজ্ঞাতসারে বিচ্ছিন্ন করেছে — প্রায় কারুণ্য পর্যায়ে শোচনীয়তার আলেখ্য উপস্থাপনের মতো —

মানুষ আমরা নহি তো মেষ —

কারুণ্য বিষাদের সুর আরো শুনুন —

থাকিলেও বঙ্গ তার নাম কে করিবে?
ভারত কি চিরদিন পরাধীন রবে।
(ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

কিম্বা,

কত কাল পরে, বল ভারত রে,
দুখ সাগর সাঁতারি পার হবে।
(গোবিন্দচন্দ্র রায়)

অথবা এই আর এক কবির —

বিধি এ দুর্যোগ হতে আর অব্যাহতি পেতে
কত দিন? এ বিপদ কত দিন রহিবে?

জান কত দিন পরে ঘনজাল মুক্ত ক'রে
আর্য্যাবর্ত্তে সূর্য্য পূর্ব্বমত উঠিবে?
(নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

কিম্বা অন্যত্র তারাক্রান্ত হৃদয়ে যখন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মৃদুকণ্ঠে বলে উঠেছেন —

ম্লান মুখচন্দ্র ভারতি তোমারি
হেরি দিবানিশি ঝরে নেত্রবারি
নিয়ত যে কান্তি, বরষিত শান্তি,
আজি তা কেমনে এমন নেহারি
দুখ-পারাবারে নিরখি তোমারে...

বলা বাহুল্য এ সকল দৃষ্টান্তের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারেন — তাঁর ভাষা প্রাণবন্ত, সে ভাষায় দুর্বার প্রবেগ; বিশ্বজুড়ে বৃহত্তের যে একটা ছন্দ আছে তার সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধ দ্বিজেন্দ্রলালের — সেই বৃহত্তের দোলা অন্যতর দৃষ্টিপ্রসঙ্গে কি অনুপম দেখা দিয়েছে —

যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব সে কি মা ভক্তি সে কি মা হর্ষ...

ভাবের এই অপ্রতিরোধ্য রাজকীয় গতিভঙ্গি এখানে যেন আকাশ থেকে অনাহত বিপুল আলোকপাতের মতো এসে পড়েছিল।

তবে স্থানান্তরে বীররসের প্রাধান্য যেখানে সেখানে কবিরা এনেছেন আর এক আলো; ভক্তি-মাধুর্য যদি হয় গ্রহচন্দ্রের আলো তাহ'লে এই বীরত্বভার কাব্য বিদ্যুতের ঝলকানি — তার সঙ্গে বজ্রের হুংকার একটা রুদ্রহুংকারের মতো শোনা গিয়েছিল —

"এখন সে দিন নাহিক রে আর,
দেব আরাধনে ভারত উদ্ধার
হবে না —, হবে না, — খোল তরবার;
এ সব দৈত্য নহে তেমন।..."

হেমচন্দ্র শ্রুতিমনোহর মৃদুভাষণের পরিবর্তে নিদ্রাভঙ্গের একটা তীক্ষ্ণ তীব্র স্বর ধরলেন। রঙ্গলাল প্রায় রণসংগীতই বাঁধলেন বেশ চড়া পর্দায় —

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?

দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়?
কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ-সুখ তায় হে,
স্বর্গসুখ তায়॥

নবীন সেন এরই ধুয়া ধরে সুর মেলালেন—

ভারত-সন্তান! দেখ না মাতার
লোলজিহ্বা শুষ্ক, শুষ্ক রক্তাধর,
দেহ বার কর করিয়া প্রসার,
সদ্য উষ্ণ রক্ত মাগে বারংবার,
নাহি কি ভারতে হেন বীরাচারী,
আপনার বক্ষ করি বিদারণ
করে, জননীর পিপাসা নিবারি',
ভারত-শ্মশানে শক্তি আরাধন?

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সমধর্মিতার সুরে বলে উঠলেন—

অত্যাচার ঐ দ্যাখ — গগনে
রক্ত-ধ্বজা তুলেছে।
শুনিছ না ক্ষেত্র-মাঝে
ভীষণ সৈন্যের হুঙ্কার?...

গোবিন্দচন্দ্র দাস মোহভঙ্গের উদ্দেশে শোনালেন,

স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছ কারে? এ দেশ তোমার নয়;
এই যমুনা গঙ্গা নদী, তোমার ইহা হ'ত যদি,
পরের পণ্যে, গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয়?...

আনন্দচন্দ্র মিত্র পরাধীনতার গ্লানি কি তীব্রভাবে অনুভব করেছেন, ক্ষোভে গ্লানিতে আপূর্ণ তাঁর অন্তর

দেখ রে চাহিয়া সবে এ কি অলক্ষণ!
কোটি বীরধাত্রী যিনি, সে ভারত অনাথিনী...
বীরশূন্য ভারত কি হয়েছে এমন?

বাঙ্গালীর স্বাধীনতা আন্দোলনে যে-বোধ রূপং দেহি রূপে battle cry হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে ভক্তিপ্রসূত — 'বন্দে মাতরং'। অন্য অনেক কবিরাও স্বদেশকে দেখেছিলেন জাগ্রতা দেবীরূপে মাতৃরূপে —

জান না কি জীব তুমি, জননী জনমভূমি,
যে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে?
(ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)

কিম্বা,

নিছা মণি মুক্তা হেম, স্বদেশের প্রিয় প্রেম
তার চেয়ে রত্ন নাই আর।
(ঐ)

তুমিই কি সেই মম জনন-ভবন —
জননী সমান চিরস্নেহরূপিণী?
তোমারই উৎসঙ্গে কি মা লভেছি জনম?
তুমি কি নয়নে চির আনন্দদায়িনী?...
(হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী)

এ শুধু মাতৃরূপিণী জন্মভূমির স্বরূপ মনন ও ধ্যান নয়,

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই;
দীন দুঃখিনী মা যে তোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই!...
(রজনীকান্ত সেন)

এ তার জাগ্রতরূপে আবাহন ও বোধন —

প্রণমি তোমারে আমি, সাগর-উর্ম্মিতে,
ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী, অয়ি জননী আমার!

তোমার শ্রীপদ-রজঃ এখনো লভিতে
প্রসারিছে করপুট কুরু পারাবার।
(অক্ষয়কুমার বড়াল)

কবি এখানে হৃদয়-দুয়ার খুলে রেখেছেন দেশমাতার জন্য। তাঁর হৃদয় আর্তিতে আকুল হলেও বেদনায় দ্রব — ভাষাও তাই তাঁ রণরঙ্গের জঙ্গাভিঘাত থেকে সরে এসেছে, এখানকার ছন্দের সুর সমতল-আশ্রয়ী স্রোতস্বতীর অবিক্ষুব্ধ ধারা-সঙ্গীত।

ভক্তি ও মাধুর্যের প্রায় অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। ভক্তিতে রয়েছে দাতা-গ্রহিতার আবিষ্ট-ভাব, ইষ্ট-অন্বেষুর অনুর সংসর্গ। এখানে মধুর রস সখ্যের মমতার প্রীতির সম্মিলনে জারিয়ে ওঠে। এ-রস তাই মধুর থেকে মধুরতর। এমন দেশপ্রেমে আপনদের নৈকট্যবোধ তাই একান্ত লোকান্তর্গত হয়েও মর্মস্পর্শী...

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে।
(মাইকেল)

আহা মরি! "স্বদেশ" কি সুধা-মাখা নাম!
মনে হয়, তার কাছে তুচ্ছ স্বর্গ-ধাম!
(মনোমোহন বসু)

অথবা,

তবু ভরিল না চিত্ত! সর্ব-তীর্থ সার,
তাই মা, তোমার পাশে এসেছি আবার!
(দেবেন্দ্রনাথ সেন)

কিংবা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যেখানে সহজতর সুরে জন্মভূমিকে স্বাদেশিকতার উপাস্য রূপে অতুলনীয় করে দেখিয়েছেন

কোন্ দেশেতে তরুলতা —
সকল দেশের চাইতে শ্যামল?
কোন্ দেশেতে চল্‌তে গেলেই
দ'লতে হয় রে দুর্বা কোমল?

কোথায় ফলে সোনার ফসল,
সোনার কমল ফোটে রে?
সে আমাদের বাংলাদেশ,
আমাদেরি বাংলা রে!

মনে হয় না কি কবি আমাদের কাছে নিত্য-পরিচয়ের দ্বারা অবহেলিত জন্মভূমিকে আবার নূতন করে আমাদের দৃষ্টির সামনে এনে ধরেছেন, নূতন করে তার প্রতি আমাদের ভালোবাসা জাগিয়ে দিয়েছেন, নূতন ব্রতে আমাদের প্রবুদ্ধ করছেন।

দু'জন শ্রেষ্ঠ কবির নাম এ পর্যন্ত উল্লেখ করি নি — অদ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল, তাঁদের মধ্যে নবরসের কোনোটিরই যে উৎকর্ষ প্রকটিত হয় নি তার জন্য নয়; তাঁরা রস-বৈচিত্র্যের একেবারে উৎসটি ধরেই প্রকাশিত বলে ভিন্ন শ্রেণীর। ভাবের মূলে যেমন ভাব তেমনি রসের মূলে আবার রস, দৃগ্রাহ্য ভাব এবং দৃগ্রাহ্য রস। মানুষের জীবসত্তা নানা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে নানা ভাবে কেন্দ্রমূলে পৌঁছায়, বিভিন্ন রস আস্বাদন করে তবে সে আবার হতে পারে আত্মরস-সমাহিত — যে রস তার আত্মায় তা দিয়ে সে এক অনির্বচনীয় রস সর্বভূতে প্রত্যক্ষ করে। তার দৃষ্টিতে তখন একটা অসীমের নীলাঞ্জন, তার অনুভবে সর্বগামিতার ঔদার্য, তার বাণীর চারুকলায় একটা লোকোত্তরের মূর্ছনা —

আমি ইন্দ্রাণী-সুত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য্য,
মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণ-তূর্য্য।

এ এক বিস্ময়কর কবিচেতনার ভাষা —

বাজাও প্রভু বাজাও ঘন বাজাও
ভীম বজ্র-বিষাণে দুর্জয় মহা-আহ্বান তব,
বাজাও, —

অগ্নি-তূর্য কাঁপাক সূর্য
বাজুক রুদ্রতালে ভৈরব —
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও!

দাসত্বের এ ঘৃণ্য তৃপ্তি
ভিক্ষুকের এ লজ্জাবৃত্তি
বিনাশ জাতির এ লাজ, দাও তেজ মুক্তির গরব —
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও!...

কিম্বা,

ধর হাত ওঠ রে আবার
দুর্যোগের রাত্রি কাবার,
ঐ হাসে মা'র মূর্ত্তি মনোহর রে।

অথবা,

ঐ অভ্র-ভেদী তোমার ধ্বজা
উড়লো আকাশ-পথে।
যাগো তোমার রথ-আনা ঐ
রক্ত সেনার রথে॥

ললাটে-ভরা জয়ের টিকা,
অঙ্গে নাচে অগ্নি শিখা,
রক্তে স্বদেশ বহ্নিলিখা — মা।
ঐ বাজে তোর বিজয়-ভেরী,
নাই দেরী আর নাই মা — দেরী,
মুক্ত তোমার হতে॥

এই কবিকণ্ঠে বেজে উঠেছে কালপুরুষের কণ্ঠ — যে-কণ্ঠ প্রকৃতির অভীপ্সার আরীর, প্রকৃতি-চেতনার অভিন্নাত্মা। নজরুলের বীররস তাই রসোত্তমের সন্ধানী — যে আনন্দরস সর্বরসের আশ্রয় ও আকর। রবীন্দ্রনাথ এই আনন্দরসের অনায়াস অধিকারী। তিনি সর্ব ভাব ও সর্ব রসানুভূতিকে শিল্পের এক অনিন্দ্য রসে — ব্রহ্মরস-সহোদর এক অনিন্দ্য-রূপের উপলব্ধিতে — এনে ধরেছিলেন। তাঁর কাব্যশিল্পের মহত্বে সব রস সব বৈচিত্র্য এক পূর্ণবিরবের মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যে পরিবৃত — এক মহা সমন্বয়ে গভীরতমের প্রকাশ তাতে —

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে,
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।
ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে মোদের আঁখি ফুটবে,
ততই মোদের আঁখি ফুটবে॥...

(স্বদেশ)

কিম্বা,

জননীর দ্বারে আজি ওই শুন গো শঙ্খ বাজে।
থেকো না থেকো না, ওরে ভাই মগন মিথ্যা কাজে॥

অথবা,

বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি, বারে বারে হেলিস নে ভাই!
শুধু তুই ভেবে ভেবেই হাতের লক্ষ্মী ঠেলিস নে ভাই॥
একটা কিছু করে নে ঠিক, ভেসে ফেরা মরার অধিক
বারেক এ দিক বারেক ও দিক, এ খেলা আর খেলিস নে ভাই॥

কিম্বা আরো,

যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক আমি তোমায় ছাড়ব না মা!
আমি তোমার চরণ —
না গো, আমি তোমার চরণ করব শরণ, অন্য কারো ধার ধারব না মা॥
কে বলে তোর দরিদ্র ঘর, হৃদয়ে তোর রতনরাশি —
আমি জানি তো তার মূল্য জানি, পরের আদর কাড়ব না মা॥
মানের আশে দেশ বিদেশে যে মরে সে মরুক ঘুরে —
তোমার ছেঁড়া কাঁথা আছে পাতা, ভুলতে সে যে পারব না মা!
ধনে মানে লোকের টানে ভুলিয়ে নিতে চায় যে আমায় —
ও মা, ভয় যে জাগে শিয়র-জাগে, কারো কাছেই হারব না মা॥

কিম্বা অন্য আরো,

আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী।
ওগো মা, তোমার দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে॥

অথবা,

আমার সোনার বাংলা তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥

অথবা অধিকন্তু,

ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা॥

আমরা পথে পথে যাব সারে সারে,
তোমার নাম গেয়ে ফিরিব দ্বারে দ্বারে ॥
বলব, জননীকে কে দিবি দান,
কে দিবি ধন তোরা কে দিবি প্রাণ —

অবশেষে

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম মা গো, তোমায় ভালোবেসে ॥
জানি নে তোর ধন রতন আছে কি না রাণীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে ॥
কোন্ বনেতে জানি নে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে।
আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ওই আলোতেই নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে ॥

একদা এক সম্মিলনীতে যে মহা আহ্বানধ্বনি শোনা গিয়েছিল —

মিলে সব ভারত-সন্তান...

একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্রজীবন।

তার রেশ বেয়ে এ অনেক দূরে চলে আসা।

রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম ও স্বাদেশিকতা বৃহত্তর সত্যবোধ ও ধর্মবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত। সেই সত্য ও ধর্ম বিশ্বমানবতার মুক্তি ও অখণ্ডতা স্বীকার করে—দ্বন্দ্ব ছাড়িয়ে সমন্বয়ে ও মৈত্রীতে পৌঁছবার যৌক্তিকতায়। তাঁর এই আলোচিত কাব্যাংশে যে চেতনা তাতে প্রেরণা আছে মত্ততা নেই, সংগ্রাম আছে বিদ্বেষ নেই, আত্মগরিমা আছে পরশ্রীকাতরতা নেই, — অঙ্গে অঙ্গে ফুটে উঠেছে প্রসন্নতায় শুভ্রতা, বারংবার অভাবের সীমা থেকে এই কাব্যভাবের অসীমে উত্তরণের সংসিদ্ধি। দেশপ্রেম কবির একটা pose নয়, কবিচেতনার stance মাত্র নয় — তা তাঁর মূল কবিচেতনারই বিচিত্র রসমগ্নতার মধ্যে অতলান্ত আনন্দরসে ধ্যানস্থ হবার অনায়াস অভ্যাস।

S. N. PAUL & CO.

High Class Brick Manufacturers & Contractors

Brick Field
Sreepore Bagharghole
P.O. Bonhooghly, 24 Parganas

Head Office
34: 1, Puddapukur Road
Calcutta-20

Phone : 47-2869

With the best compliments from :-

Ellora Enterprise

Paper & Board Merchants

57/2A, College Street
Calcutta-73

34-3720

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

সমগ্র রচনাবলী

পাঁচ খণ্ড প্রকাশিত—প্রতি খণ্ডের মূল্য ২৫·০০ টাকা

***

রমেন সেনগুপ্ত

প্রণতি

শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মায়ের চরণে নিবেদিত কাব্যগ্রন্থ

মূল্য ৩·০০ টাকা

***

অণিমা মজুমদার

মঞ্জিরা

(কাব্যগ্রন্থ)

***

সমীরকান্ত গুপ্ত

কাব্যলোকে

মূল্য ৮·০০

শতাব্দীর পূজা

শ্রীমা ও আশ্রম প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ মূল্য ৪·০০

***

অনিলবরণ রায় ও যোগানন্দ

মহাবির্ভাব

শ্রীশ্রীমদ্ ভারতব্রহ্মচারী ও শ্রীশ্রীজগন্নাতার মহাবির্ভাব

—প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম	শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির	শ্রীঅরবিন্দ ভবন	পুথঘর
পণ্ডিচেরী	১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট	৮ শেক্সপীয়র সরণী	৬৩ কলেজ স্ট্রীট
	কলিকাতা–৭৩	কলিকাতা–৭১	কলিকাতা–১২

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্তিকা

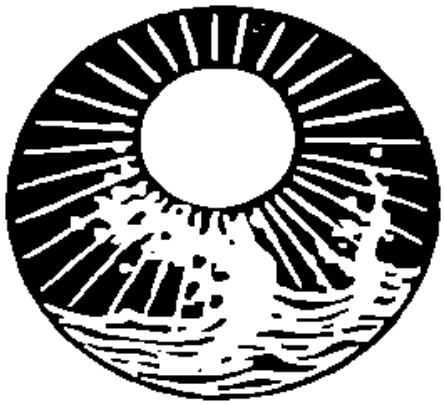

২৪শে নভেম্বর ১৯৮২

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বার্তিকা

নভেম্বর ১৯৮২

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা – ৭৩

ঋষি বিশ্বামিত্রের অগ্নিযজ্ঞ	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
মায়ের আলাপ	...
মায়ের লেখা — মায়ের কথা	অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্মোহিত	নিশিকান্ত
সাবিত্রী (রাজার যোগের দ্বিতীয় পর্ব)	সুধা বসু
শ্রীঅরবিন্দ জয়ন্তী	হিরাংশু নিয়োগী
গদ্য-কাব্য পরিক্রমা	সমীরকান্ত গুপ্ত
মধুদার গল্প	সমীরকান্ত গুপ্ত

বর্ত্তিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগস্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫·০০ টাকা। বৎসরের যে-কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় অফিসে কিংবা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা বর্ষারম্ভে জমা না দিলে পত্রিকা ভি, পি, যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

	প্রতি সংখ্যা	বার্ষিক
প্রতি পৃষ্ঠা	১০০·০০ টাকা	৩০০·০০ টাকা
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০·০০	২০০·০০
ভিতরের মলাট	১৫০·০০	৫২০·০০
বাইরের মলাট	২০০·০০	৬০০·০০

শাখা
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা – ৭৩

সম্পাদক :
শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য দেড় টাকা

Edited by : Nolini Kanta Gupta
Published by : Sri Aurobindo Pathamandir,
15 Bankim Chatterjee Street, Calcutta - 73
Printed by : Amiyo Ranjan Ganguli
at Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry

[illegible]

ঋষি বিশ্বামিত্রের অগ্নিমন্ত্র

(ঋগ্বেদ—তৃতীয় মণ্ডল, সপ্তবিংশ সূক্ত)

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

প্র বো বাজা অভিদ্যবো হবিষ্মন্তো ঘৃতাচ্যা।
দেবাঞ্জিগাতি সুন্নয়ু ॥১॥

প্র — সম্মুখে
বঃ — তোমাদের
বাজাঃ — পূর্ণতাসব
অভি-দ্যবঃ — জ্যোতির্ময়
হবিষ্মন্তঃ — আহুতিধারক
ঘৃতাচ্যা — আলোকের (প্রদীপ্ত) চমস দিয়ে
দেবান্ — দেবতাদের দিকে
জিগাতি — চলেছে
সুন্নয়ুঃ — আনন্দকামী, সুখাকাঙ্ক্ষী

এগিয়ে চলেছে সম্মুখে জ্যোতির্ময় পূর্ণতা সব, তারা আহুতি এনেছে দীপ্ত চমসে, সুখান্বেষী চলেছে দেবতাদের অভিমুখে ॥১॥

ঈড়ে অগ্নিং বিপশ্চিতং গিরা যজ্ঞস্য সাধনম্।
শ্রুষ্টীবানং ধিতাবানম্ ॥২॥

ঈড়ে — পূজা করি
অগ্নিম্ — অগ্নিকে
বিপশ্চিতম্ — দীপ্ত চেতনা যার
গিরা — বাক্যের সহায়ে
যজ্ঞস্য — যজ্ঞের
সাধনম্ — সম্পন্নকারী
শ্রুষ্টী-বানম্ — দিব্যশ্রুতিময়, অনুপ্রেরণাময়
ধিতাবানম্ — দৃঢ়প্রতিষ্ঠ

বাক্যের সহায়ে আমি অগ্নির পূজা করি দীপ্ত চেতনা যাঁর, যজ্ঞ সম্পন্ন করেন যিনি, দিব্যশ্রুতি যাঁর, দৃঢ়প্রতিষ্ঠ যিনি ॥২॥

অগ্নে শকেম তে বয়ং যমং দেবস্য বাজিনঃ।
অতি দ্বেষাংসি তরেম ॥৩॥

অগ্নে — হে অগ্নি
শকেম — আমরা যেন সমর্থ হই
তে — তোমার
বয়ম্ — আমরা
যমম্ — সংযমনে
দেবস্য — দেবতার, দিব্য
বাজিনঃ — প্রভু তুমি, তুরঙ্গ তুমি
অতি (+তরেম)
দ্বেষাংসি — শত্রুদের
(অতি+) তরেম — আমরা যেন অতিক্রম করি

হে অগ্নি, দিব্য তুরঙ্গ তুমি, তোমাকে যেন আমরা সংযত রাখতে পারি, শত্রুসকল যেন অতিক্রম করে যেতে পারি ॥৩॥

সমিধ্যমানো অধ্বরেঽগ্নিঃ পাবক ঈড্যঃ।
শোচিষ্কেশস্তমীমহে ॥৪॥

সম্-ইধ্যমানঃ — সম্যক প্রজ্বলিত
অধ্বরে — যজ্ঞযাত্রায়
অগ্নিঃ — অগ্নি
পাবকঃ — শুদ্ধিদাতা
ঈড্যঃ — পূজ্য
শোচিঃ-কেশ — অগ্নিশিখায় কেশ যার
তম্ — তাকে
ঈমহে — আমরা আকাঙ্ক্ষা করি

অগ্নি যজ্ঞযাত্রায় প্রজ্বলিত হয়েছেন — শুদ্ধিদাতা তিনি, তিনি পূজ্য, অগ্নিশিখা তাঁর কেশদাম, তাঁকে আমরা আকাঙ্ক্ষা করি ॥৪॥

পৃথুপাজা অমর্ত্যো ঘৃতনির্ণিক্ স্বাহুতঃ।
অগ্নির্যজ্ঞস্য হব্যবাট্ ॥৫॥

পৃথু-পাজা: — বিশাল তাঁর প্রতাপ
অমর্ত্য: — অমর
ঘৃত-নির্ণিক্ — তেজোময় বেশ/পরিচ্ছদ তাঁর
সু-আহুত: — সম্যক আহুতি প্রদত্ত
অগ্নি: — অগ্নি
যজ্ঞস্য — যজ্ঞের
হব্য-বাট্ — আহুতিবাহক

বিপুল-প্রতাপ, অমর তিনি, দীপ্তি ভূষিত তিনি, তাঁকে যথাবিধি আহুতি দান করা হয়েছে, অগ্নি হলেন যজ্ঞের আহুতিবাহক ॥৫॥

তং সবাধো মতয়শ্চ ইষ্বা ধিয়া যজ্ঞবস্ত:।
আ চক্রুরগ্নিমূতয়ে ॥৬॥

তম্ — তাকে
সবাধ: — বাধাপ্রাপ্ত হয়ে, আক্রান্ত হয়ে
মত-য়শ্চ: — চমসকে কর্মরত করে
ইষ্বা — সত্যময়
ধিয়া — ধী-শক্তি দিয়ে
যজ্ঞ-বস্ত: } — যজ্ঞকারীরা
আ }
চক্র: — তৈরী করেছে
অগ্নিম্ — অগ্নিকে
ঊতয়ে — রক্ষণের জন্য

শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যজ্ঞকারীরা চমসকে কর্মে নিযুক্ত ও সত্যধী আশ্রয় করে অগ্নিকেই তারা রক্ষী করে ধরেছে ॥৬॥

হোতা দেবো অমর্ত্য: পুরস্তাদেতি মায়য়া।
বিদথানি প্রচোদয়ন্ ॥৭॥

হোতা — আহুতিকার
দেব: — দেবশক্তি
অমর্ত্য: — অমর
পুরস্তাৎ — সম্মুখে
এতি — চলেছে

নায়য়া — স্বষ্টিকর প্রজ্ঞা নিয়ে
বিদথানি — তার জ্ঞানধারা
প্র-চোদয়ন্ — প্রচালিত করেছে

এই যে হোতা অনর দেবশক্তি সম্মুখে চলেছে তার স্বষ্টিকর প্রজ্ঞা নিয়ে, প্রচালিত করেছে সকল জ্ঞানধারা ॥৭॥

বাজী বাজেষু ধীয়তেঽধ্বরেষু প্র নীয়তে।
বিপ্রো যজ্ঞস্য সাধনঃ ॥৮॥

বাজী — অশ্ব তিনি
বাজেষু — পূর্ণতারাজির মধ্যে
ধীয়তে — তাকে ধারণ করা হয়েছে
অধ্বরেষু — যজ্ঞযাত্রায়
প্র নীয়তে — সম্মুখে চালিত হয়েছে
বিপ্রঃ — দীপ্ত দ্রষ্টা তিনি
যজ্ঞস্য — যজ্ঞের
সাধনঃ — সাধক, সুসম্পন্নকারী

সকল পূর্ণতার মধ্যে অশ্বরূপে তাঁকে ধারণ করা হয়েছে, যজ্ঞযাত্রায় তাঁকেই সম্মুখে চালিত করা হয়েছে, দিব্যদ্রষ্টা তিনি, তিনি যজ্ঞ সুসম্পন্ন করেন ॥৮॥

ধিয়া চক্রে বরেণ্যো ভূতানাং গর্ভমা দধে।
দক্ষস্য পিতরং তনা ॥ ৯ ॥

ধিয়া — ধীশক্তি দিয়ে
চক্রে — তাঁকে গড়া হয়েছে
বরেণ্যঃ — বরণীয় তিনি, শ্রেষ্ঠ তিনি
ভূতানাম্ — সকল স্বষ্টসত্তার
গর্ভম্ — গর্ভমধ্যে (সন্তানরূপে)
আ দধে — ধারণ করে
দক্ষস্য — বিচারবুদ্ধির
পিতরম্ — পিতাকে
তনা — দেহমধ্যে

বীশক্তি তাঁকেই গঠন করেছে, তিনি পরম বরেণ্য, যাবতীয় সৃষ্টবস্তুকে তিনি আপন গর্ভে ধারণ করেছেন, শরীরের মধ্যে তিনি হলেন বিচারশক্তির জনক ॥৯॥

১০। নি ত্বা দধে বরেণ্যং দক্ষস্যেলা সহস্কৃত।
অগ্নে সুদীতিমুশিজম্ ॥১০॥

নি — অন্তরে
ত্বা — তোমাকে
দধে — ধারণ করেছে, স্থাপন করেছে
বরেণ্যম্ — বরনীয়, শ্রেষ্ঠকে
দক্ষস্য — বিচারবুদ্ধির
ইলা = ইড় স্তুতী — দিব্যবাকশক্তি
সহঃ-কৃত — যে মহাবলসৃষ্ট
অগ্নে — হে অগ্নি
সু-দীতিম্ — সম্যক চিন্তাশক্তিযুক্ত
উশিজম্ — সত্যাকাঙ্ক্ষী, সত্যকামী

সত্যবিবেক-তনয়া ইলা তোমাকে অন্তরে স্থাপন করেছে, বরেণ্য তুমি, মহাবল তোমাকে গঠন করেছে, হে অগ্নি, পূর্ণ চিন্তাশক্তি তোমার, সত্যকামী তুমি ॥১০॥

১১। অগ্নিং যন্তারমপ্তুরমৃতস্য যোগে বনুষঃ।
বিপ্রা বাজৈঃ সমিন্ধতে ॥১১॥

অগ্নিম্ — অগ্নিকে
যন্তারম্ — ক্ষিপ্রগামী চালনা
অপ্-তুরম্ — জলধারা অতিক্রমকারী
ঋতস্য — সত্যের
যোগে — সংযোগে, সংযুক্ত হয়ে
বনুষঃ — বিজয়াকাঙ্ক্ষী, বিজয়কামী
বিপ্রাঃ — দীপ্তদ্রষ্টারা
বাজৈঃ — পূর্ণতারাজি দিয়ে
সম্ ইন্ধতে — প্রজ্বলিত করে

অগ্নি ক্ষিপ্রবেগে জলধারা অতিক্রম করে চলে, তাকে দীপ্তদ্রষ্টা ঋষিগণ, সত্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যাঁরা বিজয় কামনা করেন, তাঁরা প্রজ্বলিত করে ধরেছেন সকল পরিপূর্ণতার সহায়ে ॥১১॥

১২। ঊর্জো নপাতমধ্বরে দীদিবাংসমুপ দ্যবি।
অগ্নিমীলে কবিক্রতুম্ ॥১২॥

ঊর্জঃ — মহাবলের, ওজস্বীর
নপাতম্ — পুত্রকে
অধ্বরে — যজ্ঞযাত্রায়
দীদিবাংসম্ — প্রজ্বলন্ত
উপ
দ্যবি — স্বর্গলোকে, দ্যুলোকে
অগ্নিম্ — অগ্নিকে
ঈলে — ঈড়্ততাবিত্যস্য — পূজা করি
কবিক্রতুম্ — যিনি দৃষ্টিময় সঙ্কল্পশক্তি

মহাবলের পুত্র তিনি, যজ্ঞযাত্রার দ্যুলোকে প্রজ্বলন্ত হয়েছেন, এই দৃষ্টিময় সঙ্কল্প-শক্তি অগ্নিকে ভজনা করি ॥১২॥

১৩। ঈলেন্যো নমস্যাস্তিরস্তমাংসি দর্শতঃ।
সমগ্নিরিধ্যতে বৃষা ॥১৩॥

ঈড়েন্যঃ — পূজনীয়
নমস্যঃ — নমস্য
তিরঃ — পার হয়ে
তমাংসি — তমোরাশি
দর্শতঃ — দৃষ্টিময়
সম্ (+ইধ্যতে) — সমিদ্ধ হয়েছেন
অগ্নিঃ — অগ্নি
(সম্ +) ইধ্যতে — সমিদ্ধ হয়েছেন
বৃষা — পুরুষ বৃষ যিনি

পূজ্য, নমস্য, দৃষ্টি তাঁর তমোরাশি পার হয়ে চলে, পুরুষবৃষ এই সম্যক প্রজ্বলিত হয়েছেন ॥১৩॥

১৪। বৃষো অগ্নিঃ সমিধ্যতেঽশ্বো ন দেববাহনঃ।
তং হবিষ্মন্ত ঈলতে ॥১৪॥

বৃষঃ — পুরুষ বৃষ
অগ্নিঃ — অগ্নি
সন্ ইধ্যতে — প্রজ্বলিত হয়েছে
অশ্বঃ — অশ্ব
ন — যেন
দেব-বাহনঃ — দেবতাদের বাহন
তম্ — তাঁকে
হবির্দত্ত — আহুতি প্রদাতারা
ঈলতে — পূজা করে

পুরুষবৃষ অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছেন, দেবতাদের বাহন অশ্ব যেন তিনি, আহুতিদাতারা তাঁকে পূজা করে ॥১৪॥

১৫। বৃষণং ত্বা বয়ং বৃষণ্বসুষণঃ সমিধীমহি।
অগ্নে দীদ্যতং বৃহৎ ॥১৫॥

বৃষণং — পুরুষ বৃষ
ত্বা — তোমাকে
বয়ম্ — আমরা
বৃষন্ — হে বৃষরাজ
বৃষণঃ — যারা পুরুষবৃষসম
সন্ ইধীমহি — সমিদ্ধ করি
অগ্নে — হে অগ্নি
দীদ্যতম্ — তুমি প্রদীপ্ত করেছ
বৃহৎ — বৃহৎকে

পুরুষবৃষ তোমাকে, হে বৃষরাজ, আমরা, যারা বৃষপুরুষের মত, তোমাকে সমিদ্ধ করি ; হে অগ্নি বৃহৎকে তুমি প্রদীপ্ত করেছ ॥১৫॥

মায়ের আলাপ

১৮ই মে, ১৯৫৫

[মায়ের আজকের কথাবার্তা, তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধকে ঘরে হয়। প্রবন্ধটির নাম "নারীর সমস্যা", *Bulletin of Physical Education*, April 1955-সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।]

শ্রীমা এরপরে আর কোন প্রশ্ন নয়। নতুন কিছুই আমার আর বলবার নেই, সবই বলেছি। তোমার কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল?

প্রশ্ন না, তুমি প্রবন্ধটির নাম দিয়েছ, "নারীর সমস্যা", কিন্তু তুমি একই সঙ্গে পুরুষের সমস্যা সম্বন্ধেও আলোচনা করেছ।

শ্রীমা হ্যাঁ, তার কারণ, পুরুষ ও নারীকে পৃথক করা কঠিন। আমি বলতে চাইনি যে, এ সমস্যাটি কেবল মেয়েদেরই সমাধান করতে হবে, আমি বলতে চেয়েছি, পার্থিব জীবনে এ সমস্যাটি দেখা দিয়েছে যেহেতু পৃথিবীতে মেয়েরা রয়েছে।

পুরুষেরা এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত নিজেদের নিয়েই এবং নিজেরা যা করেছে তা নিয়েই সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট ছিল। এখন একশো বছরের কিছু আগে থেকে মেয়েরা প্রতিবাদ করতে আরম্ভ করেছে। আগে বোধহয় তারা কিছুই বলেনি, অন্তত তাদের কিছু বলবার সুযোগ ঘটেনি। যাই হোক কিছুদিন আগে থেকে, খুব বেশী আগের কথা নয়, মেয়েরা বলতে আরম্ভ করেছে, "দোহাই আপনাদের, আমরা মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারিনি।" আগে সম্ভবত যদি তারা এ ধরনের কোন কথা বলতে সাহস করত, তাহলে হয়ত তারা মার খেত, এবং তাদের বলা হত, "চুপ করে থাক, এ সম্বন্ধে তোমাদের কোন কথা বলার অধিকার নেই।" কিন্তু সে যাই হোক, সব কিছু সত্ত্বেও তাদের আন্দোলন বেড়ে চলল, এবং পুরুষেরা মেয়েদের সঙ্গে যে ভাবে ব্যবহার করে তার বিরুদ্ধে শতাব্দীর শেষের দিকে প্রকাশ্যভাবে মেয়েদের প্রতিবাদ শুরু হল। কারণ পুরুষেরা যে সব নিয়ম কানুন গড়ে তুলেছিল সে সবই ছিল পুরুষদের স্বপক্ষে, সামাজিক যে কোন সংস্থাই পুরুষের দ্বারা গড়ে উঠেছিল সে সবই ছিল পুরুষদের সুযোগের পক্ষপাতী। আর মেয়েদের স্থান সর্বদাই ছিল নিচের দিকে এবং কখনও কখনও তা একেবারেই হীন রুচির পরিচায়ক। কয়েকটি দেশে ত এখনও সেই রকমই চলছে...

কিন্তু সে যাই হোক, তখনকার দিনেও, মেয়েরা যদিবা প্রতিবাদ করত ত সেটা হত, হয় ব্যক্তিগতভাবে অথবা খুবই গোপনে, কারণ সেটা তখনও প্রকাশ্য প্রশ্ন হয়ে ওঠেনি। কিন্তু গত শতাব্দীর শেষের দিকে একটি আন্দোলন সৃষ্টি হল, যার নাম দেওয়া হয়েছিল, "নারী আন্দোলন" এবং মেয়েরা প্রচণ্ডভাবে প্রতিবাদ করতে লাগল, তারা বলতে লাগল, "বাপ করবেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আপনারা আপনাদের সকল ব্যাপারেই বিফল হয়েছেন এবং কোন কাজই ভালোভাবে করতে পারেননি। যা কিছু আপনারা করেছেন,

মনে হয় সবই একেবারে বাজে হয়ে গেছে। নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেননি এবং তার দ্বারা নিজেদের এবং আর সকলের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছেন। এখন আমাদের কিছু বক্তব্য আছে, তা হচ্ছে যে এ ভাবে আর চলবে না, এর চেয়ে ভাল কিছু হওয়া দরকার।" এই ভাবেই আন্দোলনটা শুরু হয়। অর্থাৎ বুঝলে কিনা, যত গলাবাজি রেষারেষি এবং বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের ঢেউ উঠল... তারা মেয়েদের বিদ্রূপের বন্যায় ডুবিয়ে দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু ফলে পুরুষেরাই হাস্যাস্পদ হয়ে উঠল, মেয়েরা নয়, (বলে মা হাসতে লাগলেন) আর শেষ পর্যন্ত একটি বিষয়ে তারা জয়ী হল তা হচ্ছে, রাষ্ট্রপরিচালনার ব্যাপারে মেয়েরা তাদের মতামত ব্যক্ত করবার অধিকার লাভ করল।

শুরু হয় এই ভাবেই...ভয়াবহ দুর্নামের পরে এখন আন্দোলনটি স্বীকৃতি লাভ করেছে, এমনকি কোন কোন দেশ, যারা খুব বেশী পিছনে পড়ে নেই, সেখানে সরকারী বিভাগে মেয়েদের নেওয়া হচ্ছে। আর এ ব্যাপারে আমার যতটা জানা আছে, তাতে বলতে পারি, প্রথম যে দেশে এটি কার্যকরী হয়েছে তা হল সুইডেন। এ খবর আমি পেয়েছি এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। ঠিক সেই সময়েই এই ঘটনাটি ঘটে। সুইডেনের পার্লামেণ্ট এবং তাদের সরকারী বিভাগে মেয়েদের নেওয়া হয় এবং এই কাজে নিযুক্ত হয়ে তারা প্রথম যে কাজটি করে এবং তাতে কৃতকার্য হয়, তা হল মদ খেয়ে মাতলামি করা গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়।

প্রশ্ন তার মানে?

শ্রীমা মাতলামি কাকে বলে জানলা, ওর মানে প্রচুর মদ খাওয়া এবং দুঃখের বিষয় হল এই মদ অভ্যাসটি পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত। আর পুরুষেরাই বিশেষ করে মদ্যপানে আসক্ত। কুলিমজুর শ্রেণীর লোকেরা মাইনের টাকা পাওয়া মাত্র তার অর্ধেকের বেশীটা মদ খেয়ে উড়িয়ে দেয়, তারপর তাদের স্ত্রীরা সংসার চালাবার জন্যে টাকা চাইলে মারধর খায়। সাধারণত এই রকমটাই ঘটে থাকে। আর সুদীর্ঘকাল ধরে সুইডিস সরকারই এই মদ অভ্যাসটিকে দূর করতে চেষ্টা করে এসেছে। কারণ তারা বুঝেছিল যে এটা সমাজের শান্তির পক্ষে সম্পূর্ণ ক্ষতিকারক কিন্তু কোনদিনই সফলকাম হয়নি। অথচ দেখা গেল যে মেয়েরা শাসন বিভাগে যোগদান করার দুতিন বছরের মধ্যেই তারা এ বিষয়ে সাফল্য লাভ করল। আর ব্যাপারটা ওইখানেই শেষ হয়, পরে আর কখনও ও বিষয়ে কোন কথা শোনা যায়নি। কি ভাবে মেয়েরা এ কাজটি করল তা এখন আমার মনে নেই। সে সময় আমি তা শুনেছিলাম। তবে কখনই নিষেধ আজ্ঞা জারী করে নয়, কারণ যেখানেই ওইভাবে চেষ্টা করা হয়েছে, সেখানেই তা বিফল হয়েছে। কিন্তু এরা সফলকাম হয়েছে, তা এখনও বিদ্যমান, প্রত্যক্ষভাবে তা বিদ্যমান। এটা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে অর্ধশতাব্দীর বেশী সময় লেগেছে। এখন অনেক দেশের রাষ্ট্রীয় বিভাগে মেয়েরা রয়েছে।

(পবিত্রর দিকে তাকিয়ে মা জিজ্ঞাসা করলেন) ফ্রান্সেও কি আছে? মেয়েরা কি পার্লামেণ্টে আছে?

পবিত্র হ্যাঁ, মা

শ্রীমা তাই বুঝি, আছে ?

পবিত্র একজন মহিলা মন্ত্রী ছিলেন।

শ্রীমা না রাষ্ট্রসচিব, মন্ত্রী নয়, একজন মহিলাকে ও কাজে বহাল করে দেখা হয়েছিল।

পবিত্র শিক্ষা বিভাগে একজন মহিলা মন্ত্রী ছিলেন।

শ্রীমা না, না, রাষ্ট্রসচিব একজন মহিলা ছিলেন। তা যাই হোক, আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে ফ্রান্স হল এমন একটি দেশ যা এখনও সব চেয়ে বেশী পিছিয়ে আছে। আর বিষয়টি বড়ই কৌতুককর, কারণ ফ্রান্সই বোধহয় রাজনৈতিক চিন্তাধারার দিক থেকে সবচেয়ে বেশী অগ্রণী।

এই ফরাসী দেশ থেকেই সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার ভাব মানুষের মনে জেগেছে এবং ফ্রান্স থেকেই তা বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হয়। কিন্তু পুরুষ এবং নারীর সম্বন্ধের ব্যাপারে এ দেশটি সবচেয়ে বেশী পিছিয়ে রয়েছে। এর অবশ্য মনস্তাত্ত্বিক কারণ আছে, তবে তা নিয়ে আমি এখানে আলোচনা করতে চাইনা।

প্রশ্ন : মা, এখানে লেখা রয়েছে, "প্রত্যেক নারীর মধ্যেই অনেক পুরুষালী প্রবৃত্তি (aspects) রয়েছে আবার প্রত্যেক পুরুষের মধ্যেই মেয়েলী ভাব (traits) রয়েছে, বিশেষ করে আধুনিক সমাজে।"

শ্রীমা হ্যাঁ, পুরুষ বা নারী জাতির কোনটিই নিছক পুরুষ বা নিছক নারী নয়।

প্রশ্ন তাহলে তাদের মধ্যে এত রেষারেষি কেন ?

শ্রীমা কারণ তারা নিজেরাই নিজেদের জানেনা, আর তা জানেনা বলেই তারা দেহগত আকারের ক্রীতদাস। তার কারণ তারা যখন আয়নায় নিজেদের চেহারাটা দেখে তখন পুরুষেরা দেখে তারা পুরুষ আর মেয়েরা দেখে তারা নারী, আর তারা তাদের চেহারা-টার ক্রীতদাস হয়। এছাড়া অন্য কোন কারণ নেই।

কিন্তু সে যাই হোক, আমি প্রায়ই এমন পুরুষদের দেখেছি যারা একদিক থেকে ভীষণ মেয়েলী ভাবাপন্ন, কিন্তু মোটেই তা শোভন নয়, অথচ তারাই নিজেদের পুরুষের অধিকার সবচেয়ে বেশী দাবী করে এবং পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তাদেরই ধারণা উচ্চতম। আবার নারী-আন্দোলনের গোড়ার দিকে আমি এমন সব নারীদেরও দেখেছি যারা নারী-আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল, তারা সবাই নকল কলার, নেকটাই এবং কোট পরত, মাথার চুল পুরুষদের মত ছোট করে ছেঁটে ফেলেছিল, তারা যতদূর সম্ভব দেখাতে চেষ্টা করছিল যে পুরুষের সমকক্ষ। কিন্তু তারা শোচনীয়ভাবে, একেবারে শো-চ-নী-য় ভাবে (সকলের হাস্যরোল) মেয়েলী ভাবাপন্ন ছিল। তারা পুরুষদের খুশি করতে এবং আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করতো। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে যদি কোন পুরুষ তাদের সঙ্গে পুরুষের মত ব্যবহার করত তাহলে তারা ভীষণ চটে যেত। (সকলের হাস্য) তবে এর আমূল পরিবর্তনের জন্যে অনেক সময় লাগবে।

তারপর আর কিছু ?

প্রশ্ন মা, এখানে তুমি যে দিব্যজননীর কথা বলেছ, শ্রীঅরবিন্দ তাঁর "মা" বইটিতে যাঁর কথা লিখেছেন তিনি কি সেই একই?

শ্রীমা হ্যাঁ, তাই।

প্রশ্ন : তাহলে দিব্যজননীর ধারণাটা কি সম্পূর্ণ মানুষের মত? না কি, তাঁর আদি উৎসে কোন লিঙ্গ নেই?

শ্রীমা না।

কিন্তু আমি কখনো বলিনি যে ওটা সম্পূর্ণ মানবীয়। আমি বলেছি বর্ণনাটা মানুষের মত করা হয়েছে। আমি বলিনি যে এটা সম্পূর্ণ মানবীয়, কোথাও সে কথা বলিনি। লোকে বলতে পারে এই বর্ণনাটি হল বড় বেশী মানবীয়, কিন্তু আমি বলতে চাই না যে তিনি সম্পূর্ণ মানবীয়।

প্রশ্ন : তাহলে তাঁর উৎপত্তিতে কি লিঙ্গ আছে?

শ্রীমা : প্রকাশরূপের উর্দ্ধে কোন পার্থক্য নেই, অর্থাৎ সেখানে দুই বলে কিছু নেই, আছে শুধু এক অদ্বিতীয়। সৃষ্টির মুহূর্তে সেই এক দুই হয়ে গেল। তার আগে ছিল এক এবং সেখানে কোন পার্থক্য ছিল না, ছিল মাত্র একই। সেখানে সম্ভাবনা ছিল অসংখ্য, কিন্তু ছিল সেই একই। কেবল সৃষ্টির বেলাতেই তা হয়ে উঠল দুই। পার্থক্যটা শাশ্বত কিছু নয় ও হল সহ-অবস্থান (co-existent)। এ হল সৃষ্টির জন্যে আর বস্তুত পক্ষে শুধু সৃষ্টির জন্যেই। হয়ত আগে অনেক জগৎ সৃষ্ট হয়েছিল, আমাদের জগৎটির চেয়ে ভিন্ন রকমের শুধু যে ছিল তা নয়, এখনও এমন অনেক অসংখ্য জগৎ থাকতে পারে যাদের সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না, এবং তাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নেই।

প্রশ্ন মা, তেমন আরও জগৎ আছে?

শ্রীমা : আমি বলছি তা থাকা সম্ভব। (হাসাহাসি) সে সম্বন্ধে আমরা কিছুই বলতে পারিনা, আমরা তা কিছুই জানিনা। মাত্র যেটুকু আমরা জানি, সত্যিই যদি জানি, তা হল আমাদের নিজেদের ব্রহ্মাণ্ডটিকে, মাত্র এইটুকুই কিন্তু অন্য আরও যে থাকতে পারেনা তেমন কোন কারণ নেই — কেউ বলতে পারেনা যে, "আরও অন্যান্য জগৎ নেই", সে-সম্বন্ধে কেউ কিছু জানে না, সেখানের সব কিছুই ভিন্ন ধরণের, হয়ত এতই ভিন্ন যে আমাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, আমি শেষে যে-কথা বললাম সেটাই এটা — তাই না? আমি শেষে বলেছি ...একটা নতুন সৃষ্টি হবে, অতিমানসিক সৃষ্টি। তবে এই সৃষ্টি (না হতে পারার কোন কারণ নেই...) হয়ত সেটির আকার এখনও পর্যন্ত হয়েছে, তার বদলে অন্য কিছু হতে পারে। আমার কথা হল ওখানটাতে যা বলেছি তা হল এই যে এইটিই হ'ল একমাত্র সমাধান অর্থাৎ এই বিভাগের পরিবর্তে একটা নতুন সৃষ্টি হতে পারে, হয়ত তা হবে এমন একটি সত্তা...যা "পরিকল্পনায় এবং সম্পাদনায়, সূক্ষ্মদর্শনে এবং সৃষ্টিতে, একটি-মাত্র চেতনাতে ও কর্মে বিনে এক হবে" — কারণ এটাই পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। বাস্তবিক

প্রথমে ছিল একটা পরিকল্পনা, তারপর সেটা কার্যে পরিণত হল, যেটা ঘটবার ছিল তার সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং সেটারই বাস্তব রূপায়ণ, অর্থাৎ এই দর্শনের বাস্তব রূপদান। এ বস্তু টির বিভক্ত হবার কোন কারণ নেই, একই সত্তার দ্বারা এই দুটি জিনিষই ঘটতে পারে এবং সে জন্যেই মাত্র একটি সত্তাই থাকা দরকার।

একটি পুরুষ এবং একটি নারী এই দুই ধারার পরিবর্তে একটিই মাত্র সত্তা থাকবে এবং ঠিক এইটিই সকল সমস্যার সমাধান বলে আমি উপলব্ধি করি — সকল সমস্যার, মাত্র এইটাই নয়, এইটাই হবে অতিমানসিক সৃষ্টির আদিরূপ (Prototype)।

প্রশ্ন মা, এখানে তুমি বলেছ, দিব্যজননী এই বিশ্বের স্রষ্টা কিন্তু ভারতবর্ষে লোকে সাধারণত বলে থাকেন ব্রহ্মাই হলেন এই বিশ্বের স্রষ্টা।

শ্রীমা কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন দিব্যজননী হলেন ব্রহ্মার জননী তিনি সকল দেবতারই জননী।

প্রশ্ন দেবদেবীদের লিঙ্গও কি মানুষের মত?

শ্রীমা না মোটেই তা নয়, কেন তাঁরা মানুষের মত হতে যাবেন? আমি কখনো বলিনি তাঁদের আকৃতি মানুষের মত। অধিমানসের (overmind) দেবদেবীদের আকৃতি অনুসারে তাঁদের পার্থক্য বোঝা যায়। অধিমানসের দেবতারা মানুষের সৃষ্টি নয়, তাঁরা সরাসরি সৃষ্ট হয়েছেন। জানিনা তাঁরা মানুষের আগে এসেছেন কিনা, তবে আমার তাই মনে হয়। আমার মনে হয় পার্থিব সৃষ্টি এবং পার্থিব রূপ অধিমানসের দেবতাদের দ্বারা গড়ে উঠেছে। বস্তুত অধিমানস জগতের অনেক দেবতারা আছেন যাঁরা জাগতিক বিষয়ের রূপকার, তাঁরা নিজেরা জগতে আবির্ভূত হন না, কিন্তু এখানে যা কিছু ঘটে সে-সবের তাঁরা রূপদান করে থাকেন, তাঁরাই যত ভাবকে রূপায়িত করেন। শ্রীঅরবিন্দ সর্বদাই বলতেন যে, আগে যাঁকে "ভগবান" বলা হত তিনি হলেন অধিমানসের একটি সত্তা, উচ্চতর দেবতা হলেও তিনি অধিমানসের একটি সত্তা।

প্রশ্ন মা, যদি দেব-দেবীদের মধ্যে আকারের পার্থক্য থাকে, তাহলে তাঁদের মধ্যেও কি একই সমস্যার উদয় হয়?

শ্রীমা : আ! বাছা, সে-কথা তুমি তাঁদের জিজ্ঞেস করতে পারো। তবে আমরা যে-সব গল্প শুনি সেগুলোকে যদি বিশ্বাস করতে হয় তাহলে তাঁদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ, গণ্ডগোল প্রভৃতি নানা রকমের ব্যাপার, এমন কি হিংসা দ্বেষ পর্যন্ত আছে। কোন কোন সময় তাঁরা মানুষের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেননা।

প্রশ্ন মা, দেবদেবীরা কিভাবে জন্মেছিলেন?

শ্রীমা যথার্থই...এটি সৃষ্টির একটি অংশ। আমরা এখানে যাঁকে "অদিতি" বলি তিনি হলেন সৃজনময়ী চেতনা, হ্যাঁ তাই, সৃজনময়ী চেতনাই...

শোন তবে, আমি এ সম্বন্ধে তোমাদের একটা গল্প বলছি, তবে একেবারেই তা ছোটদের

মত করে — তিনি প্রথমে চারটি সত্তাকে সৃষ্টি করলেন, তিনি যখন সৃষ্টির আদেশ পেলেন, তখন নিজের সত্তা থেকে চারটি বিভূতিকে নিষ্ক্রান্ত করলেন এবং এই চারজনকে তৈরি করে তিনি তাদের উপর ভার দিলেন এই বিশ্বকে গড়ে তুলতে। আর তারপরে, বোধহয় আমি তোমাদের আগে এ সম্বন্ধে বলেছি, আমরা সেটাকে এইভাবে বলতে পারি যে, ব্যাপারটা ঠিকভাবে চললনা। আর যখন সব কিছু গণ্ডগোল হয়ে গেল, তিনি সকল সত্তাদের নিয়ে আর একটি সৃষ্টি করলেন যাঁরা হলেন দেবতা। প্রথমে চারটি বিভূতি যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছিলেন তাদের অনুরূপ তিনি সূক্ষ্মভাবে আবার একটি সৃষ্টি করলেন, অর্থাৎ পরবের নির্দেশ অনুসারে জগৎগুলি ক্রমে ক্রমে স্থূলের দিকে অবতরণ করতে লাগল। দেবতারা যাঁরা পরে সৃষ্ট হয়েছেন তাঁরা এই ধারা অনুসরণ করেন এবং তাঁরাই হলেন শ্রীঅরবিন্দ যে রাজ্যকে বলেছেন অধিমানস (overmind) সেইখানে ক্রমে ক্রমে আরো বেশি করে স্থূল রূপ নিতে লাগলেন এবং সেখান থেকে তাঁরা এই জড়বিশ্বের এবং পৃথিবীর উপর আধিপত্য করতে লাগলেন। এবং তার একটি পরিণতি হল পৃথিবীকে সমগ্র বিশ্বের একটি প্রতীক রূপে গড়ে তোলা, যাতে সমস্যাটিকে আরো ঘনীভূত আরো একমুখী করে তুলে সেটির আরো সহজে সমাধান মিলতে পারে। আর যদিও জ্যোতি-বিদ্যার দিক থেকে এই পৃথিবীটি একটি ক্ষুদ্রতম এবং যতদূর সম্ভব গুরুত্বহীন বস্তু হতে পারে, অলৌকিক দৃষ্টি থেকে এই বিশ্বসৃষ্টি হল একটি প্রতীক যা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিনিধিত্ব করছে এবং এতই পূর্ণাঙ্গভাবে যে এই পৃথিবীকে রূপান্তরিত করে অথবা তার সাদৃশ্যের দ্বারা মানুষ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে রূপান্তরিত করতে পারে, কারণ পৃথিবী হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরই প্রতীক। এই পদ্ধতিই দেবতারা গ্রহণ করেছিলেন আর দেবতাদের অধিষ্ঠানের এই ক্ষেত্রটিই হল শ্রীঅরবিন্দ যাকে বলেছেন অধিমানস (overmind)

অবশ্যই ব্যাপারগুলি ঠিক সেই রকমেরই নয়। ভেবো না আমি এইভাবে যা বললাম প্রকৃত ঘটনাটি ঠিক সেইভাবে ঘটেছে। ব্যাপারটি ঠিক এই রকমেরই নয়, এ হল বলার একটি ধরণ যার দ্বারা বিষয়টিকে মস্তিষ্কের কাছে বোধগম্য করা যায়। বোধহয় ব্যাপারটা যেন এইভাবে ঘটেছিল।

যে চারটি সত্তার কথা আমি প্রথমে তোমাদের বলেছি তাঁরা ছিলেন লিঙ্গহীন, তাঁরা পুরুষ বা নারী কিছুই ছিলেন না, এবং প্রাণীজগতে একটি সম্পূর্ণ সৃষ্টিই হ'ল প্রাণের দ্বারা সৃষ্ট এবং সেগুলি এইসব সত্তাদের দ্বারাই গড়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে লিঙ্গের অস্তিত্ব নেই। তাছাড়া দেবতারাও একটি জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন যেখানে লিঙ্গের অস্তিত্ব ছিলনা। এ হল দেবদূতদের জগৎ যাদের অলৌকিক তত্ত্বের দিক থেকে বলা হয় রূপকার। কিন্তু এরা হল লিঙ্গহীন অশরীরী সত্তা, তাদের গায়ে ডানা আছে, তোমরা তো জান তারা হ'ল লিঙ্গহীন সত্তা।

এই বিশ্বে অনেক সত্তা আছে যাদের লিঙ্গ নেই যারা পুরুষও নয় নারীও নয়, এবং তাদের মধ্যে অনেকেই প্রাণ জগতে আছে। প্রাণ জগতে অনেক অশরীরী সত্তা আছে যাদের লিঙ্গ রয়েছে, তারা জগতের খুব সন্নিকট এবং পৃথিবীর একেবারে নিকটতম, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অংশে নেই এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশে যারা আছে তারা হল লিঙ্গহীন। সে যা হোক, এর ফলে বিশেষ ভাল কিছু হয়নি, যে হেতু তারা দিব্য ইচ্ছার ও দিব্য উপলব্ধির

বিরোধী, এবং তার দরুণই তারা দুর্দান্ত শক্তির অধিকারী হয়। অপর পক্ষে দেবতারাও তেমনি আবার ঐরকম বহু লিঙ্গহীন সত্তার সৃষ্টি করেছেন যাদের লোকেরা দেবদূত বলে। লোকেরা এদের কি বলে — "তোমাদের সহায়ক দেবদূত" না অন্য কিছু? এরা হল বিশেষ ভাবেই দেবদূত।

পবিত্র : ওদের নাম চেরাবিন সেরাফিন।

শ্রীমা : হাঁ, হাঁ, ঠিক তাই ওদের অনেক নাম আছে। ...আচ্ছা।

প্রশ্ন মা, — প্রাচীন কিংবদন্তীতে বলে, অসুরেরা দেবতাদের স্ত্রীদের সর্বদাই ঝালাতন করত।

শ্রীমা কি বললে, দেবতাদের স্ত্রীরা? অসুরেরা যাদের ঝালাতন করত? হাঁ।

প্রশ্ন তাঁরাও কি স্থূলজগতের খুব সন্নিকট? তাঁরা কি প্রাণ জগতের, — না কি

শ্রীমা ও হল প্রাণ জগতের ব্যাপার।

পবিত্র মা, মনের জগতেরও মনের সত্তারা আছে...

শ্রীমা মনোজগতের সত্তারা আছে তারাও লিঙ্গহীন, তবে সবাই নয়, কেউ কেউ। তারা সংখ্যায় অনেক। এইসব মন দিয়ে গড়া আকারগুলির মধ্যে অনেকে আছে যারা খুবই নাছোড়বান্দা, তারা খুবই সুগঠিত, খুবই সুশৃঙ্খলিত এবং সুদৃঢ়, কতক কতক মনগড়া রূপ আছে সেগুলি জীবন্ত সত্তা, কিন্তু তারা দেহে অবতীর্ণ হবার সময় নিস্পৃহভাবে পুরুষ থেকে নারীর দেহে চলে যায়, তাদের কাছে ও একই ব্যাপার, কোন তফাৎ নেই। এই শেষ? না আরও কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?

প্রশ্ন মা, লিঙ্গের উদ্ভবের যথার্থ কারণটা কি? কারণ জীব বিজ্ঞান পড়বার সময় আমরা দেখি এক কোষ বিশিষ্ট প্রাণীদের কোন লিঙ্গ ছিল না, লিঙ্গের উদ্ভব হয় পরে।

শ্রীমা বাছা, ও হল প্রকৃতির কাজ, সে সব রকমের উপায় পরীক্ষা করে দেখেছে, এ সমস্তই প্রকৃতির কর্ম সম্পাদনের উপায়, সে চেয়েছিল...জড়ের ক্রমবিকাশের ধারায় জীবের পূর্ণতালাভের জন্যে বিভাগের দরকার হয়েছিল, এরকমটাই বোধহয়, কারণ অবশ্যই এটা পরে গ্রহণ করা হয়েছিল। সম্ভবতঃ প্রকৃতি সব রকমের সম্ভাবনাই পরীক্ষা করে দেখেছে।

প্রশ্ন : কিন্তু তুমি যে বললে দেবতাদেরও লিঙ্গ আছে।

শ্রীমা : হাঁ, সম্ভবত তাদেরই দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই প্রকৃতি করেছে।

অবশ্যই এটা পৃথিবীতে এসেছে বলেই যে দেবতাদের ব্যাপারেও তাই, তা নয়। তাই যুক্তির দিক দিয়ে আমরা মনে করতে পারি যে, দেবতাদের ক্ষেত্রে ওইরকম হয়েছিল বলেই

পৃথিবীতেও এই রকম হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতি সরাসরি অনুপ্রেরণা লাভ করেছে বলে মনে হয়না ; বোধহয় সে নিজের পথে চলেছে নিজের ভাবে। তবু সে সব রকম জিনিসই পরীক্ষা করে দেখেছে, আমার মনে হয় এমন কোন জিনিস নেই যা সে পরীক্ষা করে দেখেনি, এবং এখনও সে তাই করে চলেছে। কিন্তু প্রকৃতিও লিঙ্গহীন সত্তাকে সৃষ্টি করেছে মানুষের আকারেই, এমনটা ঘটেছে। এমন কি আমি ঐ রকমের একটি গ্রীক মর্মরমূর্তি দেখেছি। গ্রীকদের এটা জানা ছিল।

মানুষ যা কিছুই কল্পনা করতে পারে তার চেয়েও বেশী প্রকৃতি কল্পনা করতে পারে। কেবল, সে তাড়াহুড়ো করতে চায়না, আমার ত মনে হয়, সে এটা খুব উপভোগ করে তাই সে তার নিজের ভাবেই চলতে চায়, পরীক্ষা করে, তার পরে ভেঙ্গে ফেলে, আবার নতুন ক'রে সুরু করে, আবার তা ভেঙ্গে ফেলে। সে ঠিক ঐ রকম করে একটা সমগ্র জীবজাতিকেই ধ্বংস করে (ভঙ্গী করে দেখালেন), এতে তার কিছু এসে যায়না, সে শুধুমাত্র বলবে, "না, ওটা ঠিক সুবিধের হয়নি।" আর তারপর ও ব্যাপারে সব শেষ। সে মোটেই তাড়া করতে চায়না, তাকে যদি বলা হয়, অনুক বস্তুটা বহুকাল ধরে এই রকম হয়ে গেছে, এবং কিছুটা পরিমাণে সুসঙ্গতিপূর্ণ হতে পারত, তাহলে সে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, মোটেই সন্তুষ্ট হয়না। সর্বদাই তার কথা হল, "কিন্তু তোমরা এত তাড়াহুড়ো কেন করছ ? তোমরা যেটা করতে চাইছ তা একদিন হবেই, কিন্তু এখুনি যে তা হতে হবে তার কোন দরকার নেই। তোমাদের এত তাড়া কিসের ?" সর্বদাই এই হল তার উত্তর। ঘোরাঘুরি করাটাই তার পছন্দ।

প্রশ্ন মা, প্রকৃতি বলতে কি বোঝায় ? দিব্য জননীর সঙ্গে তাঁর কি সম্বন্ধ ?

শ্রীমা : আমার মনে হয়, প্রকৃতি হচ্ছে সৃজনীশক্তির সবচেয়ে স্থূল অংশ যিনি বিশেষ করে পার্থিব সৃষ্টির ব্যাপারের সঙ্গে সংযুক্ত, অর্থাৎ আমরা বাহ্যজগৎ বলতে যা বুঝি সেইটার।

জ্যোতির্বিদ্যার অতি আধুনিক আবিষ্কার সম্বন্ধে আমি কিছু জানতে চাই। (পবিত্রর দিকে তাকিয়ে) পৃথিবীতে জড়বস্তু যাকে বলা হয় সেই রকম বস্তু অন্যান্য জগতেও আছে বলে কি লোকের ধারণা ?

পবিত্র হ্যাঁ মা, সর্বত্রই। এ পর্যন্ত জড়ের ব্যাপারে কোন পার্থক্যই দেখা যায়নি, শুধু সৌরমণ্ডলেরই নয় অন্যান্য জগতেও।

শ্রীমা সব একই রকম, তাহলে কি করে আমাদের বলা হয় মানুষ অন্যান্য গ্রহে বাস করতে পারে না এমন কি বৃহস্পতি বা শুক্র গ্রহতেও না ?

পবিত্র : উপাদানগুলি সব একই। যেমন ধরুন, বায়বীয় উপাদানগুলি সবই এক। বর্তমানে সেগুলি গড়ে উঠেছে, যেমন জুপিটারের আবহাওয়ায় এ্যামোনিয়া কার্বনিক গ্যাস রয়েছে।

শ্রীমা হ্যাঁ, তাহলে শেষপর্যন্ত একই রকমের জিনিস গড়ে ওঠেনি ?

পবিত্র স্থূল দেহে জৈবপদার্থ একই হতে পারেনা এটা খুব স্পষ্ট।

শ্রীমা হ্যাঁ লোকে সাধারণত সেটাকেই জানে...

পবিত্র : একই হতে পারে না।

শ্রীমা একই হতে পারেনা, তাইনা ?

প্রশ্ন চৈত্য পুরুষ কি ঐসব জগতেও আছে না শুধু এই জড় জগতেই ?

শ্রীমা আমি বলতে শুনেছি, চৈত্যপুরুষ কেবল এই পৃথিবীতেই আছে, যথার্থই তার কারণ হ'ল পৃথিবীর সৃষ্টিই হয়েছে সমস্যাকে এক-কেন্দ্রীভূত করবার প্রতীক হিসাবে, আর চৈত্যপুরুষ যিনি হলেন পরম পুরুষের প্রত্যক্ষ মধ্যস্থতার ফল তিনিই ঐ প্রতীক কর্মের প্রয়োজনে এখানে গড়ে উঠেছেন।

প্রশ্ন : মা, মঙ্গলগ্রহে বা বৃহস্পতিতে সত্যিই কি কোন জীব আছে ?

শ্রীমা তোমরা যদি আমাকে জিজ্ঞেস কর, তাহলে বলব সর্বত্র সত্তারা আছে, সর্ব-ক্ষেত্রেই আছে। লোকেরা তাদের দেখতে পায়না, এই যা। কিন্তু তাহলেও তারা সর্বত্র রয়েছে। অবশ্য আমরা সিনেমার ছবিতে যে রকমটা দেখি তারা নিশ্চয় সেরকম নয়, যেমন বিকটাকার মঙ্গলগ্রহবাসী, যাদের চলচ্চিত্রে দেখানো হয়েছিল। ওরা যে ঠিক সেই রকমই আমার তা মনে হয় না।

প্রশ্ন মা, তুমি কি "ফ্লাইং-সসারের" গল্প শুনেছ ?

শ্রীমা হ্যাঁ, শুনেছি। শুধু তাই নয়, আমি ও সম্বন্ধে পড়েওছি। সে যাই হোক, আমি ও সম্বন্ধে একেবারে বাহ্য অভিজ্ঞতা লাভ করবার অপেক্ষায় আছি। সত্যিই আমি গত যুদ্ধের সময় একটা ফ্লাইং-সসারকে পণ্ডিচেরীর ওপর দিয়ে উড়ে যেতে দেখেছিলাম, একেবারে পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিলাম, খোলা চোখে সমুদ্রের দিক থেকে ডাঙ্গার দিকে আসছে। সেটার রং ছিল হাল্কা নীল, আর কিছুটা গোলাকার, সেটা চলে যাচ্ছে দেখলাম, এবং মনে মনে ভাবলাম, "কি, এটা সূক্ষ্ম দর্শন নাকি" ? আমি চোখটা রগড়ে আবার দেখতে চাইলাম, কিন্তু চোখটা তো আমার খোলাই ছিল, সম্পূর্ণ খোলা ছিল। হঠাৎ আমি দেখলাম একটা কিছু আকাশপথে এইভাবে উড়ে চলেছে, তখন মনে মনে বললাম "খুব অদ্ভুত তো।" কিন্তু তখন পর্যন্ত কেউ আমাকে ও সম্বন্ধে কিছু বলেনি বলে আমি ভাবলাম এটা আমার একটা অলৌকিক দর্শন। আমি অনেক কিছু দেখতে পাই যেগুলো সাধারণত লোকেরা দেখেনা, কিন্তু যখন লোকেরা ও সম্বন্ধে বলাবলি করতে লাগল, তখন আমি মনে মনে বললাম, "কেন আমিই তো একটা ফ্লাইং-সসারকে দেখেছি।" বোধহয় 'উদার'ও একটা ফ্লাইং-সসারকে দেখেছে।

উদার আজ্ঞে হ্যাঁ মা দেখেছি। (সকলের হাস্য)

শ্রীমা ও বস্তু যে আছে তাতে কোন সন্দেহই নেই কিন্তু জিনিসটা কী ? প্রত্যেকেরই নিজের নিজের মত আছে। লোকেরা ও সম্বন্ধে যে সব বর্ণনা করে আমি সেই রকম সত্তাদের মুখোমুখী দেখতে চাই। বোধহয় কেউ একজন বলেছে...যাই হোক, সে বলেছে ঐ ফ্লাইং-সসারের একটা একটা সত্তার সঙ্গে সে নাকি কথা বলেছে। ঐরকম একটা সত্তার সঙ্গে আমি দেখা করতে পারলে খুবই খুশি হব। তারপর তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হলে আমি তোমাদের ও সম্বন্ধে বলবো।

প্রশ্ন : মা, লোকে বলে আরো সব সৌরজগৎ আছে যেখানে হয়ত পৃথিবীর মতন

একই রকম অবস্থা আছে। কিন্তু সেখানে কি আমাদের মতন মানুষ দেখতে পাওয়া যাবে?

শ্রীমা : সেখানে গিয়ে সেটা দেখতে হবে। (সকলের হাস্যরোল)

প্রশ্ন : না, আমরা কি অলৌকিক উপায়ে অন্যান্য গ্রহে যেতে পারি?

শ্রীমা হ্যাঁ নিশ্চয়, মানুষ সর্বত্রই যেতে পারে। যেতে বাধাটা কিসের? মানুষ যে জায়গাতেই যায়। কেবল তোমার জানা দরকার যে, আমাদের এই যে বাহ্য দেহ এটা যায় না। (কারণ এ হল সম্পূর্ণ জড় পদার্থ)...প্রাণ যেটা সম্পূর্ণ জড়ের মধ্যে রয়েছে, তার পক্ষে যাওয়াটা অত্যন্ত কঠিন। সাধারণত, প্রাণের যে অংশটা মনের সঙ্গে সংযুক্ত সেটাই বেরিয়ে যায়, মনটা নয়, প্রাণই যায়। খানিকটা দূর পর্যন্ত মানুষ সূক্ষ্ম দেহে বেরিয়ে যেতে পারে এবং সেরকম ক্ষেত্রে তারা সেখানে গিয়ে জড় জগতে জিনিসগুলি যেমন আছে তেমনিই দেখে। কিন্তু এভাবে মানুষ বেশি দূর যেতে পারেনা। তার ব্যবহারিক কারণ আছে, তা ছাড়াও কাছে নিরাপত্তার কারণ, কেননা সূক্ষ্ম দেহে খুব বেশী দূর গেলে দেহটা শুধু সমাধির অবস্থাতেই থাকেনা, তার চেয়েও বেশী সংজ্ঞালোপের অবস্থায় পৌঁছয়, এবং তেমন অবস্থায় যদি খুব গভীর জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি সেই দেহটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার না নেয় তাহলে অবস্থাটি সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই এই রকম সব দূর পথে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণত প্রাণের সূক্ষ্ম অংশটি গিয়ে থাকে (যেটি প্রাণের মানসিক চেতনার সমতুল্য), সেইটিই যায়।

তাই মানুষ সব কিছুই দেখতে পায় যেগুলো প্রায় একই রকমের। কিন্তু ধর, যদি সেখানে এমন কিছু থাকে যেটা খুবই স্থূল, তাহলে সে বস্তুটি যেমন, তাকে ঠিক তেমনটি দেখে না, তাই মানুষ নিশ্চিতভাবে বলতে পারেনা যে সেটা এরকম বা ওরকম, মাত্র বলতে পারে, "আমি এটা দেখেছি", তার বেশী কিছু নয়। কিন্তু চন্দ্র বৃহস্পতি বা শুক্রগ্রহে কি কি ঘটছে যেমন আমরা খবরের কাগজে পড়ি, সেরকম গল্প করতে পারেনা। মানুষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে, এবং বিশেষ বিশেষ জিনিষ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতেও পারে, কিন্তু সাধারণত সেগুলি ঢের বেশি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার।

যা হোক, যদি জানতে চাও সেখানে কোন সত্তা আছে কিনা, আমার তো মনে হয়, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এমন কোন জায়গা নেই যেখানে সত্তারা নেই, কারণ এই ব্রহ্মাণ্ডের স্বতন্ত্র সৃষ্টিই হোল মূলতত্ত্ব। এই সব বিভিন্ন সৃষ্টির ঘনীভূত অবস্থা বিভিন্ন রকমের। কেবল যাদের একই রকমের ঘনীভূত অবস্থা তাদের কাছে ছাড়া অন্যদের কাছে বেশীর ভাগই সৃষ্টির অগোচর, যারা দেহকে ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারে তারাই এ সব জিনিস দেখতে পায়। কিন্তু যতদিন তোমরা শুধু এই স্থূল চোখেই দেখ ততদিন খুব বেশী কিছু দেখতে পার না।

মানুষের স্থূল দৃষ্টির ক্ষেত্র খুবই সীমাবদ্ধ। বাস্তবিক, যদি এ বিষয় চিন্তা কর, দেখবে ব্যাপারটা অত্যন্ত হাস্যকর। আমাদের ইন্দ্রিয়গত বোধের অভিজ্ঞতার সীমা হল অতি-মাত্রায় হাস্যকর। অথচ যদি মন দিয়ে কোন মানুষ অথবা কোন কিছু অথবা সহরের বা কোন জায়গার কথা ভাবো, তাহলে তুমি তৎক্ষণাৎ দেখতে পাবে তুমি সেইখানেই চলে গেছ এবং মনের সংযোগ এতই নিখুঁত হতে পারে যে, তুমি সেখানে কথাবার্তা পর্যন্ত বলতে

পার, প্রশ্ন করতে পার, তার উত্তর পেতে পার, তবে অপর পক্ষের ব্যক্তিটিকেও যথেষ্ট পরিমাণে সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন হতে হবে। কেন, এমনটি তো সর্বক্ষণই ঘটে চলেছে। কেবল, সামান্য একটু জ্ঞান থাকা নিয়ে কথা, নইলে কি ঘটছে তা তুমি বুঝতেই পারবে না।

এমন কি দেহগত ভাবেই, এই চোখ দিয়ে মুখ দিয়ে নাক দিয়ে, হাতের আঙুল দিয়ে, কান দিয়ে, আমরা দেখছি, অনুভব করছি। মানুষ ইচ্ছা করলেই এগুলোর সামর্থ্য বাড়াতে পারে। যেমন ধর, মানুষ অভ্যাসের দ্বারা বেশ অনেকখানি দূরের কথাবার্তা শুনতে পারে, এবং সম্পূর্ণ বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারাই শুনতে পারে, অন্য কোন ভাবে নয়। কিন্তু সেজন্য তোমার ইন্দ্রিয়গুলির উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকা চাই এবং তাদের স্পন্দন ক্রিয়াকে বহুক্ষণস্থায়ী করার সামর্থ্য থাকা চাই।

তেমনি মানুষ অনেক দূরের বস্তুকে দেখতে পর্যন্ত পারে, এই স্থূল দৃষ্টিতে, সূক্ষ্ম দৃষ্টির দ্বারা নয়। ইচ্ছা করলে মানুষ তার দৃষ্টি-শক্তিকে অনেকদূর পর্যন্ত বাড়াতে পারে আর তার দর্শন ইন্দ্রিয়ের বাইরে নার্ভগুলির স্পন্দনকে কি ভাবে সঞ্চারিত করা যায় তা যদি তার জানা থাকে, তাহলে সে এই সংযোগকে দীর্ঘস্থায়ী করতে পারে। অবশ্য বলছি খানিকটা সীমানার মধ্যেই পারে, মাইল খানেক দূর পর্যন্ত নয়। যেমন ধর এ ঘরের দেওয়ালের ওপিঠে, ও ঘরের কি ঘটছে না ঘটছে তা তুমি দেখতে পার, যেটাকে সাধারণত লোকে অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে করে। কিন্তু এ জন্যে খুব নিয়মনিষ্ঠ ভাবে অভ্যাস করা চাই। কিন্তু তাহলেও এমনটা করতে পারা সম্ভব, যেমন দেখতে পাওয়া, অনুভব করতে পারা, শুনতে পাওয়া প্রভৃতি। যদি কেউ কষ্ট স্বীকার করতে রাজী হয় তাহলে সে তার ক্ষেত্রটিকে বহুল পরিমাণে বিস্তৃত করতে পারে। কিন্তু এর জন্যে যথেষ্ট খাটতে হবে, অধ্যবসায়ী হতে হবে, অক্লান্ত পরিশ্রমী হতে হবে। এমনও তো দেখা গেছে যে চোখ দিয়ে দেখতে পাওয়া ছাড়াও মানুষের অন্যান্য দৃষ্টি-কেন্দ্রের বিকাশ হয়েছে। এমন সব লোকের ক্ষেত্রে এসব পরীক্ষা করা হয়েছে, যারা যে কোন কারণেই হোক বাহ্য দৃষ্টিহীন, নিয়মিত ভাবে লেগে থেকে অভ্যাস করে চলার দ্বারা মানুষের একাধিক বা একটি দৃষ্টিকেন্দ্র বিকাশ লাভ করতে পারে। জুল রোমাঁ (Jules Romains) এ-সম্বন্ধে একটি বই লিখেছেন। তিনি স্বয়ং এ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন এবং চূড়ান্ত ফললাভ করেছিলেন।

এর মানেই হল আমাদের মধ্যে এমন বেশ কয়েকটি সম্ভাবনা আছে সেগুলিকে আমরা ঘুম পাড়িয়ে রাখি, কারণ সে-সবের বিকাশের জন্যে আমরা কোন কষ্ট স্বীকার করিনা। আমরা যে সব কাজ করে থাকি তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি কাজ আমরা করতে পারি। কিন্তু ব্যাপারগুলি যেমনভাবে ঘটে আমরা সেইগুলিকে ঠিক সেভাবেই স্বীকার করে নিই।

মায়ের লেখা — মায়ের কথা

মনের শিক্ষা

অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায়

মন কি? সাধারণ অর্থে কথাটি বাছবিচারহীন ভাবে সমস্ত চেতনাকেই বোঝায়। মানুষ হল মনোময় সত্তা। সব কিছুকে মনোগত করতে পারে সে। শ্রীঅরবিন্দ ও মায়ের যোগে মন (mind) এবং মানসিক (mental) কথা দুটি যে অর্থে ব্যবহার করা হয় তা হল প্রকৃতির বিশেষ অংশ যেগুলির সম্পর্ক আছে ধারণাশক্তি, বুদ্ধি, ভাব-কল্পনা, মানসিক অথবা চিন্তার দ্বারা সৃষ্ট সব রূপমূর্তি, চিন্তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, মনের গতি-প্রকৃতি, সৃজনশীলতা, মানসিক দৃষ্টি বা vision এবং ইচ্ছা ইত্যাদির সঙ্গে, যা কিছু মানুষের ধীশক্তির (intelligence) অন্তর্গত।

মনের বৈশিষ্ট্য কি? মন এমন একটি চেতনা যা পরিমাপ করে, সীমার গণ্ডি টানে, অবিভাজ্য পূর্ণের অঙ্গ থেকে কেটে এনে খোদাই করে গড়ে তোলে রূপ এবং তার ধারণা ও বিশ্বাস যে তার প্রত্যেকটি সৃষ্টি হল পৃথক এবং সম্পূর্ণ।

শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যার ভাবার্থ তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। এবার আসি মায়ের প্রবন্ধ "Mental Education"-এ।

মা বলছেন যে সব শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে মনের শিক্ষাই ব্যাপকভাবে পরিচিত এবং প্রচলিত। কিন্তু অতি অল্প এবং বিরল কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া মনের শিক্ষা পদ্ধতিতে যে সব ফাঁক আছে তা-ই পদ্ধতিটিকে অপূর্ণ এবং অপ্রতুল করে তোলে।

সাধারণভাবে বলা যায় যে স্কুলে পাঠানো মানেই শিশুর মানসিক শিক্ষার পক্ষে যথেষ্ট হল। তাই যদি না হবে তবে স্কুলে পাঠানো কেন? তারপর শিশু যখন বেশ কয় বছর নিয়মিত শিক্ষালাভ করল, যা, "is more like cramming", মুখস্থ বিদ্যা শিখল (অর্থাৎ তার যথার্থই শিক্ষালাভ হয়নি), তবু আমরা ধরে নিলাম যে শিশুর মানসিক উন্নতির জন্য যা করণীয় তা করা হল। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে প্রয়োজনীয় মাত্রায় এবং অতি সতর্কতার সঙ্গে, সেখানে? সেখানেও মায়ের মতে, এই পদ্ধতি "cannot impart to the human mind the faculties it needs to become a good and useful instrument". এই শিক্ষাপদ্ধতি মানুষের মনে সেই মৌলিক মানসিক শক্তিগুলিকে জাগিয়ে দিতে অক্ষম যেগুলি মনের প্রয়োজন — সুষ্ঠু এবং দরকারী যন্ত্র হয়ে উঠতে।

সেই দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যাবে যে স্কুল-শিক্ষার প্রতিটি শাখা হয়ে ওঠে, "a special kind of mental gymnastics, and verbal formulations given to these various branches, each constitute a special and well-defined language", এক একটি বিশেষ ধরণের মানসিক মল্লক্রীড়ায় পর্যবসিত

হয় এই শিক্ষা পদ্ধতিগুলি। যদিও, বিভিন্ন শাখাগুলির নিজস্ব বিশেষ বাচনিক রূপ, অর্থ বা সংজ্ঞা থাকে।

মায়ের দেওয়া মনের শিক্ষার উদ্দেশ্য হল মানুষকে ঊর্ধ্বতর জীবনের জন্য তৈরী করা। এই পদ্ধতির পাঁচটি পর্ব বা ধাপ আছে। সাধারণতঃ পর্বগুলি আসে একটির পর একটি, তবে বিশেষ মানুষের ক্ষেত্রে এই পঞ্চপর্ব শিক্ষা একসঙ্গেই চলতে পারে, বা পরপর না বসিয়ে অদল-বদল করে নেওয়া যায়। পর্বগুলি হল

১) একাগ্র হওয়ার ক্ষমতার বিকাশ — অর্থাৎ মনোযোগ দেবার সামর্থ্য বৃদ্ধি।

২) মনকে সম্প্রসারিত করা, ব্যাপক করা, তার বৈভব বৃদ্ধি করা।

৩) নিজের ভাবরাজ্যের সংগঠন একটি মূল ভাবনার (Central Idea) চারিপাশে। মূল ভাবনা হল একটি উচ্চ আদর্শ অথবা পরম দীপ্তিমান একটি ভাবনা যা জীবনের পথনির্দেশক হবে।

৪) চিন্তা নিয়ন্ত্রণ, অপ্রিয় চিন্তা বর্জন, যেটুকু ভাবতে চাই সেইটুকুই ভাবব কেবল, যখন ভাবতে চাইব তখনই পারব ভাবতে — এ ক্ষমতা অর্জন।

৫) মানসিক নীরবতা, নিখুঁত প্রশান্তি গড়ে তোলা এবং সত্তার ঊর্ধ্ব এলাকা থেকে আসা প্রেরণার দিকে মনের মুখ সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে রাখা।

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে শিশুর মানসিক অগ্রগতির পথে বিশেষ বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাদের চিন্তারাশি। সেগুলির সর্বক্ষণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়ার প্রবণতা থাকে। শিশুদের চিন্তাগুলি প্রজাপতির মত পাখা মেলে যত্রতত্র উড়ে বেড়ায়। সেগুলিকে সামলান এবং এক জায়গায় তাদের চিন্তা স্থাপন করা যথেষ্ট চেষ্টা সাপেক্ষ। শিশুদের মধ্যে মনোযোগ দেবার ক্ষমতাটি ঘুমিয়ে থাকে, কারণ দেখা যায় যে, কোন একটি ব্যাপারে তাদের ঔৎসুক্য জাগিয়ে তুলতে পারলে শিশুরা যথেষ্ট মাত্রায় মনোযোগ দিতে সক্ষম। "By his ingenuity, therefore, the educator will gradually help the child to become capable of sustained effort of attention and a faculty of more and more complete absorption in the work in hand". শিক্ষক কি করবেন? নিজের উদ্ভাবনী দক্ষতার দ্বারা ক্রমে ক্রমে তিনি সাহায্য করবেন শিশুকে যাতে তার মনোযোগ টিকিয়ে রাখার ক্ষমতা গড়ে ওঠে, এবং হাতের কাজে সে যেন পূর্ণমাত্রায় নিবিষ্টচিত্ত হতে পারে। মনোযোগ বৃদ্ধির ক্ষমতাটিকে নিপুণ করে তোলা যায় যে যে উপায়ে, তা সে খেলার মাধ্যমেই কিংবা পুরস্কার দিয়েই হোক, সবগুলিই উপকারী এবং সবগুলিই ব্যবহার করা যেতে পারে, প্রয়োজন এবং পরিস্থিতি অনুসারে। এই কাজে মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াটি হল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হল শিক্ষক যেটি শিক্ষা দিতে চান সেই বিষয়টির সম্বন্ধে শিশুর আগ্রহ এবং কৌতূহল জাগিয়ে তোলা। তার ভাল লাগান এবং সাথে সাথে তার মধ্যে উন্নতির ইচ্ছা জাগিয়ে তোলা। "To love to learn is the most precious gift that one can give to a child, to love to learn always everywhere, so that all circumstances, all happenings in life may be constantly renewed opportunities for learning more and always more". শিশুকে সব

থেকে মূল্যবান উপহার যা মানুষ দিতে পারে তা হল শিখতে ভালবাসা। শিখতে ভালবাসা সর্ব সময়ে, সর্ব ক্ষেত্রে। জীবনের সব ঘটনা, সমস্ত পরিস্থিতি তার চোখে যেন শেখার, আরও শেখার, নিরন্তর সুযোগ হয়ে দেখা দেয়। এর জন্য মনোযোগ এবং একাগ্রতা ছাড়াও আরও কিছু প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে পর্যবেক্ষণ শক্তির সংযোজনের এবং প্রয়োজন আছে স্মৃতিশক্তির যথাযথ ধারণ ক্ষমতা। মনের এই পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা গড়ে তোলা যায় নানাবিধ এবং স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যাসের সাহায্যে। প্রথম, প্রত্যেকটি সুযোগ কাজে লাগাতে হবে যাতে শিশুর মন থাকে সজাগ, সতর্ক এবং তৎপর। দ্বিতীয়, বোধশক্তি এবং উপলব্ধির উন্নতির দিকে বেশী জোর দিতে হবে, স্মৃতিশক্তি সংগঠনের থেকেও। বলা যায় একজন সেইটুকুই জানে যেটুকু সে বুঝেছে। যান্ত্রিকভাবে মুখস্থ করে গেলে, মন থেকে অল্প অল্প করে বিষয়বস্তুটি মুছে যেতে থাকে এবং শেষে মানুষ ভুলে যায়। কিন্তু যা একবার বুঝে নিয়েছে তা সে ভোলেনা। তৃতীয়, শিশুর "কি বা কেন" প্রশ্নের ব্যাখ্যা দিতে অসম্মত না হওয়া। যদি আমি না পারি বা অক্ষম হই শিশুর প্রশ্নের প্রকৃত জবাব দিতে তবে আবার উচিত শিশুকে সেই মানুষটির কাছে পাঠানো যিনি উত্তর জানেন বা শিশুকে দিতে পারেন সেই সব বই পড়তে, কিংবা সাহায্য করতে পারেন যেভাবে তার প্রশ্নের সমাধান মিলবে। এই প্রচেষ্টায় শিশুর দু'টি লাভ হবে। একটি হল, এই পথে শিশুর মনে পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ গড়ে উঠবে। অন্যটি হল তার জানার আকাঙ্খা তার স্বভাব হয়ে যাবে।

এরপর স্বভাবতই আসে উন্নতির দ্বিতীয় অধ্যায়, অর্থাৎ যেখানে মন হবে ব্যাপক এবং সমৃদ্ধ।

এবার শিশুকে শেখাতে হবে যে সব কিছু-থেকেই কিছু না কিছু শেখা যায়, যদি দৃষ্টি-ভঙ্গিটি ঠিক থাকে। প্রতিদিনের জীবন, প্রতি মুহূর্তের জীবনই যে হল সব স্কুলের থেকে বড় স্কুল। বিভিন্ন তার দিক, কতমত তার উপকরণ। বহুরূপী সে। জটিল অসংখ্যায়িত অভিজ্ঞতায় ঠাসা। আছে সফল, বিফল, অনুকূল, প্রতিকূল প্রতিফল। সেখানেই তো সমস্যার সমাধান করতে হবে। স্পষ্ট স্বচ্ছ উদাহরণ রাখতে পারা যাবে।

এ শিক্ষা শিশুকে দেব কেমন করে? মা বলছেন অতি সহজেই শিশুর মনে একটি স্বাস্থ্যকর কৌতূহল জাগিয়ে তোলা যায়। কেমন করে? না, বাচ্ছারা যখন প্রশ্ন করে, তাদের এড়িয়ে না গিয়ে তাদের প্রশ্নের বোধগম্য উত্তর দিয়ে। যদি একটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর শিশু পায় আর তারপরে সে তোলে আরও কৌতূহলী প্রশ্ন, তারও ঠিক ঠিক উত্তর যখন পায় সে তাহলে দেখা যায় যে একটি মনোযোগী শিশু সে ক্লাসে বসে বা শেখে তার থেকে অল্পেশে অনেক বেশী শিখতে পারে। বাছাই করে, যত্ন করে, একটু অন্তদৃষ্টির সাহায্যে শিশুকে শেখাতে হবে ভাল ভাল বই পড়া ভালবাসতে। এমন বই যা তাকে আকর্ষণ করবে অথচ তার মধ্যে আছে শিক্ষার মালমশলা। শিশুর কল্পনার জাগরণ বা কল্পনা বিলাস নিয়ে চিন্তা করার বা ভয় পাবার কোন কারণ নেই। কল্পনাই যে মনের সৃষ্টিধর্মী গুণগুলিকে জাগিয়ে তোলে এবং কল্পনার মাল মশলাই পড়াশোনায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে। মন ভরে ওঠে আনন্দে।

শিশুমনকে নমনীয় এবং সর্বগ্রাহী (comprehensive) কেমন করে করব ?

আপাতদৃষ্টিতে উত্তর বেশ সোজা মনে হয়। ভালভাবে প্ল্যান করে শিশুকে নানাবিধ বিষয় বা টপিক পড়ালেই কাজ হবে। না বলছেন শুধু তাতেই হবে না। একটি বিষয়কে নানা দিক থেকে আলোচনা করতে হবে যাতে শিশুমনে এই ধারণাটি জন্মায় যে এক একটি সমস্যাকে নানা দিক থেকে দেখা যায় এবং তার সমাধানের উপায় একটির বেশী থাকা সম্ভব। এইভাবে তার মতবাদ আড়ষ্ট হয়ে ওঠে না, এবং চিন্তা সমৃদ্ধ হবে, নমনীয় (supple) হবে এবং ক্রমে ক্রমে মনটি গড়ে উঠবে বৃহৎ এবং ব্যাপক সমন্বয়ের পথে। এইভাবে অগ্রসর হলে শিশুমনের আর একটি নতুন পথ খুলে যাবার সম্ভাবনা। "This way also the child will be imbued with the sense of the *extreme relativity of mental learning* and little by little, an aspiration for a truer source of knowledge will awaken in him," এইভাবে শিশুমন জানবে যে মানসিক শিক্ষাই চূড়ান্ত নয়, যতই তার প্রয়োজনীয়তা থাক না, সে শিক্ষার কপালে যে রাজতিলক নেই। ক্রমে ক্রমে শিশুর মনে জাগবে সত্যকার জ্ঞানের উৎসমুখ খোঁজার উন্মুখ আশ্পৃহা।

আমরা জানি যে শিশু যেমন যেমন বড় হতে থাকে তার মনেও তেমনি পাক ধরে। দেখতে দেখতে তার ক্ষমতা জাগে নিজের ধারণাকে রূপ দেবার, জেগে ওঠে তার মতামত, তারই সঙ্গে একেবারে অবশ্যম্ভাবী ভাবে আসা প্রয়োজন একটি প্রত্যয়, একটি নিশ্চয়তা, এমন একটি জ্ঞানের জন্য যা যথেষ্ট স্থিতিশীলভাবে গড়ে দেবে মনের গঠনের ভিত্তিভূমি। এবং সেই ভিত্তিভূমির উপর নানামুখী ছড়ানো ছিটোনো, মাঝে মধ্যে পরস্পর বিরোধী চিন্তা-ভাবনা, যা মাথায় এসে জমা থাকে, সেগুলিকে সুসংগঠিত করতে সাজিয়ে গুছিয়ে নেবে সে। চিন্তাভাবনার সুসংগঠন অতি অবশ্য প্রয়োজন বিশৃঙ্খল চিন্তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য। সব পরস্পর বিরোধী অসঙ্গতি বদলে যেতে পারে মিতালিতে, কিন্তু তার জন্য আবিষ্কার করতে হবে উর্ধ্বের সেই ভাব, যার ক্ষমতা আছে এই সমন্বয় সাধন করার। প্রত্যেকটি সমস্যাকে সবকয়টি সম্ভাব্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে — হবে কি? পক্ষপাতিত্ব করার বা কোন একটি দৃষ্টিকোণকে বাধা দেওয়ার প্রবৃত্তি থাকবে না। তাহলে দাঁড়ায় যে চিন্তাধারাকে যদি ক্রিয়াশীল ও সৃজনশীল করতে হয়, তাহলে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে, আমার চিন্তায় যে কয়টি দৃষ্টিকোণ গ্রহণযোগ্য হবে তাদের যেন স্বাভাবিক এবং যুক্তিসঙ্গত সমন্বয় হয়। এবং যদি আমি চাই আমার সমগ্র চিন্তারাশিকে একটি প্রগতিশীল এবং গঠনমূলক শক্তিতে বদলাতে, তবে অতি যত্ন সহকারে আমার মানসিক সমন্বয়ের কেন্দ্রভাবটিকে বেছে নিতে হবে। সেই মূল ভাবটি যাচাই উপর নির্ভর করবে সেই সমন্বয়ের মূল্য। যত উঁচু এবং বিরাট হবে সেই মূল ভাবটি, যত সর্ববাপী হবে, থাকবে স্থানকালের উর্ধ্বে, তাহলে যতই বহুবিধ এবং জটিলতাই হোক না কেন স্রোত, ধারণা চিন্তা, সবই সুসংগঠিত এবং সুসংগত হবে।

বলাবাহুল্য এই সংগঠনের কাজ একবারে সেরে ফেলা যাবে না। মনে যদি জীবনীশক্তি ও তারুণ্য জিইয়ে রাখতে হয়, তবে তাকে এগিয়ে যেতে হবে নিরলসভাবে, ক্রমাগত এবং পুরোনো ধারণাগুলির পুনর্বিচার করে সংশোধন করে নিতে হবে নতুন জ্ঞানের আলোয়। মনের চৌহদ্দিসীমা প্রসারিত করতে হবে নতুন ধারণা গ্রহণ করার জন্য

এবং নিয়ন্ত্রন চিন্তাগুলিকে ঝেড়েমুছে আবার নতুন করে সাজিয়ে নিতে হবে, যাতে পরে ঘরে সাজানো চিন্তাগুলির মধ্যে কোন চিন্তাগুচ্ছ যেন অপাংক্তেয় না হয়ে দাঁড়ায় এবং সবগুলোই যেন সুসংহত এবং নিয়মনিষ্ঠ।

এতক্ষণ যা কিছু আলোচনা করা হল তা হল দুরকল্পনাপ্রবণ মনের জন্য। যে মন ছাত্র — শিখছে।

পাঠ নেওয়া যেমন মনের একটি দিক, মা বলছেন, মনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল গঠনশীলতা। দু'টি দিকই তুলনায় সমান — মন যেমন একদিকে ছাত্র, অন্যদিকে সে কর্মিতকর্মা। মনের গঠনশীল দিকটি কদাচিৎ কখনও নজরে পড়ে। এই দিকটিকে বিশেষ অধ্যয়ন কিংবা অনুশাসনে রাখার ইতিহাস তাই সাধারণ মানুষের আয়ত্তচরিতে প্রায় বিরল। কেবল যারা, বিশেষ কোন কারণে কর্মিতকর্মা মনের উপর কঠোর কর্তৃত্ব রাখতে চেয়েছেন, তাঁরাই কেবল ভেবেছেন যে মনের এই দিকটিতে — অর্থাৎ মনের গঠনসক্ষম, সংগঠনধর্মী ক্ষমতাটির দিকে — সতর্ক নজর রাখার কথা, অনুশাসন কায়েম করার কথা। ভেবেছেন তারা নিশ্চয়ই, কিন্তু যেই মনের পায়ে অনুশাসনের বেড়ি পরাতে গেছেন অমনি তাঁরা প্রবল বিদ্রোহের মুখোমুখি হয়েছেন। সে বাধা অনেক সময় প্রায় অনতিক্রম্য।

এ সব বাধা থাকা সত্ত্বেও মনের এই সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপ নিজের আয়ত্তে আনা আত্মশিক্ষার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক। "one can say that without it no mental mastery is possible." বলা যায় যে সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপের উপর কর্তৃত্ব না থাকলে আমি আমার মনের গুরু হতে পারব না। মনের এদিকটিকে অধ্যয়নের উপায়? মা বলছেন, সব ভাব সব ধারণাই গ্রহণ করা যেতে পারে, আর মন-সমন্বয়ে স্থান দেওয়া যেতে পারে। আর কেন না সমন্বয় যে চায় বহু নতুনের জটিল সমাবেশ, ক্রমবর্দ্ধমান সমৃদ্ধির জন্য। সমন্বয়ের ভূমিতে সব ভাবই আসতে পারে কিন্তু যেই কর্মশক্তির প্রয়োগের দিকে আসা গেল ব্যাপারটি কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। যে ভাবটি গ্রহণ করলাম কর্মে রূপান্তরিত করার জন্য সেটির উপর জোর কব্জা অধিকার থাকা দরকার এবং কেবল সেই সেই ভাবগুলি, যেগুলি মূল ভাবের সঙ্গে সাধারণ ভাবে খাপ খায়, (যে মূল ভাবটিকে আমার মানসিক সমন্বয়ের ভিত্তিভূমি করেছি) কেবল সেই মানানসই ভাবগুলিকে কর্মে আত্মপ্রকাশের ছাড়পত্র দিতে। অর্থাৎ দাঁড়ান যে প্রতিটি চিন্তা যা মন-চেতনায় প্রবেশ করল, সেগুলিকে সেই মূল ভাবটির সামনে হাজির করতে হবে, যদি তার যুক্তিসঙ্গত স্থান হল, আগে থেকে গুছিয়ে রাখা শ্রেণীবদ্ধ ভাবগুলির কোন একটি তাকে, তবে ভাল, সে স্থান পেল সমন্বয়ের ভাণ্ডারে। যদি না, তো, না। বিনা বাক্য-ব্যয়ে সেই ভাবটিকে পরিত্যাগ করার উপদেশ দিচ্ছেন মা, যাতে সেই ভাবটির কোন প্রভাব আমার ক্রিয়াকর্মে না পড়ে। মানসিক শোধনের কাজ নিয়মিত করা কর্তব্য যদি আমি নিজের ক্রিয়াকর্মের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব চাই।

নিয়মিত যদি করতে চাই তবে তার উপায়? মা বলছেন, প্রতিদিন কিছু সময় সরিয়ে রাখা ভাল শান্তচিত্তে নিজের চিন্তাগুলি পরিদর্শনের জন্য, নির্দিষ্ট সমন্বয়ের সুবিন্যাসের উদ্দেশ্যে। কি ফল পাব? মায়ের উত্তর : "একবার অভ্যাসটি রপ্ত করতে পারলে, তোমার চিন্তার উপর বজায় রাখতে পারবে নিয়ন্ত্রণ। সে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা সম্ভব হবে কর্মব্যস্ততার

মধ্যেও। কাজের মধ্যে বা সময়ে শুধু সেইগুলির প্রবেশপত্র থাকবে যেসব চিন্তার প্রয়োজন তোমার হাতের কাজে। বিশেষ করে যদি তুমি একাগ্রতা এবং মনোযোগ চর্চা নিয়মিত করে থাক, তবে যে চিন্তাগুলি প্রয়োজন কেবল সেগুলিই ঢুকতে পাবে তোমার কর্মতৎপর বাহির চেতনায় এবং তারা তখন আরও সক্রিয় এবং কার্যকরী হয়ে ওঠে। এবং যদি একাগ্রতার তীব্রতায় বা ঐকান্তিকতায়, প্রয়োজন হয়ে পড়ে কিছু না ভাববার, তবে সমস্ত মানসিক অনুকম্পন-অনুরণন নিশ্চল করে দেওয়া যায় এবং প্রায় সম্পূর্ণ নীরবতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সেই নীরবতায় একজন নিজেকে খুলে ধরতে পারে মনের ঊর্ধ্ব এলাকার দিকে এবং শিখতে পারে কি ভাষায় লিখে নিতে হয় সেই অনুপ্রেরণাগুলি যেগুলি আসে সেই ঊর্ধ্ব ভূমি থেকে।"

এই অবস্থায় পৌঁছানোর আগেও নীরবতার নিজস্ব একটি পরম মূল্য আছে। কারণ বেশীর ভাগ মানুষ যাঁদের মন পরিণত এবং কর্মতৎপর, তাঁদের মন কখনও বিশ্রাম নেয় না। দিনের বেলায় মনটির কর্মচাঞ্চল্য নিয়ন্ত্রণের মধ্যে হয়তো রাখা যায়, কিন্তু রাত্রে দেহ যখন গভীর নিদ্রামগ্ন, জাগ্রত অবস্থার আগল তখন প্রায় সম্পূর্ণ খুলে যায় এবং মন তখন ছাড়া পেয়ে নেতে যায় এমন কাজে যেগুলিকে অক্লেশে অনেক সময় অপরিমিত, অসংলগ্ন, কিংবা বিচ্ছিন্ন আখ্যা দেওয়া যায়। মনের এই যা-খুশী-তাই চলন-বলনে যে চাপ সৃষ্টি হয় তারই নিমন্ত্রণে আসে অবসাদ, গ্লানি ইত্যাদি।

মা বলছেন, মানুষের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মত "the mind too needs rest and it will not have the rest unless we know how to provide it", মনেরও প্রয়োজন আছে বিশ্রামের কিন্তু সে তো বিশ্রাম নেবে না যদি আমরা না জানি কেমন করে তার বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিতে হয়। বিশ্রামটি মনের সামনে জুগিয়ে দিতে হবে। মনের বিশ্রাম একটি আর্ট, একটি গুণ যেটিকে আয়ত্ত করা সম্ভব। মন যে কাজে নিত্য ব্যস্ত তার গতিপ্রকৃতি পালটে দিলে মন বিশ্রাম পায়। ওটি একটি পথ অবশ্যই তবে "the greatest possible rest is silence", শ্রেষ্ঠতম বিশ্রাম হল নীরবতা। "a few minutes passed in the Calm of silence are more effective rest than hours of sleep." কয়েক মিনিট নীরবতার শান্তিতে অতিবাহিত করা অনেকক্ষণ ঘুমের থেকেও বেশী কার্যকরী।

যে শিখেছে মনকে নীরব করতে নিজের ইচ্ছামত, এবং যে একাগ্র হতে পারে গ্রহণ-উন্মুখ নীরবতায়, "There will be no problem that cannot be solved, no mental difficulty whose solution cannot be found," এমন কোন সমস্যা নেই যার সমাধান হয় না, কোন মানসিক বাধা নেই যার মীমাংসা নেই। মন যখন উত্তেজিত হয়, চিন্তা তখন বিভ্রান্ত, অক্ষম। মনটি যখন থৈ থৈ দীঘির মত শান্ত, সেই শান্ত মন যখন বলে "আমি কান পেতে রই", আলো তখন আপনি ফুটে উঠতে পারে, নতুন দিগন্ত খুলে দিতে মানুষের এই আধারে।

(*Collected Works of the Mother*,
Vol. 12, pp. 24 to 29 থেকে উদ্ধৃতিগুলি গৃহীত)

সম্মোহিত

নিশিকান্ত

ওতো সোনা নয়, ওযে-গো সোনার ছায়া,
পথের দুধারে অলীক-আলোক-লিপা,
ওতো রূপ নয়, ওযে-গো রূপের মায়া,
শূন্য-দীপের উত্তাপ-হীন-শিখা।
ওরে পাখি, মোর পাখি,
ওযে উজ্জ্বল-ফাঁকি,
ওযে পুঞ্জিত প্রবঞ্চনার কায়া,
স্বপন-সুধায় মন ভুলাবার সাকী।

ঐ মন-সম্মোহন-মরজাল
ছিন্ন করিয়া যেতে হবে আরো দূরে,
মানস মায়ার রচিয়া অন্তরাল
ওরা যে লুকানো আমার বহুরে;
ওগো পাখি, মোর পাখি,
মেলো জাগ্রত-আঁখি,
স্মরি' আদিত্য প্রদীপ্ত করো ভাল,
চলো মুক্তির প্রয়াণে পরাণ রাখি'।

নীড়ের আগল ভেঙে ফেলে এলে তুমি,
তুমি ছিঁড়ে এলে অরণ্য-বন্ধন,
তোমার পাখার পুলক-পালক চুমি'
কত গিরি-চূড়া করে অভিনন্দন;
ওগো পাখি, মোর পাখি,
প্রোজ্জ্বল-অনুরাগী,
এবার এসেছে সুবর্ণ-বন-ভূমি,
সুন্দর-বাধা সমুখে রয়েছে জাগি'।

এই মেঘ-লোক গন্ধর্বের পুরী,
এযে প্রাণহীন মাধুরীর কারাগার,
রঞ্জিত ফেন-আবর্তে বিচ্ছুরি'
দোলে নিষ্ফল বাষ্পের পারাবার;

ওগো পাখি, মোর পাখি।
ফেলো রাম-ধনু রাখী,
পোরোনা ওদের বিদ্যুৎ-অঙ্গুরী ;
গতি রুধিয়োনা ক্ষণিক-মণির লাগি'।

যেথা আছে তব জ্যোতির অধীশ্বর —
শত সূর্য্যের কিরণের অধিকারী,
যে লালে নিত্য প্রভাতের নির্ঝর —
আঁধার-কালের অধরে আলোক-বারি,
ওরে পাখি, মোর পাখি,
এখনো সে-পথ বাকি,
বহ্নি-তৃষায় দোলে নাকি অন্তর,
জ্যোতি-চেতনার অভীপ্সা জাগে নাকি ?

[নিশিকান্ত এই কবিতাটি তাঁর "ভোরের পাখী" কাব্যগ্রন্থে বহু আগে ছাপিয়ে ছিলেন, কিন্তু তাতে শ্রীঅরবিন্দের মন্তব্য ছিল না। তাঁর মন্তব্য বিশেষ উপভোগ্য বলে কবিতাটি আবার ছাপান হল। নীরদবরণ কবিতাটি শ্রীঅরবিন্দের কাছে পাঠিয়েছিলেন। — সম্পাদক]

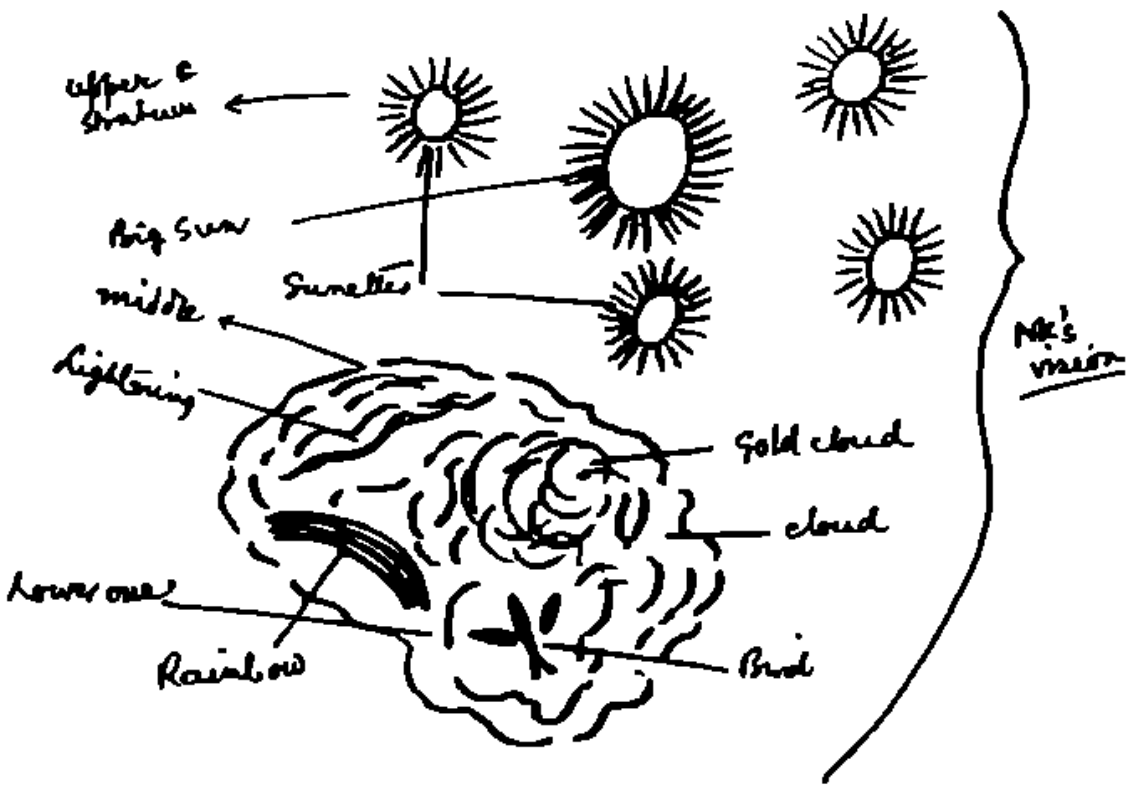

Nishikanta's Bengali poem
(Illustration by myself)

Now then, what do you think of the vision-poem by NK and its illustration by my "noble self", and its significance? Qu'en dites-vous?

Very remarkable — the poem, I mean. As for the vision I know it only through your work of art which leaves me stunned with astonishment if not admiration and therefore unable to articulate. Its greatest point is the bird which is a chef-d'œuvre.

January 21, 1936(?)[1]

গুরু নিশিকান্তের বাংলা কবিতা আবার চিত্রাঙ্কনসহ, পাঠালাম। তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টি-সম্পন্ন কবিতার এবং মদীয় 'বহৎ আত্মার' দ্বারা তার চিত্রিত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আপনার মত কি জানতে চাই।

শ্রীঅরবিন্দ অতি উত্তম, অদ্ভুত — অর্থাৎ কবিতাটি। সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্বন্ধে জানতে পারলাম তোমার অপূর্ব শিল্পকর্মের সৌজন্যে। প্রশংসার কথা বাদ দিলেও বিস্ময়ে আমি হতবুদ্ধিপ্রায়, তোমার শিল্পগুণের কৃতিত্বে। কোন ভাষাই খুঁজে পাচ্ছি না। তার বস্তু কতিত্ব হল পাখিটি — সৃষ্টির একেবারে পরাকাষ্ঠা।

[1] This letter, with my question and drawing, is not dated. Very likely it was written on January 21, 1936 and sent separately from my notebook. —Nirod

সাবিত্রী

রাজার যোগের দ্বিতীয় পর্ব

সুধা বসু

[অনির্বাণের ভাষণ অবলম্বনে]

এবার তাহলে রাজার বিশ্বায় যোগপর্ব, সর্বাত্মভাবের যোগযুক্ত অনুভব এই বিশ্বরূপ দর্শন। "মদাত্মা সর্বভূতাত্মা" হলে হয় আনন্ত্যের বোধ। ব্যাপ্তি বা বৃহত্তের চেতনায় নিজের মধ্যে সবকে অনুভব করা যায় আর তখনই ভিতর থেকে কুণ্ডলী উন্মোচিত হতে থাকে। এই বিশ্বরূপ দর্শন পুরুষের চোখে প্রকৃতির দর্শন এর পর আছে স্বরূপের দর্শন। এই বিবৃতির এক পর্ব প্রত্যক্ (subjective), কিনা আত্মগত, নিজের মধ্যে দেখা। এই দেখা যে পর্যন্ত না পরাক্ (objective) বা বাহিরে বৃহতের মধ্যে না দেখা যায়, ততক্ষণ চিত্তের তৃপ্তি বা তুষ্টি আসে না। যা কিছু অগম্য ছিল প্রত্যক্-গোচর হল, বিষয়ীর দর্শন দানা বেঁধে বিষয়কে দেখা — অপরূপ রূপ গ্রহণ করছে। এইভাবে 'স্ব' কিনা সেই আপনার মধ্যে যে অফুরান দেখা, বিশ্বকে দেখা, তখন এই দেশকালের কল্পনা ভুলে যেতে হয়। যেমন কিনা চোখ দিয়ে বাইরে যে দেখি দেশে ও আয়তনে অপার বৈষম্য — এ কেমন করে হয় ? কিন্তু চেতনার গভীরতা তীক্ষ্ণতা ও ব্যাপ্তি সব কিছুকে অঙ্গীভূত করে যেমন দীপশিখার মত সঙ্কীর্ণ স্থলে থেকেও তার আলো চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়, তেমনই আত্মচৈতন্য দীপশিখার মতই ব্যাপ্ত হয়ে বিশ্বকে অনুভব করে। প্রথম দিকে সমষ্টি বিশ্বকে এক নিমেষে বিদ্যুল্লেখার মত দর্শন হয়, সে যেন এক দীর্ঘিত আয়তন, কিন্তু তার শক্তি অন্তর্মুখী (convergent lines of forces)। সেই ঐকান্তিক অন্তর্মুখীনতা যেন প্রাচীরের মত বেষ্টন করে আছে। ধ্যানে যেমন হয়, এই একান্ত বোধের প্রথম ধারা বিশ্ব তত্ত্বের ধারা আত্মতত্ত্বে অন্তর্মুখীন একাগ্রতার আত্মচৈতন্যে অনুবিদ্ধ | এক mystic barage। চৈতন্য তীক্ষ্ণ ও গাঢ়, ভেসে যাবার লঘুতা নেই। অনন্তব্যাপ্ত নিবিড় সেই রূপকৃৎ জ্যোতি পরমেরই চিদ্ঘনরূপ আত্মচৈতন্য।

লোক-সংস্থান (world-pile) সব খুলে যাচ্ছে। ভূলোক থেকে সত্যলোক পর্যন্ত, নীচে একবিন্দু থেকে বিস্তার হয়ে হয়ে ঊর্ধ্বে উঠে গেছে — এক বলয়ের কল্পনা আনা যায়, ক্রমশ তা বিস্তৃত ও সূক্ষ্মতর হয়ে চলেছে। নাম দিলেন cube crystal; তন্ত্রে বলেছে শৃঙ্গাটক। শক্তির ত্রিভুজ যন্ত্রের কল্পনায় তিনগুণের সামরস্য বোঝান হয়েছে। এও তেমন — ঘনত্বের বোধ রয়েছে আর ওপরের দিকে বৃহতে মিলে যাচ্ছে সেই ভুবনের সমাহার। নিঃসঙ্গ সেই শিববিন্দু, আর তার পরমশক্তির ঐ শৃঙ্গাটক রূপ-কল্পনা। পৃথিবীর কথা পরে আসবে। Chariot আর mountain, এই দুটি বৈদিক রূপকল্প দিয়েছেন — দেবরথ (chariot) মানুষের অভীপ্সা ও যজ্ঞ-ভাবনা। আর 'পর্ববান ইতি পর্বত' — ঢেউ খেলানো mountain।

নিম্নতম বিন্দু থেকে যজ্ঞভাবনা বা অভীপ্সা শুরু. সৃষ্টিতে এখনও প্রলয়ের স্পর্শ নেই — বায়ুর আকাশ, এ কালাতীত ভূমি...মূলাধার থেকে সহস্রার পর্যন্ত ফোয়ারার মত চৈতন্য ফুলে ফুলে উঠছে — সমুদ্র অর্ণব কিনা বিশ্বভুবনের সমাহার (world-pile) — এ অভ্যারোহ, আরোহণের প্রেরণা। ওপর দিকে উঠে যাওয়ায় একদিক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অগ্নিশিখার এই মত ঊর্ধ্বাভিসার — যেন ওপর দিকে উধাও হয়ে যাওয়া...এই আশা আশ্বাস আমাদের মধ্যে রয়েছে, রয়েছে বিশ্বের মর্মমূলে। চৈতন্য ঊর্ধ্বাভিসারী...কূল নেই, শেষ পর্যন্ত বাক্‌ও থেমে যায় নৈঃশব্দ্যে — সেই অসীমে প্রসারিত হয়ে চলে। মানুষের আছে এই এক দেবায়তন সত্তা, অনন্তে উধাও ক্রমসূক্ষ্ম হয়ে যেতে থাকে। বিশ্বের মূলে এই সুর, বাঁশী বাজে, তাকে আশ্রয় স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে উঠে চলে — এই অভ্যারোহ বিজ্ঞানভূমির স্বপ্নস্থান পুরুষের। তাই এ স্বপ্ন তাৎপর্যপূর্ণ...ভাবরূপে স্বপ্ন দেখা দেয়। বস্তুর স্থূলত্ব যখন কমবিহায় শুরু হয়, সেই নিঃসঙ্গ অভ্যারোহ তখন সার্থক হয়ে ওঠে। এবার পৃথিবীর কথা আসে।

আমাদের ঘিরে রয়েছে বিশ্বভুবন। ভুবনেশ্বরীর আকৃতি পরম শিবের পানে, আর তারই বিন্দু বা রশ্মি একটি পড়েছে আমাদের মধ্যে। এই কারণেই পৃথিবীতে যেমন আমরা রয়েছি, তেমনি নিরেট যে জড়, সেও অমৃতের সন্ধান পেতে পারে...ভুবনেশ্বরী আর তার ভুবন এই যুক্ত দেবীসত্তা এক হয়ে যায়। এই বহুভুবনের মাঝে তাই পার্থিব ভুবনের তাৎপর্য আছে। তাঁর সৃষ্টি...ভুবনেশ্বরীর বহু-ভুবন সবই আনন্দের সৃষ্টি — আনন্দ হতেই রূপ জাগছে, "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি"। অর্থ বুঝতে গেলে, স্থূল দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না, ভাবের সঙ্গে যুক্ত করলে তাৎপর্য প্রতিভাত হয়। কবিদৃষ্টি যেমন রূপ সৃষ্টি ক'রে ব্যঞ্জনা আবিষ্কার করে, তা থেকে আনন্দের বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে তোলে, তখন দেখি সীমা বিলে যায় অসীমের সঙ্গে। অস্তিত্বের শেষ যে নিবৃত্তিকলা জড়ের জগতেই সে নেমে দানা বেঁধে ধরা দিয়েছে, যেন থেমে গেছে। এরপরে উঠে যাওয়ার পালা — ঊর্ধ্বায়ন।

ওই শূন্যাটকের চরম রূপ আণব, তার মধ্যেই সব পর্ব সংহত হয়ে আছে। সাধনার পরিপাকে চেতনার বিস্ফোরণ ঘটে যায়, ফলে ঊর্ধ্বায়ন শুরু হয়ে যায়। পিণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডে আত্মায় যুক্ত, এই চেতনার 'আমি'তে জগৎ, তাই যেতে হবে সেই পরমের পানে...এই পৃথিবী হৃদয় থেকে সোপান পরম্পরা — আকাশবৎ আত্মবোধ নিগূঢ়িত তারই মাঝে বিশ্বভুবন সম্পুটিত। তাই বিন্দুরূপে তাকে অনুভবে পেয়ে উচ্ছলিত হবে সিন্ধুতে। শেষে অন্তরে বাহিরে ঊর্ধ্বে অধে সবদিক দিয়ে দিক্‌ শূন্য একাকার...ভুবনেশ্বরীর বিন্দু অনুবিদ্ধ হয়ে গেল।...ঘসাতলে পরমব্যোমে অন্তরে বাহিরে পরিচেতনা পিণ্ডের সেই দীপ-শিখা ও ব্রহ্মাণ্ড জ্যোতির্বলয় এক — সব একাকার হয়ে যাবে। বিস্তার বা বৃহত্তের যে অনুভব তার বীজ এইখানে। প্রাকৃত জগতের মধ্যে এই শক্তি নেমে আসে, তা যেন নাড়া দেয়। যে ঘুমিয়ে আছে, তাকে জাগায়। জড়ে আবদ্ধ সব কিছু অসাড় হয়ে আছে, সেই চিদ্‌বিন্দু এবার সিন্ধুতে উল্লসিত হয়ে উঠবে, এ তারই সূচনা।

তখন ভাবনা শুরু হয়, ভাবনার ফলে অভীপ্সা জাগে আর তাইতে অচিতির মূর্চ্ছা থেকে তপ জাগিয়ে তুলতে পারে। এ যদি না হত, চিদ্‌বিন্দু পৃথিবীকে স্পর্শ করে না থাকত, তাহলে "জগতাদ্ধাং প্রসজ্যতে" — সব কিছু অন্ধকারে ডুবে থাকত, আর সেই অন্ধ

হয়ে থাকাও কেউ জানতে পারত না। শুধুই জড় আছে, তা তো হয় না। তাহলে কে দেখছে কে বুঝছে, জড়কে ছাপিয়ে একটা কেউ আছে। Earth by this golden superfluity — এ এক অদ্ভুত শব্দ। হিরণ্যরেতা হিরণ্যগর্ভ, চিৎকণ — এহল জড়ের মধ্যে নিহিত সেই অগ্নি। এ না হলে তো জাগা যেত না। অতিমানস সত্তা চিৎকণরূপে না থাকলে সপ্তর্ষি দিয়েও সৃষ্টি সম্ভব হত না। সেই চিদ্‌বিন্দু অগ্নি (Psychic entity) আছে বলেই ভুবনেশ্বরীর আবেশ সম্ভব।

This higher scheme of being is our cause। বেদমন্ত্রে যে পেয়েছি "যথাপূর্ব্ব অকল্পয়ত" — এ তাঁর কল্পনা, ভাব দিয়ে গড়া, সম্পদ্যমান। বারবার স্মৃতিতে কল্পবৃত্তি চলেছে...উর্ধ্বায়ন (destiny), উঠে যাবার ব্যবস্থা ঐ কল্পবীজে, বাক্ বা মন্ত্ররূপে কখনও বা আধারে অনুপ্রবিষ্ট হয়। আমাদের মধ্যে রয়েছে যে মৃত্যুর জড়িমা, তা থেকে অমৃতসত্তাকে জাগিয়ে তোলে তাঁর সেই কল্পনা — আবেশ। এই পৃথিবীতে সোপান বেয়ে উঠে চলেছেন হৃদয়ের ভিতর দিয়ে দেহে — এখানে সেই সঙ্কেত।

তারপর ব্যাপার ঘটে...সেই যে নিহিত চিদ্‌বীজ ভুবনেশ্বরীর, তাকে ধরে আছেন সেই পুরুষ, তাঁর সান্দ্র নিবিড় দৃষ্টি দিয়ে ক্রিয়াশক্তির দিকে। মূলে কে? এই সোপান-পরম্পরা বেয়ে নেমে এসেছেন কে? তিনি সেই মা। আমরা শুনেছি পুরুষের যজ্ঞ-কথা, তাঁর আত্মারতি হতে জগৎ বেরিয়ে এসেছে। Our life is a holocaust of the Supreme। তাঁর দৃষ্টি ছিল শাশ্বত অবিনশ্বর চিরন্তন নিত্যজাগ্রত অনিমেষ। সেই দৃষ্টির নিম্নে ওই সোপানবাহী প্লাবিত আর সেই আলোতে ভুবনেশ্বরী নেমে আসছেন, সেই আলো বেয়ে আসছেন The great World-Mother, তাঁর আত্মোৎসর্গ দিয়েই চেতনার স্তরে স্তরে সত্তাগুলি তাঁর মধ্যে বিগ্রহ পেয়েছে, ঘনীভূত হয়েছে। মায়ের ভাব আমাদের চিদ্‌ঘন বিগ্রহ, আর এখানে রূপ ভাব চৈতন্য সব একাকার। মা নেমে এলেন, স্বীকার করলেন অজ্ঞানকে দুঃখকে।

Mother এই দুটিকেই গ্রহণ করেছেন, দুঃখ দিয়ে চৈতন্যকে নিয়ে বিশ্ব গড়ে তুলেছেন। তাঁর মর্ত্যদেহ দেববিগ্রহ, পরমাত্মা তাঁর মধ্যে অমৃতের সঙ্গে মর্ত্যের সংযোগ ঘটেছে। মৃত্যু ও অমৃত তাঁর ছায়া...আমাদের বিশ্ব এই পৃথিবী আমাদের সাধনভূমি, আমাদের জন্য এই মর্ত্যবাসীদের জন্য ভুবনেশ্বরী নেমে এসেছেন, অবিদ্যা দুঃখ সব স্বীকার করে নিয়েছেন যাতে তাঁর নিত্যধামে আমরা পৌঁছাবো। তাঁর সেই স্মৃতি আমাদের মধ্যে নিহিত। এ যেন সেই অবোধপূর্বক জন্মান্তরের ভালবাসা...তাই এক ব্যাকুল কান্না নিয়ে আমরা জেগে উঠি। তখনই সেই জ্যোতিষ্মান অতীত আমাদের মধ্যে জেগে ওঠে, আমাদের আস্পৃহা জাগে। কেননা এর মূলে রয়েছে ভুবনেশ্বরী জগজ্জননীর নেমে আসা। তাঁরই আবেশে আমাদের ব্যাকুলতা, সঙ্গে রয়েছে পরম পুরুষের অনিমেষ দৃষ্টিপাত। এই দুই চিদ্‌বিন্দু এক হয়ে আছে বলেই সেই ডাক আসে — "হেথা নয় অন্য কোথা, অন্য কোনখানে"। তখনই বুঝি পথ আছে, পথ বেয়ে চলেছি, চলব। এ যে তাঁরই চলা, তাঁরই নির্দেশ।

সৃষ্টির প্রথম থেকেই সিদ্ধ হয়ে আছে এই ব্যাপার — মা নেমে এসেছেন। পথ তো সোজা নয়, কণ্ডুরেখ কুটিল গতি। আবর্তন থেকে এ পথ প্রতি পদেই কণ্ডুরেখ (spiral)

— আনন্দ মৃত্যুর বেদনা, জন্মমৃত্যুর আবর্তগতি, প্রতিপদেই যেন ফিরে আসার বেগ (অশ্বর)। আত্মসচেতন হয়ে পথ ধরে চলতে পারলে জন্মজন্মান্তরের অমৃত পথের যাত্রী মানুষের সহায় থাকে মাতৃশক্তি, আর সেটা তার স্বাধিকার। বিদ্যুৎঝলকের মত সেই পুরুষের প্রেষণাও দেখা দেয়; পশ্চাতে থেকে অরোরার আলোর বন্যা এসে পড়তে থাকে এবং এই-ভাবে সেই ঝলকই পলিমাটি পড়ার মত স্থির সৌদামিনী হয়ে দেখা দেয়। অপরা প্রকৃতি (blind laborious spirit) অন্ধ, কিন্তু আবর্তনের মধ্য দিয়ে তার শক্তি কাজ করে চলে। শাশ্বত অন্তর্যামীর দৃষ্টি মায়ের প্রসাদ তাই পলকের জন্য হলেও আত্মার বৈপুল্য জেগে ওঠে। মায়ের এই প্রেষণাই ধরে আছে পরমপুরুষের অনিমেষ দৃষ্টি। সেই নিত্য-জাগ্রত আততদৃষ্টির নিয়ে পরমাপ্রকৃতি মা-ই স্বেচ্ছায় এই আঁধারকে বরণ করে নিলেন। The Calm Luminous Intimacy within — সেই তাঁর দৃষ্টিতেই সব কিছু ভাসছে। তিনি "ঈশানভূতভব্যস্য", তিনি calm, এই পুরুষের প্রতিষ্ঠা থেকেই প্রকৃতির বীর্য উল্লসিত হয়, তিনিই অনুমন্তা।

প্রকৃতির লীলায় বাধার মধ্যে যখন সেই দৃষ্টি বুঝতে পারা যায়, সুখ দুঃখ সমান হয়ে যায়। মহাপ্রকৃতি চলছেন, আর তাকে চালিয়ে নিয়ে চলেছেন পুরুষের vast design — নিয়তি, যা আমরা জানিনা, তিনি জানেন। মাতৃশক্তি যেন আধখানা হয়ে (অর্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা) : একদিকে আমরা এই জগৎ, আর ওদিকে পরম পুরুষ নিত্য জাগ্রত দেখেন।

এইভাবে অশ্বপতি জগতের চারিদিকে উন্মেষ দেখছেন — প্রথমে সংশয় আসে: হবে কি আমাদের ভাগ্যে? সেই পরম চিত্রকর চিত্রাঙ্কনের তুলি বুলিয়ে চলেছেন beauty-line-এর curve যেমন, বক্র না হলে রূপ খোলে না, তাই জীবনের এত বাঁকাচোরা, তার ঠিক যেন মিল পাওয়া যায়না। মায়ের শক্তি আবার আশা জাগায়, শ্রদ্ধার উন্মেষ হয়। সেই Image কখন ফুটে উঠবে জানিনা, তার আভাস ওই rarefied atmosphere-এ স্বপ্নরেখার মত কাঁপছে। তারপর যখন সবর আসে, সব এক হয়ে যাবে এরকম বোঝা যায়, বস্তুর সমাহারে সমন্বয়ে সৌষম্য দেখা দেয়, অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। আলোছায়া সব নিয়ে পরিপূর্ণ চিত্র ফোটে। অনেক অস্পষ্ট রেখায় অসীমের ব্যঞ্জনা। বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যাবে না, তবু সেইভাবে বুঝতে চাই দেখে মহাশিল্পী যেন হাসেন। Divine Intention সহসা চোখের ওপর ভেসে ওঠে, আর সেই অরোরার আলো বোধকে জাগ্রত করে, দেখতে ও বুঝতে পারা যায়। হৃদয়ে আভাসটুকু জেগে থাকে — Intuition's sure technique। "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি ছিদ্যতে সর্বসংশয়াঃ"।

জীবনের বহু রেখাচিত্র তখন দেখা যায় — A cube and union crystal of the gods। শুভ্র বরফ জমাট বাঁধা, তারপরে অরূপের আলো প'ড়ে জীবনে বিচ্ছুরিত হয়ে নীলে মিলিয়ে যায়। ঐ শূন্যাটক cube and union crystal — এই হল সমস্ত বিশ্ব অনন্তকাল ধরে যা হচ্ছে, তার একটা ছবি পর্দার ওপরে পড়ছে — নিশ্চেতনার মধ্যে যে চেতনা, তাও সেই অতিমানসেরই চেতনা। A Mind shall think behind nature's mindless mask, এ যেন আপাতবিরোধ বর্ণনা। চিদাকাশ — A conscious Vast fill the old dumb brute Space — ভূতাকাশ যা জড়কে ধরে আছে, তা চিন্ময় ঝলমল করে উঠছে, মানুষের soul

জাগেনি তখনও. faint and fluid sketch of soul called man...তার মধ্যে শক্তি কাজ করছে. সেই শক্তিই মহাকালী. তাঁর নৃত্যের উন্মাদনা জীবনকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। অনন্ত আমাদের মধ্যে সংহত হবে বিশ্বঘন চেতনায় — a little point reveal the infinitude, এই নিয়তি। মানুষের গৌরবও তাই. সে জগদতীত সত্তা. "অয়মাত্মা ব্রহ্ম", — এই জগৎ বৃহৎ।

এরপর সৃষ্টির ক্রম বর্ণনা করেছেন, জগতের এই সৃষ্টিধারা — এ এক কল্পায়ন. তিনে তিনে এক রহস্য (Mystery) গড়ে তোলা হচ্ছে। কিন্তু একদিকে জড় ও অপরদিকে চৈতন্য — এ কেমন যেন স্বতোবিরোধ মনে হয়। এই এক রহস্য, যে এই দেহজড় তাতে প্রাণ মন চেতনা কি করে নিলে মিশে আছে. দিশে পাওয়া যায় না। এই যে কুক্ষের ও সুক্ষের জড় ও চৈতন্য দুটো যেন একেবারে বিরুদ্ধ. এক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে. এই মায়া যেন ব্রহ্মেরই নিষেধরূপা। তাঁর আত্মনিগূহন জড়ের মধ্যে তাঁর মূর্চ্ছা, কিন্তু তার মধ্যে তিনি নিত্য-চেতন। এই জড় চিন্ময় হবে. এই তার অর্থ আর এটাই পরম প্রজ্ঞা। সমস্তটাই যেন এক শূন্যতা, "প্রসুপ্তমিব" inconscient, void, cipher ইত্যাদি। বাইরে বোঝা যায় না. কিন্তু অর্থ আছে, secret whole। জড়ের ক্রিয়া হচ্ছে ঐ শূন্যে। কুক্ষেতে মহাশূন্যের পরম প্রজ্ঞা নিহিত। সেজন্য জড়ের ক্রিয়ায় নিয়ম দেখা দেয়, প্রেরণা আসে। প্রাণ মন তাতে অনুবিদ্ধ আছে বলেই তাঁর প্রচোদনায় তার উন্মেষ ঘটে। An eternal negative, a matrix nought। আত্মার আনন্ত্য নিত্যত্ব ও পরমাণুর নিত্যতা এই দুইই কেবল ও শাশ্বত আর এইই রহস্য।

Matrix nought, কিন্তু সেটা প্রজ্ঞানঘন শূন্যতা, তার মধ্যে Golden Child। সেই বাঞ্ছনী শূন্যতায় শিশু পরিপূর্ণতা, হিরণ্যগর্ভ...হয়েই চলেছে। এই আবির্ভাব কিন্তু অবাধিত ও নিত্য। জড় ও চৈতন্য সৌষম্যে বাঁধা, সৃষ্টিতেও এজন্য উল্লাস। পরমা প্রকৃতি এই নিত্যগোপালকে কোলে করে আছেন। এই নিত্যশিশু পরমপুরুষের পরমতাকে (vasts of God) সহজ করে নিয়ে এসেছেন। ভাগবতের কৃষ্ণের নিত্যকৈশোর. তাতে পরব্রহ্মের ভাব। একদিকে জড় অচিতি, তার মধ্যে পরম প্রজ্ঞা। যেমন পুরাণে দেখি শিশু নারায়ণ বটপত্রে (ব্রহ্মযোনি) ভেসে চলেছে।

তারপর এক reversal movement নেমে আসায় সব যেন উল্টে যাচ্ছে। জড়ের মধ্যে চৈতন্য জাগছে, অদ্ভুত বর্ণনা — A Gas belched out from invisible fire। সর্বব্যাপ্ত ভূতসূক্ষ্ম জড়, তার পিছনে অগ্নি, তপস্যায় সেই অগ্নি থেকে এই সৃষ্টিতত্ত্ব, যেন তাঁর উদ্গার। Gas-এর density, তা থেকে million stars বিজ্ঞানের বর্ণনা। তারপর সৌরজগৎ হতে পৃথিবী। পলি পড়ে পড়ে স্তর দেখা দিল, তারপর প্রাণ জাগলে God's tread was heard — Across the thin smoke — A Mind groped for knowledge ও nescient night— রাত্রি।

অবতরণের ধারা God থেকে Mind Force Matter। আমরা কিন্তু বুঝি বিপরীত ধারায়। বিশ্বপ্রাণ (Universal Force) জড়ে বন্দী হয়ে আছে এবং

অভ্যুদয়ের ধারাটার বিবর্তন খুব স্বচ্ছন্দ সহজ নয়। জড় একেবারে নীচের স্তরে — That Matter might grow conscious of its soul। জড় চিদাবিষ্ট, সেই প্রাণের ধাত্রী। মহাপ্রকৃতির ক্রিয়া কখনও ঘুমে, কখনও স্বপ্নে, কখনও জাগরণে, তার পিছনে পরমপুরুষের সদাজাগ্রত দৃষ্টি — সেই শাশ্বত অনিমেষ। ঋষাতন্ত্র পর্যন্ত সেই আলো, অন্ধকারের আবরণীর মধ্যে পড়ছে হিরণ্যগর্ভের স্বপ্ন। সুষুপ্তিতে সে ঘুমাচ্ছে কিন্তু সে অন্তঃপ্রজ্ঞ, তাই তার দৃষ্টিতে স্বপ্নের আলো ফুটছে। এই দৃষ্টি পড়ে এষণা জেগে উঠল — "পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ"। মূলাধারে অন্তর্তমে সেই দৃষ্টিতে শক্তিপাত ঘটল অচিত্তির গহ্বরে, চিদাভাস জেগে উঠল — A spirit dreamed in the crude cosmic whirl। বিষ্ণুর অনন্তশয়নের মত এই ব্যাপার। যা ছিল জড়, তারই স্তনদুগ্ধ দিয়ে divine idea পুষ্ট হল। সেই পৃথিবী দেবী, তার মাঝে তিনি আবিষ্ট হলেন। বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর উল্লাস। এই জড়দেহে অনন্তের অমৃতের স্বপ্ন জেগে উঠল। পরমা প্রজ্ঞারূপিণী সেই মায়া আমাদের মধ্যে জীবনকে সার্থক করে তুলছেন, আমাদের মধ্যে রূপ দিয়ে গড়ে তুলছেন।

অনির্বচনীয় এক সত্তা মূলে, তাকে বলতে পারি অস্তিত্বের সুমেরু আর অপর প্রান্তে যা রয়েছে মনে হয় উল্টো কিছু, প্রতিষেধ, তাও অনির্বচনীয় এই জড়। বাইরে থেকে দেখলে বিরোধ প্রকট। কিন্তু নিজের মধ্যে দেখলে সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়। দেহ ও চৈতন্য একসঙ্গে রয়েছে, দেহ জড় হলে চৈতন্যও আত্মার সঙ্গে এমনভাবে ওতপ্রোত যে পৃথক করা যায় না। দেহবোধ থেকে যদি বিশুদ্ধ চিন্ময় বোধে উত্তিরে যাই, দেখতে পাব এই ভুবনপরম্পরা, জড় ও চৈতন্যের মাঝে থরে থরে সাজানো।

আলোর পিণ্ড হিরণ্যগর্ভ, চিন্ময় প্রাণ জড়কে নিয়ন্ত্রিত করল। মূল ঐ অনির্বচনীয় সত্তা তখন গুহাহিত। ব্রহ্ম বা আত্মচৈতন্য নিত্য, আবার অন্যদিকে দেখলাম যে জড়পরমাণু, এই অণুতে চৈতন্যতে আবিষ্ট হলে জীবনের পরিক্রমা শুরু হয়। চৈতন্যের গুহাহিত হওয়া আবার গুহাগ্রন্থি বিদীর্ণ করে উত্তিরে যাওয়া — এই জীবন। ধীরে ধীরে কলায় কলায় চৈতন্যের উন্মেষ হয়। যে চৈতন্য জড়ে আবিষ্ট হয়েছিল, তাতে জড় চিন্ময় হয়। ওই ধারাকে বলা যায় ভুবনসোপান (world-stairs)। চৈতন্যের ঘনীভাব ও জড়ের চিন্ময়ত্ব এই দুয়ের সমাধানে অশ্বপতির পূর্ণযোগ।

অশ্বপতির সিদ্ধচৈতন্য অনন্তে পরিব্যাপ্ত। দেহবোধে ও চৈতন্যে সাধারণ ভেদভাব না থাকলে জড়ে ও চিতে কোনও ভেদ থাকে না। অশ্বপতির চৈতন্যের সর্বব্যাপিত্ব উজান-ধারায় যেতে আলোর মত ছড়ানো যেন এক দেহলীদীপ, তা আগেই পেয়েছি। অব্যক্ত থেকে এক রশ্মিরেখাপাত হচ্ছে, তা ধরে উত্তিরে যাওয়া। সিদ্ধ চৈতন্যের আবেশ বা শক্তি না নিয়ে সেখানে ঝাঁপ দিলে, তাল সামলানো যায় না। সেই অণুচৈতন্য আণবিক পথে তার ব্যাপ্তি চৈতন্যকে চালাচ্ছে। এ একদিকে উর্ধ্বায়ন, দেহপ্রাণমনের গ্রন্থিভেদ করে বিজ্ঞান ও আনন্দে চেতনার আরোহণ।

A Seer within — প্রাচীন শাস্ত্রে আত্মা ও তনুতে কোনও ভেদ ছিল না। অন্তর্যামী চৈতন্য (seer within) যেমন "শিরসি সহস্রারে", তিনিই আবার মূলাধারে ঝাঁপ দিলেন অপান শক্তিতে। বিশ্বপ্রাণ জ্বলছে, তা থেকে অপানশক্তি দিয়ে আকর্ষণ

করে, পার্থিব সত্তা কুণ্ডলী করছে, আধার কুণ্ডলীর মোচন হচ্ছে...দুইই চৈতন্যের খেলা। জন্মজন্মান্তর ধরে হলেও তিনি স্বেচ্ছায় এটা করছেন। সাড়ে তিন পাক কুলকুণ্ডলিনীর, তিন পাক বন্ধন অর্ধপাক মুক্ত। এই মুক্তবীজই আগে অভীপ্সা হয়ে, তখনই ব্যাকুলতা আসে। স্বেচ্ছায় তিনি নামেন, বাঁধন পরেন আত্মনিগ্রহ, পরে উজিয়ে যান অনুগ্রহ শক্তিতে। সবই তিনি জানেন, তিনি চৈত্যগুরু জগদ্‌গুরু। একদিকে abysmal depth অব্যক্ত, অপরটি জ্যোতির্ময় অব্যক্ত। এই ঊর্ধ্ব ও অধের মাঝে জীবনের কুণ্ডলী। যখন ডাক আসে, নীচের কুণ্ডলীতে সাড়া জাগে। রাজা অনুপতি সবার হয়ে সে ডাক শুনলেন, নিজের মধ্যে ডুব দিয়ে ধ্যানে গুটিয়ে গেলেন। তিনি সম্পূর্ণ সচেতন। তাঁর কাছ থেকে ডাক এসেছে, তিনি শুনেছেন, তাঁর নিজের কোনও ইষ্টসিদ্ধির জন্য নয়, বিশুদ্ধ জিজ্ঞাসা নিয়েই তিনি অতলে ঝাঁপ দিলেন।

সহস্রার থেকে মূলাধারে এই শক্তিপাত — বিদ্যুতের মত সেই অতলের গভীরে ডুবে যাওয়া। তিনি একা...সেখানে জগৎ মুছে যায়, কিন্তু যা আশ্রয় করে এই জগৎ প্রকাশ হয়, সেই নৈঃশব্দের পরিবেশ ঘিরে ধরে। এই যে যাত্রা শুরু — রসাতল মূলাধার থেকে লোকোত্তর পর্যন্ত, এই সেই world's desire। রাজার এই যোগ সবার জন্য, তাই যে ভূমি তিনি স্পর্শ করছেন, তা জ্যোতির্ময় হয়ে যায়। যোগের ভাষায় এ নিরোধ-সমাধি — অসম্প্রজ্ঞাত, কোনও বিষয় নেই। A formless stillness — এখনও পর্যন্ত সেই পরম নৈঃশব্দ্য, কোন রূপ দেখা দেয়নি। ভেতর থেকে ডাক উঠছে, সেই আহ্বান চারিদিকে আলো ফুটিয়েছে। যেন আলোর কমলের এক জ্যোতির্ময় পরিবণ্ডল গড়ে উঠল, তার মধ্য হতে সৌম্যুন রশ্মি টেনে তুলছে — white immobile Ray। ঊর্ধ্বে নিস্পন্দ কিন্তু তার মধ্যে এক আকর্ষণ আছে। চেতনা অগ্ন্যা শীর্ণা, শরবৎ তন্ময়তায় একাগ্র। সে বড় ভীষণ ঠাঁই, গুরুশিষ্যে দেখা নাই। পৃথিবী থেকে অনন্তে উধাও হওয়া, কোনও ছক বাঁধা নেই। অনেক পরে যা হবে, সামনে এসে গেল, যা পেলাম হারিয়ে গেল। অক্রমেও সাধনা হয়। ভয় হয়, কিন্তু ভয় পেলে চলবে না। ক্রমকে শাসন করে ক্রমকে দেখতে হবে। যার ওপর এই শক্তিপাত হয়, এক নিমেষে তার অন্ধকার কেটে যায়। আলো আঁধার মেশানো এই ক্রম ও অক্রম আবার। অন্ধকার বশে আনতে হবে...পূর্ণিমা অমাবস্যা এক সঙ্গে বুঝতে হবে, ভয় পেলে চলবে না। একটির পর একটি ভুবন খুলে যাবে, কমল রূপে তা দেখানো হয়েছে। অধোমুখী কমলের দল শিবচৈতন্যের স্পর্শে দল মেলে মেলে খুলে যাচ্ছে। এ সেই পরশমণির ছোঁয়া...সাধনার শেষ আনন্দে, সেখানে আলো আঁধার দুইই মিশে এক হয়ে গেছে। — "ন তত্র সূর্যো ভাতি..." সেই অবস্থা। আলো নেই, অথচ সেই অনালোকের আলোয় সব প্রকাশ। Heaven after heaven ও মধুমতী ভূমি সব, ভোগে বা শক্তিতে সেখানে আটকে পড়ার বিপদ আছে। কিন্তু আমি যাঁর প্রতিভূ তিনি — সেই white Immobile Ray আমাকে থামতে দেবেন না। A figure sole on nature's giant stair। এ সেই স্বর্গারোহণ, সশরীরেই উঠে যাচ্ছেন রাজা, তুষার শৃঙ্গ একটার পর একটা ভেঙে চলেছেন। পৃথিতত্ত্ব থেকে অনন্তের অভিযাত্রী তিনি পৌঁছালেন এক পরম নেতির চূড়ায় in an indiscernible end আর সেটাই summit — শিখরদেশ।

শ্রীঅরবিন্দ জয়ন্তী

[শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরে পঠিত সভাপতির ভাষণ — ১৫ই আগষ্ট, ১৯৮২]

হিমাংশু নিয়োগী

আজ এক সূর্যোদয় হল। বৃষ্টিধোয়া আকাশে সোনার আলো ঝলমল করে উঠল। আলোকের দিব্যশঙ্খ ধ্বনিকণ্ঠে অধ্যাত হল, জ্যোতিমাং জ্যোতিরাগাৎ —।

আজকের এই দিনটা প্রত্যহের থেকে স্বতন্ত্র — এ এক বিপুল গভীর ব্যাপ্ত জাগরণ।

যদিও রোজই সূর্য ওঠে, কালচক্র ঘোরে — ঋরূপস্য ব্রতানি — তবু মনে হয় আমরা যেন প্রত্যহ জেগে উঠি এক গ্লানি নিয়ে ক্লান্তি নিয়ে হতাশা নিয়ে। এক মোহরাক্ষসের হাতের ছায়া আমাদের দিনকে আড়াল করে রাখে — বৃত্র এবং পণির দল আমাদের আকাশ থেকে আলো চুরি করে নিয়ে যায়। আমরা যেন চির অস্নাত। কেননা, কেবল জলে ডুব দিলেই তো আর স্নান হয় না, যেমন মহাভারত বলেছে, মনের মালিন্য ধুয়ে গেলে তবেই হয় স্নান — পুণ্যস্নান।

সকল জ্যোতির যে শ্রেষ্ঠ জ্যোতি, সেই শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন আজ। শ্রীঅরবিন্দের সোনার আলো এসে আমাদের মোহরাক্ষসের কালো হাতের ছায়াকে সরিয়ে দেয়, প্রতিদণ্ডের ক্ষয় থেকে উদ্ধার করে অনন্তের মধ্যে প্রসারিত করে ধরে। আমরা স্নান করি। তাই এদিন আমাদেরও জন্মদিন। আমাদের অন্তরতম শুদ্ধ আত্মার উদ্বোধনের দিন। আমরা যে যেমনই হই না কেন, সকল দ্বন্দ্ব সকল বিরোধের উর্ধ্বে চলে যাই তখন, — যা বলেছেন, "When one lives in the truth, one is above all contradictions"। কেননা সত্যের গ্রহের বৃহতের কোন ছায়া নেই। আমরা যখন পরস্পরের মুখে অন্ধকার দেখি — তখন ভুলে যাই আমরা নিজেরাই রয়েছি এক অন্ধকারে। অস্তিত্বের এক বিচ্ছিন্নতা-বোধ থেকে আসে দৃষ্টিতে এই আঁধার। যা বলেছেন, তা নয়, ওভাবে নয়, সমস্ত জীবনকে জগৎকে এক সাথে গ্রহণ কর ভক্তের মত প্রেমিকের মত। — তাকিয়ে দেখ, পণ্ডিতের বিচারবাগীশের মত নয়, সরল দৃষ্টি নিয়ে শিশুর মত। পৃথিবী তখন মায়ের গায়ের গন্ধ নিয়ে আমাদের জড়িয়ে ধরে "যস্ তে গন্ধঃ পৃথিবী সংবভূব", "অবর্ত্যা পৃথিবী গন্ধন্ অগ্রে" —

কিন্তু, যদি আমরা বিচার বাছাই করতে যাই, বেছে বেছে ষোল আনা ভাল মানুষ নিয়ে যদি আদর্শ সমাজ গড়তে চাই, তাহলে আর এখানে নয়, আমাদের যেতে হবে স্বর্গে। কিন্তু জগৎ জগৎই : এ স্বর্গও নয়, আবার নরকও নয়। এ হল যজ্ঞবেদী। এখানে যেমন ধূম আছে, ভস্ম আছে, কালিমা আছে, তেমনি আবার আছে অগ্নি, জ্যোতি, তেজ, ঊর্ধ্বশী শিখা। পৃথিবীর গঠনই এই রকম। যদি দোষ দেখ, কলুষ দেখ, তাহলে দেখবে, দোষের তলে আরো কত দোষ — অন্ধকারের তলে আরো কত নিরেট অন্ধকার, স্তরের পর স্তর — কিন্তু তবু যদি সাহস থাকে, বিশ্বাস থাকে, তাহলে দেখবে সেখানেই কিংবা তারই তলায় রয়েছে আরো কত গুণ, কত শক্তি, সৌন্দর্যের পরে সৌন্দর্য ব্রাহ্মীশ্রী — এমনকি যাকে দোষ ভাবছিলে তাই যেন কখন পরম গুণে রূপান্তরিত হয়েছে। ভগবান এক আশ্চর্য

alchemist। যেখানে সব হয়ে গেল। পাথর হয় সোনা। বিষ হয় অমৃত। ভক্তির বুকে যেমন মুক্তা, কয়লার খনির অন্ধকারে যেমন হীরে। নিজের মনই তখন বলবে, রাত আছে বলে দিন কি নেই? শত্রুর কুটিল দৃষ্টি আছে বলে বন্ধুর উদার হাসি কি নেই? ঘৃণা আছে, প্রেম কি নেই? আগুনে দুঃখ মানুষকে দগ্ধ করে না, পাপ তাকে পোড়ায় না। দুঃখ নিজেই দগ্ধ হয়, পাপ নিজেই পুড়ে যায় — সর্বং পাপ্মানাং তপতি। শ্রীঅরবিন্দ এবং মা আমাদের মধ্যে এসে আমাদের হাত ধরে এই কথাই বলেন। জীবনের উপরে মানুষের উপরে তাই বিশ্বাস হারাতে নেই। এমনিতে দেখলে মানুষ এক একটা টেরা বেঁকা চুটা ফাটা জীব। এই সব চুটা ফাটা মানুষদের ভাঙা-কপাল জোড়া দেবার জন্যই মা শ্রীঅরবিন্দ নেমে এসেছেন মানুষেরই ভাঙা ঘরে।

সকল ভাঙাচোরার মধ্যে একটা পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের ও পূর্ণতার সাধনা নিয়ে এসেছেন তাঁরা। মা বলেছেন, যোগের একমাত্র উদ্দেশ্যই হল সকল বিষম উপাদানকে একত্র করে এক অখণ্ড পূর্ণতার প্রতিষ্ঠা করা to gather all the divergent parts together and forge them into an undivided unity। মা বলেন, জগৎ একটা বিপুল সঙ্গীতের অর্কেষ্ট্রা — সেখানে প্রত্যেকেই এক একটি যন্ত্র — কেউ তুচ্ছ নয়, বাহুল্য নয়, সকলেরই রয়েছে এক নির্দিষ্ট স্থান ও মূল্য। কোন একক ব্যক্তিগত সিদ্ধি নয়, একটি সমষ্টিগত পূর্ণতা। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, "কয়েকজন যোগী সিদ্ধপুরুষ তৈরী করা আমার যোগের উদ্দেশ্য নয়।" ব্যক্তির সিদ্ধি, পূর্ণতা সার্থকতা প্রয়োজন এবং অপরিহার্যই। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, একটা সংবুদ্ধ চেতনার সিদ্ধি তার ধর্মকর্ম রূপ নিয়ে ছড়িয়ে পড়বে সমষ্টির মধ্যে এক প্রেরণাশক্তি হয়ে, আর তাকেই আশ্রয় করে গড়ে উঠবে এক দিব্য মানবসমাজ। ব্যষ্টি ও সমষ্টির মাঝে যোগসূত্রের মত তাই এসে পড়ে একটা উদ্বুদ্ধ গোষ্টির ভূমিকা। অধ্যাত্ম অভিযানের এই হল ত্রিমুখীব্যূহ। অধ্যাত্ম সিদ্ধি যখন মানবজীবনকে স্পর্শ করতে চেয়েছে সেই প্রাচীনকাল থেকেই, তখনই তার মন্ত্রে ডাক এসেছে, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি। অর্থাৎ চাই ব্যক্তিগতভাবে সংবুদ্ধ এক সিদ্ধি, তারই ক্রিয়ার গঠনের প্রকাশের ধর্ম, আর সেই তেজে দৃঢ়বদ্ধ সংহত এক সঙ্ঘ।

সেই বৈদিক ঋষিদের প্রার্থনা, সমানী ব আকূতিঃ

এক সূত্রে গাঁথা এই যে প্রাণের মেলা, আমরা তাকে বলি — 'কেন্দ্র' — 'Centre' — যেখানে আমরা সকলে মিলে এক। মা উপমা দিয়ে বলেছেন, যেন একটি সোনার হার, তার ভিতরের এক একটা রিং হলাম আমরা এক একজন। অথবা বলেছেন, যেন জীব-দেহের এক একটি কোষ আমরা। একটি রিং যদি আলগা হয়ে যায়, তাহলে হারটাই ছিন্ন হয়ে পড়ে। একটি কোষ যদি অতি স্ফীত হতে চায় — তাহলে দেহে ক্যান্সার নিয়ে আসে।

এখানেই মা শ্রীঅরবিন্দের সমষ্টিগত সাধনার বিশেষ ভূমিকা এবং বৈশিষ্ট্য। এতকাল সাধক মানুষকে এমনকি নিজেকেও দেখেছে একটা "হাড় মাংসের খাঁচা" হিসাবে, দেহপাতেই তখন কৈবল্য সিদ্ধি। মা শ্রীঅরবিন্দ বললেন, না, তা নয়, এই দেহ এই জীবন কেবল কাদামাটির তৈরী নয়, মৃন্ময় নয়, সে চিন্ময় সে জ্যোতির্ময়। Crucified Body নয়, Glorified Body। তার মানে এ নয় যে, তুমি চলে যাবে অক্লেশে অক্ষত হয়ে

কুসুমাস্তীর্ণ পথে। যতদিন মিথ্যা আছে, মৃত্যু আছে, ততদিন cross বহন করতেই হবে। পথ হবে ক্ষুরধার। চলতে হবে কণ্টক কান্তার পার হয়ে।

আমরা তো দেখি, যে যার মত একা একা সবাই ভাল। একলা ঘরে কোন ঠেলাঠেলি নেই। কিন্তু যখন আমরা সকলে মিলে একত্রে এক জায়গায় একটা কেন্দ্রে এসে মিলিত হই, তখন পরস্পরের মধ্যে ধাক্কা লাগে, একের কোণাকোণের angularities সঙ্গে অপরের একটা অসহ্য ঘর্ষণ লাগে। অনেক সময় বিলক্ষণ তিক্ততা ও জ্বালা সৃষ্টি হয়। তখন নিরাশ না হয়ে বুঝতে হবে, সমষ্টি সাধনার তাত লেগেছে গায়ে। পাথরের নুড়ি স্রোতের জলে পড়েছে। আর তার যত কোণাকোণ ধার, সেগুলি ধাক্কা খেয়ে মসৃণ হচ্ছে।

আমার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল। একবার একজন সাধিকা মায়ের আশ্রয় প্রার্থনা করে আশ্রমে এসে থেকে গেল। উৎসাহে আনন্দে সে উল্লসিত। মা তাকে দেখা হলে প্রশ্ন করেন, "কেমন লাগছে?"

সে বলে, "খুব ভাল, খুব ভাল আছি মা।"

বৎসর না যেতেই সাধিকার মুখ কেমন ম্লান হয়ে এল। চলতে গিয়ে সে আর যেন মাথা তুলতে পারে না। দুনিয়ার যত অবসাদ আর বিষাদ যেন তাকে চেপে ধরেছে।

একদিন মা তাকে প্রশ্ন করলেন, "কেমন আছ?"

সে বলল, "মা, এ আমার কি হল? এখানে আসার আগে আমি তো বেশ ছিলাম। জীবন আর জগৎটা ছিল কত সুন্দর আর আনন্দের। কিন্তু আজ চারিপাশটা এমন কালো হয়ে উঠল কেন? পৃথিবীটা যে এত বিশ্রী তা তো ভাবতেও পারিনি।"

মা হেসে বললেন, "সাহস করে আরো কিছুদিন থাক, তাহলে দেখবে জীবনটা আরো কত সুন্দর, আগে যেমন দেখতে তার চেয়েও গভীর বিপুল এক সুন্দর।"

সমষ্টি জীবনের এই তিক্ততা আর জ্বালা, এহল শুদ্ধির অগ্নি। সোনা যখন পুড়ে খাঁটি হয় তখন এক সময়ে সে কালো হয়ে ওঠে। এ তাই। সমষ্টির পেষণে ব্যষ্টির জীবনের অমৃত নিষ্কাশন। বৈদিক ঋষি বলছেন, যেন সোমলতাকে শিলাতলে ফেলে পিষে থেঁতলে তার থেকে সোমরস, নন্দনের মধু বার করা হচ্ছে — গ্রাবের সোতা মধুষুদাবীনে — শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, "Voice of the stone of the pressing when it presses out the honey-wine" মায়ের চরণে প্রার্থনা। কবি আমাদের সমবেত জীবনে মায়ের করুণা ও অভয় তাঁর আশীর্বাদ যেন আমাদের অগ্নিশুদ্ধ করে তোলে।

আমাদের হৃদয় এক হোক। আমাদের সঙ্কল্প এক হোক। এক হোক আমাদের জীবন মায়ের চরণে।

গদ্য-কাব্য পরিক্রমা

সমীরকান্ত গুপ্ত

ফরাসী ক্লাসিকাল নাট্যকার মোলিয়ের তাঁর এক চরিত্রের মুখ দিয়ে কৌতুকচ্ছলে বলিয়েছিলেন — যা পদ্য তা গদ্য নয়, যা গদ্য তা পদ্য নয় এবং যা গদ্য নয় তা পদ্য, আর যা পদ্য নয় তা গদ্য। একটা আবিষ্কারই বটে — বেচারী দাসী কর্তার বাচন শুনে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। আজকাল পাঠকরা এমন আপ্তবাক্য হজম করবেন না — গদ্য-পদ্যের সুস্পষ্ট সীমারেখা অনেকটাই আবছা অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। অনেক নিরেস গদ্য পদ্যের আলোয়ান গায়ে দিয়ে পাদপ্রদীপের সামনে উঠে এসেছে। তার দৃষ্টান্ত ভুরি ভরি দেওয়া চলতে পারে —

যে সব কবিরা আজ বেঁচে নেই আর
তোমার কি মনে আছে তাদের?
যেমন,
কামিনী রায়ের নাম মনে আছে?
এই দিকে
ওই দিকে
গদ্য লেখক বা গদ্যের লেখক আছে কত।

কিম্বা,

সুখ ব্যাটাকে ধরে মারো
যা ভাগ দূর হ যত অশান্তি আর ঝঞ্ঝাট
সেদিন একটা নতুন ছাতা হারিয়েছে
আজ আবার চাইছে ছাতা ক্যাচাং
ওর হাজার বায়নাক্কা হাজার ছিনালি
এটা দিই তো ওটা চায় ওটা দিই তো আর একটা
যা ভাগ্ কিচ্ছু পাবি না।

আরো এ-ধরণের শুনুন —

রাস্তাগুলো খোঁড়া হচ্ছে,
খোঁড়া করছে,
বড় হচ্ছে,

হবেই তো !
কতদিন আর থাকবে বাচ্চা ?
গাড়ি যাবে সব গড়গড়িয়ে,
তবেই তো !
তালি বাজান, ও মেরি জান —
বহুৎ আচ্ছা !

অথবা এই যে নিরক্ষুণ কণ্ঠ

কোথাও-না-কোথাও আমার ভিতর এক ফুটবল-সমর্থক
লুকিয়ে আছে
সবুজ মাঠ দেখলে সে লাফিয়ে পড়ছে বাস থেকে
নিশান কাঁধে ঘোরাফেরা করছে পুবেপশ্চিমে
সে গেটের সামনে লাইন ভাঙছে
ঘোড়ার তাড়া খেয়ে দৌড়চ্ছে গাছ যবিদ...

কিম্বা দেখুন — শুনুন বলতে যদি কারো আপত্তি থাকে — একেবারে নিরাভরণ, প্রায় নগ্ন কাব্য —

সমাজপতি এ-সব বলেছিলেন ! বলেছিলেন, সুখ ও শান্তি
মানবিকতা দয়া আমরা পাব। বলেছিলেন আরও অনেক
নিটোল শব্দ নিটোল ও অ্যান্টিক।...

আর তার সঙ্গে সমগোত্রীয়,

আমি মৃত্যুর কাছে নতজানু হয়ে বলেছি, সময় দাও।
সময় দাও একটু — বলেছি ভালোবাসার দুটি হাত ধরে।
কেউ সরিয়ে নিয়েছে পা, কেউ ছাড়িয়ে নিয়েছে হাত,
পিছনে তাকায় নি...

তবে আমাদের কবিরা বাস্তবিকই ওরকম চংয়ে মর্মান্তিক রসিকতা করেন নি — কবিতার একটা স্থূল আকৃতিই তাঁরা দিয়েছেন —

সমাজপতি এ-সব বলেছিলেন !
বলেছিলেন, সুখ ও শান্তি
মানবিকতা দয়া
আমরা পাব।
বলেছিলেন আরও অনেক নিটোল শব্দ
নিটোল ও অ্যান্টিক।

অপরটিরও অন্য রূপ —

আমি মৃত্যুর কাছে নতজানু হয়ে বলেছি,
সময় দাও একটু — বলেছি
ভালোবাসার দু'টি হাত ধরে।
কেউ সরিয়ে নিয়েছে পা, কেউ ছাড়িয়ে নিয়েছে হাত,
পিছনে তাকায় নি।

প্রকৃতই এখানে গদ্য ও পদ্যের বিভেদটা নাস্তি হয়ে গিয়েছে। তবে গদ্য মানেই যে নীরস অশৈল্পিক কিছু তা নয়। গদ্য যে কাব্যের কোট গায়ে না দিয়েও অন্তরের রসে কবিত্ব-ময় হয়ে উঠতে পারে তার দৃষ্টান্ত সেকালের ক্লাসিকাল থেকে একালের আধুনিক কথাশিল্পী-দের রচনায় যথেষ্ট দেখা যাবে। যথা —

এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি।
এই গিরির শিখরদেশ
আকাশপথে সতত সঞ্চরণশীল জলধরমণ্ডলীর যোগে
নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত;
অধিত্যকা প্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে
আচ্ছন্ন থাকাতে,
সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়;
পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী
তরঙ্গবিস্তার করিয়া প্রবলবেগে
গমন করিতেছে...

অথবা

যামিনী মধুরা,
একান্ত শব্দমাত্রবিহীনা।
মাধবী যামিনীর আকাশে স্নিগ্ধরশ্মিময় চন্দ্র
নীরবে শ্বেত মেঘখণ্ড-সকল উত্তীর্ণ হইতেছে;
পৃথিবীতলে বন্য বৃক্ষ, লতা-সকল
তদ্রূপ নীরবে শীতল চন্দ্রকরে বিস্নাত করিতেছে,
নীরবে বৃক্ষপত্র-সকল
সে কিরণের প্রতিঘাত করিতেছে।
নীরবে লতাগুল্মমধ্যে শ্বেত কুমুদদল
বিকশিত হইয়া রহিয়াছে।
পশুপক্ষী নীরব...

কিংবা,

চাহিয়া দেখি, অন্তহীন কালো আকাশতলে
পৃথিবীজোড়া আসন করিয়া
গভীর রাত্রী নিমীলিত চক্ষে ধ্যানে বসিয়াছে,
আর সমস্ত বিশ্ব-চরাচর মুখ বুজিয়া,
নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া,
অত্যন্ত সাবধানে স্তব্ধ হইয়া
সেই অটল শান্তি রক্ষা করিতেছে
এ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা যত গভীর,
যত সীমাহীন
তাহা ততই অন্ধকার।
অগাধ বারিধি মসীকৃষ্ণ;
অগম্য গহন অরণ্যানী আঁধার;
সর্বলোকাশ্রয়, আলোর আলো, গতির গতি, জীবনের জীবন,
সকল সৌন্দর্যের প্রাণপুরুষও
মানুষের চোখে নিবিড় আঁধার!

কিংবা কালের যাত্রায় আরো এগিয়ে এসে —

চারধারে বিশ্বের আঁধার ঘিরে আসে,
মাথার উপরে তারা ওঠে,
কোন্ সুদূর লোকের পার থেকে
অনন্ত অজানার সুর যেন কানে বাজে...

এই কাব্যিক গদ্য (Poetic prose) শিল্পীর যাদুকর হাতের গুণে তাঁর মন থেকে অন্যের মনে নিছক অর্থ চালাচালির দায় ও ভার বর্জন ক'রে, অক্ষরের সঙ্গে অনাহতের ইঙ্গিত মিশিয়ে তাকে লঘুপক্ষ করে নিয়ে পাঠকের মনোলোকে আলো ছড়াতে পেরেছে। গদ্যের এইটিই শ্রেষ্ঠ রূপ। ঈশ্বরচন্দ্র (সীতার বনবাস), বঙ্কিম (কপালকুণ্ডলা), শরৎচন্দ্র (পথের দাবি), বিভূতিভূষণ (স্মৃতির রেখা) শুধু গদ্যের হাতিয়ার ধরে মহাশিল্পী নন, বহু গদ্যের নিপুণ তুলিকারও। ইংরাজীর আমরা জানি — ম্যাথু আর্নল্ড, ওয়ালটার পেটার, অস্কার ওয়াইল্ড; ফরাসীর উল্লেখযোগ্য — রেনা (Ernest Rénan) ফ্লোবার (Flaubert), মিশলে (Michelet); গ্রীসের তারকাগুলীর মধ্যে বোধ হয় বলা চলে — থুকিদিদেস (Jhucidides), জেনোফোন (Xenophon), সিসেরো (Cicero), প্লুটার্ক (Plutarch), বাইবেল; আর লাতিনের তাসিতাস (Tacitus) ও সালাস্তাস (Sallustus)।

তথাপি একথা বলা চলবে না যে গদ্য-কাব্যের সবটাই নিরর্থক, তার সদর্থক অঙ্গ কিছু নেই। গদ্য-কাব্য নিয়মিত কাব্যের সঙ্গে তার নিজস্ব স্থান করে নিয়েছে — এই বাস্তব সত্যটি মেনে নিয়ে তার রীতি-প্রকৃতির আলোচনা চলতে পারে।

কাব্যের অন্তরাত্মা যদি হয় রস, তবে তার প্রাণ হল ছন্দ। শব্দবিন্যাসের মধ্যে বিধৃত গতি ও যতির সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা, ধ্বনির ওঠা-পড়া বা উচ্চতা-অনুচ্চতার সূত্রে পৌনঃ-পুনিক আত্মঘোষণা সেই ছন্দকে বাঁচিয়ে রাখে। গদ্য-কাব্যের কবিকে সতর্ক থাকতে হয়। তাঁকে শুধু যথেচ্ছ অসম পঙক্তিতে নানুলি বক্তব্য পরিবেশন করলেই চলে না। তাঁকে যতির এক নূতন বোধ দ্বারা গতিশীল হতে হয় — একটি বিশেষ আবেগ কতখানি এক পঙক্তির মধ্যে উচ্চারিত করা যাবে, পঙক্তিবিন্যাসের তাই হবে নির্ধারক। কবি থেকে কবিতে তার বোধ বিভিন্ন হতে পারে — অর্থাৎ শিল্প আরো বেশি ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খল না-হবার দায়িত্বও তাঁর সমধিক। তা'ছাড়া, বাঙালী স্বভাবতই ভাবপ্রবণ ও উচ্ছ্বাসপ্রবণ। সেক্ষেত্রে আবেগের মুহূর্তে তার ভাবের সঙ্গে ভাষায় অনায়াসেই ঝোঁক বা দোলানি এসে পড়ে, পরিমিত মাত্রার চলন ফুটে ওঠে —

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
নদেয় এল বান...

গদ্য-কাব্যের কবির এই মাত্রার মাপটাও এড়িয়ে চলা চাই — সেজন্য তাঁকে শব্দ নির্বাচন ও প্রয়োগের ব্যাপারে সজাগ থাকতে হয়। স্বরবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্তের পদে পদে নির্দিষ্ট পদ-ক্ষেপের শৃঙ্খলা পরিহারের আর এক শৃঙ্খলা অনুসারে তাঁর চলা প্রয়োজন। এখানে সার্থক কবি কেমন বলতে পেরেছেন —

হে ধ্বনি তরঙ্গময় পৃথিবী
আমি একদিন তোমার বাগর্থময় প্রবাহে
অবগাহন করেছিলাম
তারপর সেই প্রবাহ থেকে এক অঞ্জলি শব্দ তুলে নিয়ে
এক রূপময়ীর উদ্দেশে নিবেদন করে বলেছিলাম,
হে স্বর্ণকমল সঙ্কাশ রম্যা
তোমার স্নিগ্ধ শীতল করুণায়
আমাকে গ্লানিমুক্ত শুচিশুভ্র করো

(অজিত দত্ত)

কিম্বা অন্য আর এক দৃষ্টান্তে —

দু'পায়ে ব্যথিত ডৌল
ভাসান দেবার আগে দেবতার মতো
কাতর আঙুলে লাগে
ভুবন্ত চোখের জলে ধুয়ে যায় পাষাণ চিবুক।

(দেবারতি মিত্র)

রবীন্দ্রনাথ ছন্দ-বিচারের অংশে গদ্য-কবিতার সম্পর্কে বলেছিলেন — "ঝগাত্মক বাক্য পদ্যে বললে সেটা হবে পদ্যকাব্য আর গদ্যে বললে সেটা হবে গদ্যকাব্য।"..."কাব্যভাষায় একটা ওজন আছে, সংযম আছে, তাকেই বলে ছন্দ...গদ্যকাব্যের চলন হল সেই রকম, অনিয়মিত উচ্ছৃঙ্খল গতি নয়, সংযত পদক্ষেপ।" বস্তুত গদ্য-কাব্যের নেরূপও তার ভাব-গৌরব এবং পারিপাট্যের দাবণ্য তার সংযম। এবস্ত কত যুগ আগে ফুটে উঠেছিল ডেভিডের গাথায় (Psalms) —

> Sing joyfully to God, all the earth; make melody, rejoice and sing.
> Sing praise to the Lord on the harp, on the harp, and with the voice of a psalm: with long trumpets, and sound of cornet.[1]

সলোমনের আকুল-কথা গানে —

> In my bed by night I sought him whom my soul loveth: I sought him and found him not.
> I will rise, and will go about the city: in the streets and the broad ways I will seek him whom my soul loveth: I sought him and found him not.[2]

ছান্দোগ্য উপনিষদের গদ্যে বাঁধা জবালা-সত্যকামের কাহিনী রবীন্দ্রনাথের কাছে কাব্যরসে প্রনুর্ত হয়ে দেখা দিয়েছিল। কালের যাপে নিকটবর্তী হুইটম্যানের —

> Over the hoarse surging of the sea,
> Or flitting from brier to brier by day,
> I saw, I heard at intervals the remaining one,
> the he-bird,
> The solitary guest from Alabama.[3]

---

[1] বিশ্বভুবন, ঈশ্বরকে নিবেদন কর সংগীত: সুর তোলো, খুশিতে ভরে ওঠো, গাও গান।
বীণা বাজিয়ে, বীণার সুরের সঙ্গে গাও ভজনাগের স্তুতি, স্তব নিবেদনের কণ্ঠে দীর্ঘ নলাকৃতি তেঁপুরবের সঙ্গে, বেণুর আলাপের সাথে।

[2] যাঁর জন্য হৃদয় আমার উতলা তাঁকে নিশীথে শয্যায় খুঁজলাম আমি খুঁজলাম কিন্তু পেলাম না।
আমি উঠে পড়ব, নগরের পথে পথে খুঁজে ফিরব : আমার অন্তরাত্মা যাঁকে ভালোবাসে তাঁকে জনপথে রাজপথে খুঁজব খুঁজলাম কিন্তু পেলাম না তাঁকে।

[3] সমুদ্রের অশ্রান্ত দাপটের উপরে
কিম্বা কুঞ্জ থেকে কুঞ্জে ঘুরে বেড়ে
আমি মাঝে মাঝে দেখেছি শুনেছি সেই পুংপক্ষীটিকে,
আলাবামা থেকে আগত নিঃসঙ্গ অতিথি।

কিম্বা কার্পেন্টারের ক্লাসিকাল গ্রীক ভঙ্গিতে —

> Out of the mirror-lined chambers of self
> (grand though they be, but O how dreary!
> in which you have hitherto spent your life, —[1]

দৃষ্টান্ত তো প্রায় সর্বজনবিদিত। এলিয়ট (T. S. Eliot) অবশ্য আরো আধুনিক এবং তিনি আমাদের এ-যুগের অনেক কবিকে প্রভাবিত করেছেন।

কালেতিহাসিক বিচারে বাংলায় গদ্য-কাব্য শুরু হয়েছিল দীর্ঘকাল আগে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা'য় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন যে রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-১৮৯৪ খ্রী:) এক্ষেত্রে প্রথম পথিকৃৎ।[2] তাঁর রচনার একটু নমুনা গ্রহণ করা যাক —

> আকাশ নীল — অনন্ত নীল,
> মানব-চক্ষু অনন্ত নয় —
> সুতরাং আকাশ অনন্ত নীল!
> দক্ষিণদিকশোভিনী দিগঙ্গনার অঞ্চল হ'তে
> ধীরে ধীরে বায়ু-স্রোতে
> একখানি সূক্ষ্ম মেঘ ভাসিয়া আসিল।

বাংলা সাহিত্যের যে-কোন রূপশিল্পী নিয়ে আলোচনা শেষে রবীন্দ্রনাথে এসে পৌঁছিতে বাধ্য — এই অলোকসামান্য প্রতিভার অবদান সর্বত্র, সার্থক পরীক্ষা-নিরীক্ষার উজ্জ্বল চিহ্ন শিল্পরূপকৃতির সর্বাঙ্গে। গদ্য-কাব্যের প্রসঙ্গেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। "আমি স্বয়ং এই কাব্য রচনার চেষ্টা করেছিলুম লিপিকায়, অবশ্য পদ্যের মতো পদ ভেঙে দেখাই নি..." না দেখালেও তা যে এই ধরণের অনিন্দনীয় সৃষ্টি সে-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। উদাহরণ দেখা যাক —

> গাড়িতে ওঠবার সময় একটুখানি মুখ ফিরিয়ে সে আমাকে তার শেষ চাউনিটি দিয়ে গেছে।
> এই বন্ত সংসারে ঐটুকুকে আমি রাখি কোন্‌খানে।
> দণ্ড পল মুহূর্ত অহরহ পা ফেলবে না, এমন একটু জায়গা আমি পাই কোথায়।

---

[1] বেরিয়ে এসো সেই নিজের মুকুরিত কক্ষগুলি থেকে
(অনুপম হলেও কত নিরেস তা।)
যেখানে এতকাল জীবন কাটিয়েছ তুমি, —

[2] "যে সকল গদ্যে পদ্যের কাব্যাত্মক ভাব থাকে, সেই সকল গদ্যের কোন কোন বিষয় এইরূপ পদ্যপৌনঃপুনিক প্রণালীতে সাজাইয়া লেখা আমার বিবেচনায় ভাষায় একটি নূতন অঙ্গ..." —শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

মেঘের সকল সোনার রঙ যে সন্ধ্যায় মিলিয়ে যায় এই চাউনি কি সেই সন্ধ্যায় মিলিয়ে যাবে। নাগকেশরের সকল সোনালি রেণু যে বৃষ্টিতে ঝরে যায় এও কি সেই বৃষ্টিতেই ঝরে যাবে।

সংসারের হাজার জিনিসের মাঝখানে ছড়িয়ে থাকলে এ থাকবে কেন — হাজার কথার আবর্জনায়, হাজার বেদনার স্তূপে।

তার ঐ এক চকিতের দান সংসারের আর-সমস্তকে ছাড়িয়ে আমারই হাতে এসে পৌঁচেছে। একে আমি রাখব গানে গেঁথে, ছন্দে বেঁধে; আমি একে রাখব সৌন্দর্যের অমরাবতীতে।

পৃথিবীতে রাজার প্রতাপ, ধনীর ঐশ্বর্য হয়েছে মরবারই জন্যে। কিন্তু, চোখের জলে কি সেই অমৃত নেই যাতে এক নিমেষের চাউনিকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

গানের সুর বললে, "আচ্ছা, আমাকে দাও। আমি রাজার প্রতাপকে স্পর্শ করি নে, ধনীর ঐশ্বর্যকেও না, কিন্তু ঐ ছোটো জিনিসগুলিই আমার চিরদিনের ধন; ঐগুলি দিয়েই অসীমের গলার হার গাঁথি"।

('একটি চাউনি')

নিখুঁত গদ্য-কবিতার অনুপম একটি নক্‌শা এটি। সলোমনের গানের (Canticle) উল্লেখ করেছি, কার্পেন্টারেরও এই ধরণের সৃষ্টির দৃষ্টান্ত দেখেছি। রুশীয় কাব্যে মনে হয় টুর্গেনিভ এই কাব্যরূপ নিয়ে অসামান্য দক্ষতা দেখাতে পেরেছিলেন —

আমরা দু'জনে ঘরের মধ্যে; আমি আর আমার কুকুর...বাহিরে ভয়ংকর ঝড়ের হুংকার।

কুকুর আমার সামনে বসে', সোজা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে।

আমিও তার দিকে চেয়ে আছি।

মনে হ'ল সে যেন কিছু আমাকে বলতে চায়। সে বোবা, কথা নেই তার, নিজেকে বোঝে না সে — কিন্তু আমি বুঝি তাকে।

আমি জানি এই ক্ষণে তার ও আমার ভিতরে একই বোধ, তা হ'ল আমাদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। একই আমরা; আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে জ্বলন্ত প্রদীপ্ত একই কম্পিত স্ফুলিঙ্গ।

মৃত্যু মুছে দেয়, তার বিস্তৃত হিমানী ডানার এক ঝাপটায়...

তারপর শেষ।

তখন কে বুঝবে আমাদের সকলের মধ্যে কী সেই উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গ? না! একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকা পশু ও মানুষ আমরা নই... তারা সমান সমানের চোখ, দুজনের দিকে স্থিরনিবদ্ধ দুটি চোখ। উভয়ের মধ্যে, মানুষ এবং পশুর ভিতরে, একই প্রাণ একে-অন্যের সঙ্গে ভয়ে ঘননিবিষ্ট হয়ে রয়েছে।

(Poems in Prose : The Dog)

চুর্গেনিভ তো অপেক্ষাকৃত প্রাচীনের দলে। কন্টিনেন্টাল সাহিত্যে ফরাসীরা যে অত শৃঙ্খলার ও আঁটসাঁট আঙ্গিক সৌষ্ঠবের পক্ষপাতী, তারাও গদ্য-কাব্যের সভায় হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েছে। শুনুন তাদের এক মহাকবি প্যার্স-এর (Saint John Perse) কণ্ঠ —

> Car maintes fois sommes-nous nés, dans l'étenduc sans fin du jour.[1]

কিম্বা ইতালীর নবদূত মন্তালের (Montale) —

> Ma ben sola e ben nuda
> senza miraggio
> porto la mia anima.[2]

তার পাশাপাশি শুনুন আমাদের কবির অলৌকিক কণ্ঠ — আধুনিক ভঙ্গির পরাকাষ্ঠা —

> প্রথম দিনের সূর্য
> প্রশ্ন করেছিল
> সত্তার নূতন আবির্ভাবে —
> কে তুমি।
> মেলেনি উত্তর।
> বৎসর বৎসর চলে গেল,
> দিবসের শেষ সূর্য
> শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগরতীরে,
> নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় —
> কে তুমি।
> পেল না উত্তর। (শেষলেখা)

কিম্বা,

> দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে
> এসেছে আমার দ্বারে ;
> একমাত্র অস্ত্র তার দেখেছিনু
> কষ্টের বিকৃত ভান, ত্রাসের বিকট ভঙ্গি যত —
> অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা তাহার।
> যতবার ভয়ের মুখোশ তার করেছি বিশ্বাস

---

[1] কতবার জন্ম হল আমাদের, দিনের অশেষ প্রান্তরে।

[2] কিন্তু কি সুন্দর কি নগ্ন
মরীচিকাবেশহীন
আমার মন্ত্রণাবাটি বহন করে চলেছি।

তবুও হয়েছে অনর্থ পরাজয়।
এই হার-জিত খেলা, জীবনের মিথ্যা এ কুহক,
শিশুকাল হতে বিজড়িত পদে পদে এই বিভীষিকা,
দুঃখের পরিহাসে ভরা।
ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি —
মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে। (শেষলেখা)

কিংবা আরো সেই চিরস্মরণীয় —

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত;
তার তরে রাখনি গোপন রাত্রি।
তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
যে-পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ,
সে যে চিরস্বচ্ছ,
সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে চিরসমুজ্জ্বল।
বাহিরে কুটিল হোক অন্তরে সে ঋজু,
এই নিয়ে তাহার গৌরব।
লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত।
সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে দীপ্ত অন্তরে অন্তরে।
কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে,
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভাণ্ডারে।
অনায়াসে যে পেয়েছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার। (শেষলেখা)

আধুনিক গদ্যকাব্যের প্রয়াস এরই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে — যেদিন সে একে ছাড়িয়ে যেতে পারবে সেদিন বাংলা কাব্যের জগতে আর এক নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। ইতিমধ্যে আমরা বলব — এর তুলনা নেই, তুলনা নেই।

মধুদার গল্প

সমীরকান্তি গুপ্ত

"আজ তোমাদের একটা ভূতুড়ে গল্প বলব, আমার কাছে ভূতুড়েই মনে হয়েছিল।"

"আপনার সব গল্পই তো রোমাঞ্চকর, ভূতুড়ের কান ঘেঁষে যায়।"

"না হে, এটা সেরকম নয়।"

কথা হচ্ছিল মধুদা ওরফে সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের সঙ্গে, যিনি চিরকুমার বিপ্লবী, বি. পি. সি. সি.'র প্রেসিডেন্ট ছিলেন, স্বাধীনতার পরে কনষ্টিটুয়েন্ট অ্যাসেমব্লির মেম্বর এবং প্রায় পঁচিশ বছর এক নাগাড়ে এম. পি. ছিলেন।

১৯৪৭-এর শুরু থেকে সুরেনদা ঘন ঘন পণ্ডিচেরী আসা আরম্ভ করেন। আমি প্রত্যেকবার মাদ্রাজ এয়ারপোর্ট থেকে তাঁকে নিয়ে আসতাম এবং যাবার দিন পুনরায় পৌঁছে দিতাম। তিনি পণ্ডিচেরীতে উঠতেন তাঁর ময়মনসিংহের পরিচিত যোগানন্দজীর আস্তানায়। তাঁর চালচলন সরল সন্ন্যাসীর মতো। বারান্দায় সাধারণ একটি তক্তপোষের উপর পাততেন আসন। তাঁর সঙ্গে গল্প করতে করতে মধ্যরাত্রি পার হয়ে যেত। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাপে চা যুগিয়ে যেতেন যোগানন্দ। সে-পানীয় গিলতেই হতো, প্রত্যাখ্যান করবার উপায় ছিল না। অতিথিবৎসল কোমলহৃদয় যোগানন্দ দপ্ করে জ্বলে উঠতেন, প্রায় দুর্বাসার রূপে। তাঁকে নিরস্ত করতেই আকণ্ঠ চা খেতে হ'তো।

সুরেনদা পার্টির ও গভর্ণমেন্টের অনেক বিস্ময়কর গল্প করতেন। নেতাজীর অন্তর্ধান সম্বন্ধে তাঁর অক্লান্ত অনুসন্ধানের ফল, শৌলমারীর সাধুর নাম পরিচয়, ভেলোর জেলে তাঁর সঙ্গে সুভাষের পত্রবিনিময় ছিল যার মাধ্যমে সেই সুব্বাইয়ার প্রসঙ্গ, ফ্রন্টিয়ার জেলে পাঠান শান্ত্রীদের সঙ্গে চুক্তি (তারা বিশ্বাসই করত না এমন শান্তশিষ্ট বঙ্গসন্তানকে ইংরেজ খানকাই ভয় করে, সে নিশ্চয় যন্ত্রতন্ত্র জানে। এই মন্ত্র শেখাবার আশ্বাস দিয়ে মধুদা তাদের দ্বারা প্রয়োজনীয় কাজ হাসিল করতেন।), সিলেটের আসামভুক্তিতে এক আঞ্চলিক নেতার কারাসক্তি ইত্যাদি — এসব ভূতুড়ে গল্পের রোমাঞ্চকরতাকেও হার মানিয়ে দেয়। তাঁর দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা, সুদীর্ঘ কারাবাস, তাঁকে আলাপে বিস্ময়করভাবে তুলে দেখাত। আজও ভাবলাম এই রকম বাস্তব অথচ লোমহর্ষক আর একটি কাহিনী ফাঁদবেন — বিশ্বাস ঘাতকতার জন্য পিস্তলের গুলিতে দলের হতভাগ্য কারও প্রাণ যাবে, কিম্বা অবিশ্বাস্যভাবে ইংরেজ গোয়েন্দাদের চোখে ধুলি দিয়ে ভূতের মতোই তাঁর উবে যাওয়া ঘটবে।

"তাহ'লে বলে ফেলুন। আপনার মুখে ভূতুড়ে গল্প — সেই রকম, পত্রপত্রিকায় যার গায়ে সার্টিফিকেট লেখা থাকে 'গল্প হলেও সত্যি' — আর তার সয় না।"

মধুদা উত্তর দিলেন না। যেন তন্ময় হয়ে স্মৃতির মধ্যে ডুবে গেলেন। তুলে নিয়ে এলেন স্মৃতির পাতালপুরী থেকে এই গল্পটি।

বিরজাচন্দ্র নন্দী। কাজীগ্রাম থেকে পায়ে হেঁটে রওয়ানা হয়ে বালিপাড়া ষ্টেশন পেরিয়ে, দুই আড়াই মাইল ঠেঙিয়ে সে যেত ধলার ইস্কুলে পড়তে। আমাদেরই গ্রামের

ছেলে। আমার সমবয়সী বন্ধু।

আমি বয়ঃসন্ধিতে শহরে থেকে 'মৃত্যুঞ্জয় ইনস্টিট্যুশন' ইস্কুলে পড়ি। গ্রীষ্মাবকাশে, পূজাপার্বণের ছুটিছাটা উপলক্ষ্যে সেখান থেকে কাজীগ্রামে যাই। এমনই এক ছুটিতে গিয়েছি, বন্ধু তখন বয়ে বসল শহরে আমার সঙ্গে থেকে তারও পড়াশুনার একটা ব্যবস্থা করতে। আমি কথাটা পাড়লাম। অভিভাবকরা সহজেই সম্মতি দিলেন। সে শহরে এল আমাদের বাড়িতে — বছর পনের বয়েসে থার্ড কি সেকেণ্ড ক্লাসে পড়তে।

কিছুকাল পরে একদিন তার জ্বর এল। বাড়িতে কাউকে কিছু সে বলে না, একটু এড়িয়ে এড়িয়েই চলে। সে স্বভাবত লাজুক, আমার কাছে সহজ ও অকপট হলেও, বাড়িতে অপর মহলে তেমন অকুণ্ঠ নয়। খবর শুনে আমি গিয়ে তাকে বললাম,

— "তোমার শুনলাম জ্বর। কাউকে কিছু বলছও না। ডাক্তার দেখাবার একটা ব্যবস্থা করি, ওষুধপত্র কিছু খাও।"

শুধু জ্বর নয়। তার সঙ্গে ছিল দাস্ত। সেই জন্যই সে আরো সঙ্কুচিত বোধ করছিল বাড়ির মেয়েছেলেদের কাছে। আমার কথার প্রত্যুত্তরে বার বার সে বলতে লাগল

— "না, আমাকে দেশে পাঠিয়ে দে।"

অনন্যোপায় হয়ে তাকে নিয়ে রেখে এলাম দেশে। একদিন নয়, দু'দিন নয়, অনেক দিনের মতো অসুখটা বেশ কায়েমী হয়ে বসল। মাসখানেক পরে আমি যথারীতি ছুটিতে গিয়েছি। বিরজার তখন শেষ অবস্থা। লোক চেনার শক্তিও তার নেই। আমি কাছে গিয়ে তাকে ডাকলাম। চোখ খুলে দেখে সে আমাকে চিনল। কথাবার্তাও দু'চারটি হ'লো। তারপর বিদায় নিয়ে আমি চলে এলাম। আটচল্লিশ দিন টাইফয়েডে রোগে ভুগে বিরজা দেহত্যাগ করল। তার দাদা আমাদের সেই শোকসংবাদ জানালেন।

শৈশবের বন্ধুত্ব — তার দাগ গভীর, তার স্মৃতিবন্ধন বড় নিবিড়।

একদিন স্বপ্নে বিরজা আমার কাছে এসে হাজির। আমি ভুরু কুঁচকে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম,

— "তুমি না মারা গিয়েছ, এলে কি করে?"

— "দূর পাগল," সে বলল। কথাটি তার বুলি, প্রায়ই বলত আলাপচারিতার মধ্যে।

— "নয়ত কি, তোমার দাদা এসে বলে গেলেন, সেসব তবে মিথ্যে?"

— "দূর পাগল, মরে গেলে এই হেঁটে তোমার কাছে এলাম কী করে? কথা বলছি কী করে? "

— "তবে চলো, ওদের সামনে বোঝাপড়া হয়ে যাক, ওরা যে বলে তুমি মারা গিয়েছ। চলো, তোমাকে জলজ্যান্ত হাজির করব ওদের সামনে।"

টানতে গিয়ে হাত থেকে মিলিয়ে যায় জামার খুঁট। ঘুম ভেঙে জেগে উঠি রূঢ় বাস্তবের জগতে। সে জগৎ বিরজার অস্তিত্ব স্বীকার করে না।

এ-স্বপ্ন একবার নয়, দেখলাম একাধিক বার। বিরজা আমার স্বপ্নসঙ্গী হয়ে দুই জগতের মধ্যে স্রোতস্বতী বেয়ে পারাপার করতে লাগল।

এক গ্রীক কবি বলেছেন, কালের হাতে দুঃখের দুরূপনেয় দাগও স্মৃতির পট থেকে

একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যায়। বিরজাও ক্রমে আমার মন থেকে দূরে সরে যেতে লাগল।

চক্রবৎ কালের আবর্তনে একদিন বেজে উঠল শরতের আগমনী, এল পূজা, এল ছুটি। সেই অতি-প্রাচীন চির-নূতন কাজীগ্রাম। পূজার শেষ দিন বিসর্জনের পরে ক্লান্ত-দেহে শুয়ে পড়েছি। হঠাৎ দেখি নাটমন্দিরের জানালা দিয়ে পাশে দাদামশায়ের ঘর থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে বিরজা — বলছে উঠে পূজামণ্ডপের দিকে যেতে। ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম তাকে। বললাম,

— "চলো, তোমাকে নিয়ে যাব সবার সামনে। সকলে বলছে আমি স্বপ্ন দেখি, আমার দৃষ্টি ভুল। তোমাকে দেখিয়ে তাদের সন্দেহ দূর করব।

সে খপ করে একটা থাম জড়িয়ে ধরে দাঁড়াল। কিছুতেই আসবে না। কিছু কথা কাটাকাটির পর ম্লানমুখে সে বলল,

— "আমার দাদাকে বলিস গয়ায় আমার একটা পিণ্ডি দিতে।"

আমি জোর পেয়ে বলে উঠলাম,

— "তবে ওরা যা বলে তা তো ঠিকই। তুমি মারা গিয়েছ। নতুবা পিণ্ডির কথা বলছ কেন? আমি বলব না। বললে তুমি তো আর আসবে না, এখন যা-ও বা দেখা-সাক্ষাৎ হচ্ছে তা-ও আর হবে না।"

এক করুণ সুরে সে তার আবেদন আবার পেশ করল,

— "জানিস, আমার কি কষ্ট; আমার কষ্ট হয়, আর তোর তা ভালো লাগে?"

বিরজা যেমন আমিও তেমনি পরস্পরে কখনো তুমি কখনো তুই বলে সম্বোধন করতাম। যে-বিরজার সঙ্গে এতদিন একসঙ্গে কাটিয়েছি, এত সুখদুঃখ মিশিয়ে বড় হয়েছি তার যুক্তিকে যদি বা খণ্ডন করা সম্ভব, তার কাতর আবেদনকে ফেরানো তত সহজ নয়।

রাজী হলাম। তবে একটি শর্তে। কথা থাকল, সে পিণ্ডদানের পরেও আমার সঙ্গে দেখা করবে। বিরজাও রাজী হ'লো, তবে মাত্র একটি বার শেষ দেখা দিতে।

তারপর স্বপ্ন মিলিয়ে যেতে কখন ঘুম এসে তার যাদুস্পর্শ বুলিয়ে গিয়েছে চোখে। হঠাৎ কে এসে ডাকল,

— "তুমি উঠলে না? তারা যে চলে গেল!"

তার আঙুলের স্পর্শ পর্যন্ত লেগে রয়েছে আমার মাথার বাঁ পাশে, ঠিক কানের উপরে। তড়িৎস্পৃষ্টের মতো উঠে বসলাম। কোঁচার খুঁটটি গায়ে জড়িয়ে ঐ কথার রেশটি ধরে চললাম পুকুরে মুখ ধুতে। এ পারে মুখ ধুচ্ছি। ওপারে জনৈকা বিধবা মহিলা মুখ হাত ধুচ্ছেন। তাঁর খেদোক্তি কানে এলো,

— "আমার পোড়া কপাল। আমার ভাগ্যে কি আর অমন হয়। এই তো অনুকরা তীর্থে বেরুলো, তাদের সঙ্গে ওরাও গেল,..."

আমি চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলাম,

— "কী বলছেন, কারা গেল, কোথায় গেল?"

— "এই তো অনুকরা গেল, তাদের সঙ্গে বিরজার দাদারা সকলে গেল গয়া-কাশী তীর্থ করতে।"

আর দাঁড়াবার সময় ছিল না। ছুটতে ছুটতে গিয়ে উঠলাম বিরজাদের বাড়ি। বাড়ি

শূন্য। তাঁদের ট্রেন ধরতে হবে দেড় মাইল দু'মাইল পথ উজিয়ে বালিপাড়া ষ্টেশনে পৌঁছে। উর্ধ্বশ্বাসে রেল লাইন ধরে ছুটলাম। ষ্টেশনে যখন উপস্থিত হলাম তখন গার্ড সাহেবের সবুজ নিশান দেখা দিয়েছে, ইঞ্জিন ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আড়মোড়া ভেঙে সবে কয়েক পা ফেলতে শুরু করেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে কামরার কাছে এলাম। জানালা দিয়ে গলা বের করে বিরজার দাদা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন,

— "কী ব্যাপার?"

— "সব কথা বলার সময় নেই। আপনি শুধু বিরজার জন্য গয়ায় পিণ্ড দিয়ে আসবেন। পরে সব বলব।"

গাড়িটা ততক্ষণে আমাকে ধারিয়ে দিয়ে ক্রমেই সবেগে ছুটে চলেছে কোন দিগন্তের গহ্বরে।

দু'বছর আড়াই বছর পর আবার একদিন সম্পূর্ণ বিস্মৃতির পর্দা ছিঁড়ে সামনে পাদ-প্রদীপের আলোয় এসে দাঁড়াল বিরজা। সেই বিরজা। এই পরিচিত বিরজা। হাওয়ায় ভাসিয়ে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে চলল সে। কোন অন্তরীক্ষের পরপারে? যেখানে আমরা নামলাম সেটা অসমতল টিলাভূমি। জলের অপ্রতুলতা সেখানে কষ্টকর। মাটির দেয়াল ঘেরা ঘর। তার ঘরে ঢুকলাম। পরে পাতকুয়োর জলে দু'জনের স্নান হলে সে বলল

— "নে, রান্না করে নে।"

আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকালাম।

— "একথা কেন বলছিস?"

বিনয়নম্র মলিন সুরে সে বলল,

— "আমার হাতে কি খাবি?"

তাকিয়ে দেখলাম এই নিসর্গচিত্রের পরিবেশে আহার্যবস্তু শুকনো। কটি ডাল জাতীয়। বাঙালী রসনার প্রিয় সরস অন্নের একটি দানাও সেখানে নেই। আহারের উদ্যোগ করতে গিয়ে ঘুম ভেঙে গেল।

বিরজা আর নেই। বোধ করি সে আর আসবে না। প্রতিশ্রুতির দায়মুক্ত এখন সে।

অনেক মিলিয়ে দেখেছি, এই টিলাসমাচ্ছন্ন স্বল্পজলসিঞ্চিত বানর-অধ্যুষিত স্বপ্নের এই দেশ বিহারের কোনো জায়গার সঙ্গে আত্মীয়তার বাঁধা।

এই পর্যন্ত বলে সেদিনের নৈশাহার ভেঙে দিলেন মধুদা। পরের দিনেই লিখে রেখেছিলাম এটা। কুড়ি বছর পরে পুরানো কাগজপত্র খুঁজে এর সন্ধান পেলাম ফের। মধুদার ভাষা মেরামতের আর ইচ্ছা হলো না। যেমন বলা তেমনই থাকল। ভুতুড়ে গল্পের আবার সাজসজ্জা কি।

SRI AUROBINDO ASHRAM, PONDICHERRY

A WARNING

We do not guarantee the authenticity of pamphlets and communications sometimes circulated among people. Sri Aurobindo himself has said in one of his writings that many are the prophets who will declare in his name their own conceptions and imaginations.

Only what is issued from the Ashram in the name of the Trustees is to be trusted. The rest is mostly the result of the imagination and speculation of the writer.

Nolini-da

সাবধান-বাণী

মাঝে মাঝে যে-সব বাণী বা পুস্তিকা লোকেদের মধ্যে বিতরণ করা হয় তার সত্যতা সম্বন্ধে আমরা নিশ্চয়তা দিতে পারিনা। শ্রীঅরবিন্দ নিজেই তাঁর রচনার এক জায়গায় বলেছেন যে অনেক ভবিষ্যৎ-বক্তা আছে যারা নিজেদেরই ভাবনা ধারণা তাঁর নাম দিয়ে ঘোষণা করবে।

একমাত্র আশ্রম থেকে ট্রাষ্টিদের স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিই বিশ্বাসযোগ্য। বাকি সব শুধু প্রস্তাবকদের নিজস্ব জল্পনা-কল্পনার ফল।

নলিনীদা

S. N. PAUL & CO.

High Class Brick Manufacturers & Contractors

Brick Field
Sreepore Bagharghole
P.O. Bonhooghly, 24 Parganas

Head Office
34: 1, Puddapukur Road
Calcutta-20

Phone : 47-2869

With the best compliments from :

Ellora Enterprise

Paper & Board Merchants

57/2A, College Street Calcutta - 73

Phone: 34-3720

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

সমগ্র রচনাবলী

খণ্ড প্রকাশিত প্রতি খণ্ডের মূল্য টাকা

রমেন সেনগুপ্ত

প্রণতি

শতবার্ষিকী উপলক্ষে মায়ের চরণে নিবেদিত কাব্যগ্রন্থ

মূল্য ৩·০০ টাকা

অণিমা মজুমদার

মঞ্জিরা

(কাব্যগ্রন্থ)

12 NOV 1987

সমীরকান্ত গুপ্ত

কাব্যলোকে

মূল্য ৮·০০

শতাব্দীর পূজা

শ্রীমা ও আশ্রম প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ মূল্য ৪·০০

অনিলবরণ রায় ও যোগানন্দ

মহাবির্ভাব

শ্রীশ্রীমদ্ ভারতব্রহ্মচারী ও শ্রীশ্রীজগন্মাতার মহাবির্ভাব

—প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম	শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির	শ্রীঅরবিন্দ ভবন	পৃথুল
পণ্ডিচেরী	১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট	৮ শেক্‌সপীয়র সরণী	৬৩ কলেজ স্ট্রীট
	কলিকাতা – ৭৩	কলিকাতা – ৭১	কলিকাতা – ১২